ব্যবসার নাম শুভবিবাহ

শেখর বসু

মনীষা

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারী, ১৯৬৪

প্রকাশক
মণি সান্যাল
মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
৪/৩বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

মুদ্রক
কালান্তর প্রেস,
৩০/৬, ঝাউতলা রোড
কলকাতা-৭০০ ০১৭

অনিরুদ্ধকে

কাল অনেক রাত পর্যন্ত জমজমাট ছিল এই বাড়িটা। উঁচু গলার গল্প আর হাসি যেন থামতেই চাইছিল না।

আর এখন উৎসববাড়ির চেহারা ঠিক বুঝি শ্মশানের মতো। মাঝেমধ্যে বুকফাটা কান্নার শব্দ উঠছিল। বাড়ির সামনে কৌতূহলী মানুষের ছোটখাটো একটা ভিড়। পুলিশের জিপ এসে দাঁড়াতেই ভিড়টা ছড়িয়ে গেল চারদিকে।

বাড়ির মধ্যে এই মুহূর্তে কান্নার শব্দ নেই। নিচু গলায় কথা বলাও থেমে গিয়েছিল। বাড়ির লোকদের থমথমে মুখের দিকে তাকিয়ে পুলিশ ইন্সপেক্টর অবনী ঘোষরায় গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'বডি কোথায়?'

সহজ প্রশ্ন, কিন্তু কথাটার মানে বোধহয় সবাই ধরতে পারল না। একটু বাদে লম্বা চেহারার একজন বললেন, 'আসুন, এ-ঘরে আসুন।'

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির লোকজন দুদিকে সরে গিয়ে পথ করে দিয়েছিল।

পাশের ঘরটা ফুল দিয়ে সাজানো। মধ্যিখানে খাট। খাটের ওপর লাল বেনারসী-পরা নতুন বউ পড়ে আছে। ঠিকরে বেরিয়ে আসা চোখ দুটো স্থির। ঠোঁটের কোনা দিয়ে রক্তের ধারা গড়িয়ে নেমেছে বিছানায়।

প্রবীণ ইন্সপেক্টর ঘোষরায় ওঁর দীর্ঘ কর্মজীবনে বিস্তর খুনের তদন্ত করেছেন। তদন্তের প্রথম দিকটা তো ছকবাঁধা। ভাবলেশহীন হয়ে কর্তব্যকর্ম করতে কোনওরকম অসুবিধে হয়নি কখনও। কিন্তু আজকের এই দৃশ্যটা ওঁর বুকের ভেতরে রীতিমত একটা ধাক্কা মেরেছিল। চাপা গলায় বলে উঠলেন, 'ইশ্!'

ইন্সপেক্টরের পেছন-পেছন পুলিশের ফোটোগ্রাফারও ঘরে ঢুকেছিল। নানা কোণ থেকে মৃতদেহের ছবি তোলা হল অনেকগুলো। ফরেন্সিক এক্সপার্টও কাজে লেগে পড়েছেন। ইন্সপেক্টর ঘোষরায় পকেট থেকে নোটবই বার করে বেশ কিছু লেখালেখি করে নিলেন দ্রুত।

বাড়ির কিছু মানুষজন ঢুকে পড়েছিল ঘরের মধ্যে। সেদিকে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় ইন্সপেক্টর বললেন, 'আপনারা কাইন্ডলি বাইরে যান। আমাদের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত এ-ঘরে আসবেন না কেউ।'

একটু বাদে ঘর থেকে বেরিয়ে ইন্সপেক্টর নিচু গলায় একজন কনস্টেবলকে কী যেন বলতেই দরজার সামনে পাহারা বসে গেল।

ওদিকে শুকনো মুখের ভিড়। ভিড়ের দিকে তাকিয়ে ইন্সপেক্টর জিজ্ঞেস করলেন, 'মেয়ের বাবা কে?'

লম্বা চেহারায় যে মানুষটি পুলিশের দলকে পথ দেখিয়ে এ-ঘরে নিয়ে এসেছিলেন, তিনি বললেন, 'দাদা ও-ঘরে।'

'একটু কথা বলতে হবে যে—।'

'আসুন, আমার সঙ্গে আসুন।'

'আপনি?'

'আমি মেয়ের কাকা।'

'মেয়ের মা কোথায়?'

'ঠাকুরঘরে। একটু পর-পর ফিট হয়ে যাচ্ছেন।'

'ডাক্তারকে খবর দিয়েছেন?'

'হ্যাঁ, ডাক্তার আছেন এখনও।'

পাঁচ-ঘরের মস্ত অ্যাপার্টমেন্ট। সিটিং-কাম-ডাইনিং হলটা বেশ বড়। ডাইনিং টেবিলের একপাশে কয়েক ডজন রজনীগন্ধার স্টিক আর গোলাপ ফুলের তোড়া পড়ে আছে। ফুলের গন্ধে বাতাস ভারী। এই সুগন্ধ এখন বোধহয় এ-বাড়ির সবার কাছেই অস্বস্তিকর ঠেকছিল।

কোণের ঘরে শুধু মেয়ের বাবাই নন, আরও কয়েকজন বসে ছিলেন। ইন্সপেক্টরকে ওখানে আসতে দেখে দু-তিনজন উঠে দাঁড়ালেন। মেয়ের কাকা গলা সামান্য তুলে বললেন, 'ইন্সপেক্টর এখন দাদার সঙ্গে একটু কথা বলবেন।'

কথার আড়ালের কথাটা খুব পরিষ্কার। মেয়ের বাবার সঙ্গে যাঁরা ছিলেন তাঁরা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন এক এক করে। শেষ মানুষটি বেরুবার পরে দরজার পাল্লা টেনে দিয়েছিলেন।

মেয়ের কাকা ইন্সপেক্টরের সঙ্গে দাদার পরিচয় করিয়ে দিলেন। 'ইনি আমার দাদা, অরিজিৎ রায়। আমার নাম প্রসেনজিৎ। আমরা দু-ভাই।'

বেতের চেয়ারে পাথরের মতো বসেছিলেন অরিজিৎ। কেঁদে কেঁদে চোখ দুটো লাল হয়ে গেছে। কী যেন বলতে গিয়ে কিছুই বলতে পারলেন না। চোখ থেকে টসটস করে জল গড়িয়ে পড়ল কয়েক ফোঁটা।

সামনের চেয়ারে বসে পড়লেন ইন্সপেক্টর ঘোষরায়। মাথার টুপি খুলে কোলের ওপর রাখলেন। তারপর পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখ চোখ মুছে নিয়ে বললেন, 'মিস্টার রায়, আমাদেরও ছেলেমেয়ে আছে। আপনার দুঃখে সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা আমার জানা নেই। মানুষের মধ্যে কিছু কিছু পশু আছে, তারাই এইরকম জঘন্য অপরাধ করে থাকে। আমাদের কাজ হল ওইসব অপরাধীকে ধরা। এই ব্যাপারে আপনার একটু সাহায্য—।'

বেতের চেয়ারে বসে-থাকা পাথরের মূর্তির মতো মানুষটা হাত সামান্য ওপরে তুলে ইন্সপেক্টরকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'কী লাভ! আমার মেয়েকে তো আর ফিরিয়ে দিতে পারবেন না!'

ইন্সপেক্টর একটু ইতস্তত করে বললেন, 'না, তা পারব না। কিন্তু—।'

'কিন্তু কী?'

'একটা খ্যাপা কুকুরকে কি রাস্তায় ছেড়ে রাখা ঠিক হবে? আপনার মেয়ে আজ ওর ভিকটিম, কাল হয়তো আর একজন হবে। সুতরাং আমাদের কর্তব্য হল—।'

ছেলেমানুষের মতো ডুকরে কেঁদে উঠে মেয়ের বাবা বললেন, 'মেয়ের বিয়ে দেওয়াও তো আমার কর্তব্যের মধ্যে ছিল। আর কোনও কর্তব্য পালন করতে পারব না আমি।'

এ-কথার কোনও জবাব দিতে পারলেন না ইন্সপেক্টর।

একটু বাদে প্রসেনজিৎ বললেন, 'সুলগ্না, মানে আমার ভাইঝির বিয়ের ব্যাপারে আমি একেবারে গোড়া থেকেই ছিলাম। আমিই সব বলছি আপনাকে।'

চেয়ারটা একটু কাছে টেনে আনলেন প্রসেনজিৎ।

ইন্সপেক্টর কোলের ওপর থেকে টুপিটা তুলে নিয়ে পাশের খালি চেয়ারে রেখে পকেট থেকে লম্বাটে একটা নোটবুক আর কলম বার করে বললেন, 'হ্যাঁ বলুন।'

কপালে ভাঁজ ফেলে ওপরদিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকার পরে মুখ খুললেন প্রসেনজিৎ। 'বুলা—সুলগ্নার ডাক নাম বুলা—গত বছর বিএ পাশ করেছে। বয়েস বাইশ। গ্রাজুয়েট হওয়ার পরে আর পড়াশুনো করেনি, তবে কলকাতার একটা বুটিকে ফ্যাশান ডিজাইনিংয়ের একটা শর্ট-কোর্স করেছিল। ছ-মাসের, তাই না?'

বুলার বাবা আলতো করে মাথা নেড়ে সায় দিয়ে পাঞ্জাবির হাতা দিয়ে চোখের জল মুছলেন।

আবার কথা শুরু করলেন প্রসেনজিৎ। 'আমার দাদার কাপড়ের ব্যবসা। বড়বাজারে হোলসেলের দোকান। হালে ধর্মতলাতেও একটা দোকান নিয়েছেন—রেডিমেড গার্মেন্টস বিক্রি হয়। বড়বাজারের দোকান তো খুবই চালু—। এই ধর্মতলার দোকানটিতেও বিক্রিবাটা জমে উঠতে শুরু করেছে সবে। বুলা বলেছিল, বাবা, ধর্মতলার দোকানটা আমি দেখব। ফ্যাশান ডিজাইনিংয়ের বুটিক বানাব একটা। তা, দাদা বলেছিলেন—বানাও, তাতে আমার কোনও আপত্তি নেই। তবে তার আগে বিয়েটা করে ফেল। আমার দাদা সেলফ-মেড ম্যান। নিজের ভাগ্য নিজে তৈরি করেছেন। কোনও কিছুর অভাব নেই। নিজে খুব সাধারণভাবে থাকেন, তবে ছেলে-মেয়ে-বউদির কোনও শখসাধ অপূর্ণ রাখেননি। এক মেয়ে, এক ছেলে। মেয়েই বড়। ছেলে-মেয়ে বাবার কথার কখনও অবাধ্য হয়নি। বুলার এখন বিয়ে করার একটুও ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু যেহেতু বাবা বলেছে—।'

'বাবা তো একা বলেনি।'

দাদার কথাটা লুফে নিয়ে ছোট ভাই বলল, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, ওর মাও বলেছে। তবে বলাটা তো স্বাভাবিক। মেয়ের বিয়ের বয়েস হলে কোনও বাবা-মাই চুপ করে বসে থাকতে পারে না। আমরাও বলেছি। পড়াশুনো শেষ। চাকরি-বাকরি করে বাবা-মাকে তো আর সাহায্য করার দরকার নেই, অতএব—।'

'বিয়ের সম্বন্ধ কে এনেছিল?'

'কেউ না। আমার খবরের কাগজে পাত্রপাত্রী কলামে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম বড় করে। কত যে সম্বন্ধ এসেছিল, কী বলব! কিন্তু আমাদের এমনই কপাল! আসলে ছেলেটাই বুলার মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছিল।'

'ছেলে মানে পাত্র? কী নাম যেন—প্রীতম, না?'

'হ্যাঁ।'

'ছেলেই কি যোগাযোগ করেছিল?'

'না, যোগাযোগ করেছিল ওর দাদা-বউদি।'

'কোথায় থাকে?'

'গল্ফ গ্রিনে।'

'আপনারা গেছেন ওদের বাড়িতে?'

'হ্যাঁ, একবার।'

'ছেলের দাদা-বউদির নাম কী?'

'সৈকত আর উমা। ওদের পদবি গুহ।'

'কী বলল ওরা এসে?'

মেয়ের বাবা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'আমি বলছি। দোকানে বেরুবার মুখে ওরা এসে হাজির। এখন ভাবি, এক মিনিট আগে যদি বেরিয়ে যেতাম! তা ছাড়া ওই সময় ব্যবসার কাজে আমার বেনারস যাওয়ার কথা ছিল। সব ঠিকঠাক, কিন্তু কী কারণে আমি না গিয়ে আমাদের ম্যানেজারকে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। একেই বলে বোধহয় ভবিতব্য!'

ইন্সপেক্টর ঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বললেন, 'তা, আপনার সঙ্গে কথাবার্তা তখনই কি মোটামুটি ঠিক হয়ে গিয়েছিল?'

'না, একেবারেই নয়। ব্যস্ত ছিলাম বলে বলেছিলাম, বাকি কথা পরে বলা যাবে। পাত্র মেয়ে দেখুক, মেয়ের মতামতও তো নিতে হবে আমাদের। আপনারা পরে একবার ফোন করবেন। ছেলের দাদা-বউদি কথাবার্তায় তুখোড়, বিশেষ করে বউদি। ভদ্রমহিলা বললেন, আপনার গাড়িটা ছেড়ে দিয়ে আমাদের গাড়িতে চলে আসুন। আমরা বেলুড়ে যাব একবার। বড়বাজার তো পথেই পড়ছে। আপনাকে নামিয়ে দিয়ে যাব। কথাবার্তা বলারও সময় পাওয়া যাবে কিছুটা। আমি বললাম—বেশ, তাই চলুন।'

'তা, গাড়িতে যেতে যেতেই পাত্রের কথা শুনলেন?'

'হ্যাঁ।'

'কী বলল?'

ইন্সপেক্টরের প্রশ্নের উত্তরে আর একবার কেঁদে উঠলেন মেয়ের বাবা। তারপর জড়ানো গলায় বললেন, 'যা বলল তা তো রূপকথা। আমার তখনই অবিশ্বাস করা উচিত ছিল। আমি করিনি। লোভী মানুষদের যে শাস্তি হয়, আমারও সেই শাস্তি হয়েছে। ভেবেছিলাম, আমার আদরের মেয়েটা রাজরানি হবে—!'

মেয়ের বাবা কান্না থামাবার জন্যে মুখে হাত চাপা দিয়েছিলেন। ওই ভাবে হাত চাপা দেওয়ায় কান্নার শব্দ কিছুটা কমেছিল, কিন্তু ওঁর শরীর কাঁপছিল থরথর করে।

একটু বাদে মেয়ের কাকা বললেন, 'কথাগুলো ওরা আমাদেরও শুনিয়েছিল। মাথা ঘুরিয়ে দেওয়ার মতো কথাবার্তা। ছেলে আই আই টি থেকে কম্পিউটারে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি নিয়ে আমেরিকায় গিয়ে হায়ার স্টাডিজ করে বেশ কয়েকটি বড়-বড় চাকরি করেছে। তারপর চাকরি ছেড়ে ব্যবসায় নেমেছে—কোটি কোটি টাকার ব্যবসা। নিউ ইয়র্ক টাইমস-এ ছেলেকে নিয়ে মস্ত একটা লেখা বেরিয়েছে। আমেরিকান মিলিওনিয়ারদের মেয়েরা ওই ছেলেকে বিয়ে করার জন্যে পাগল; কিন্তু ছেলে নাকি মনেপ্রাণে ভারতীয়। আদর্শবাদী। দেশের মেয়ে ছাড়া বিয়ে করবে না। ওই মেয়ে পছন্দের ভার আবার ওর দাদা-বউদির। ওরা যাকে পছন্দ করবে, ছেলে তাকেই বিয়ে করবে। কিছুদিন বাদে ছেলে কলকাতায় একটা মিনি-টাউনশিপ বানাবে। প্ল্যান পাকা। সি এম-এর অ্যাপ্রুভালও নাকি পেয়ে গেছে। একদিন ওই টাউনশিপ নিয়েই আমাদের সামনে এক ঘণ্টা লেকচার দিয়েছিল ওর দাদা-বউদি।'

'কীরকম ?'

'সে অনেক কথা। টাউনশিপে সুইমিং পুল থাকবে। টেনিস, ব্যাডমিন্টন আর স্কোয়াশের কোর্ট থাকবে। জিম থাকবে, হেলথ ক্লাব থাকবে, বিউটি পার্লার, রেস্টুরেন্ট, বার, ব্যাঙ্কোয়েট হল—কী নয়! পলিক্লিনিক, বিজনেস সেন্টার, শপিং প্লাজা, ফুড শপ—সব। প্রতিটি বাড়ির সঙ্গে থাকবে বাগান। পলিউশন-ফ্রি কমপ্লেক্স। সম্পূর্ণ নতুন ধরনের একটা টেকনিকে বানাচ্ছে বলে ফ্ল্যাটের দামও বেশ শস্তা। বিজ্ঞাপন বেরুবার আগেই বারো আনা বুকিং শেষ। এই একটা কাজেই বহু কোটি টাকা লাভ। গাল্‌ফ কান্ট্রিজ থেকে বিলিয়ন ডলার প্রজেক্টের অফার পেয়েছে ছেলে, কিন্তু পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে—কলকাতার কাজ শেষ না হলে অন্য কাজের ব্যাপারে কথা বলবে না। আচ্ছা, আপনিই বলুন, এই ধরনের কথাবার্তা শুনলে কার না মাথা ঘুরে যায়!'

'পাত্রকে দেখে কোনওরকমের খটকা লাগেনি আপনাদের ?'

'না। বরং প্রীতমকে দেখে মনে হয়েছিল—দাদা-বউদির প্রতিটি কথাই সত্যি। ছেলের চেহারা যেমন, ব্যবহারও তেমনি। বারবার বলছিল, আমাদের কথার ওপর পুরোপুরি নির্ভর না করে আপনারা আমার সম্পর্কে একটু খোঁজখবর নিন। বছরখানেক বাদে মিনি-টাউনশিপের কাজ নিয়ে কলকাতায় তো আমাকে কিছুদিন থাকতেই হবে, বিয়ে না হয় তখনই হবে।'

'তা, আপনারা কোনও খোঁজখবর নেননি ?'

'না। ছেলে বলল—তিনদিন বাদে ওকে ক্যালিফোর্নিয়ায় ছুটতে হবে। সেখান থেকে ফ্রাঙ্কফুর্ট, তারপর টোকিও। টোকিও থেকে নিউ ইয়র্ক। হাসতে হাসতে বলেছিল, আমার পায়ের তলায় সর্ষে আছে, এক জায়গায় থাকতে পারি না বেশিক্ষণ।'

ইন্সপেক্টর ঘোষরায় একটু বিরক্ত মুখে বললেন, 'চিট, সুইন্ডলাররা খুব মিষ্টি-মিষ্টি কথা বলে থাকে। আপনাদের একটু খোঁজখবর নেওয়া উচিত ছিল।'

'ছিল। আমরা নিতামও, কিন্তু বুলার জন্যে পারিনি।'

'কেন ? ও কী করেছিল ?'

'ছেলে বলেছিল মেয়ের সঙ্গে একটু কথা বলতে চায়। আমরা বললাম, বেশ। একদিন এই বাড়িতেই ওরা কয়েক ঘণ্টা কথা বলেছিল। ওর সঙ্গে কথা বলে মেয়ে তো মুগ্ধ। আমাদের তখন মনে হল, হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা ঠিক হবে না। তা ছাড়া ভাগ্য বলেও তো একটা কথা আছে। খুব দেখেশুনে বিয়ে দেওয়া হল, কিন্তু সে বিয়ে টিকল না। আবার খোঁজখবর না-নেওয়া বিয়ে—দেখা গেল সে বিয়ে কত সুখের! এমন হয় না ?'

'হয়, কখনও-কখনও হয়। তবে ভাগ্য মানা মানে কিন্তু চোখ বুজে থাকা নয়। আপনারা একটু যদি খোঁজখবর—।'

মেয়ের বাবা কান্না সামলে নিয়েছেন। নিচু গলায় বললেন, 'ভেবেছিলাম, বিয়ে হলে ভাল হবে, নয় খারাপ। কিন্তু কী করে বুঝব যে, মেয়েটাই থাকবে না! ও যে নেই, আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না।'

ইন্সপেক্টর ঘোষরায় নোটবুকের দিকে খুব একটা না তাকিয়ে খসখস করে নোট নিতে পারেন। ইতিমধ্যেই ওঁর বেশ কিছু নোট নেওয়া হয়ে গিয়েছে। এবার ডট পেনটা একবার কামড়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'বিয়ে এত তাড়াতাড়ি ঠিক করার প্রস্তাব পাত্রপক্ষ কী ভাবে দিয়েছিল ?'

দুদিকে মাথা নেড়ে জবাব দিলেন প্রসেনজিৎ। 'পরিস্থিতিটা ওরা এমন ভাবে তৈরি করেছিল যে, প্রস্তাবটা আমরাই দিয়েছিলাম। শুধু দাদা নয়, আমাদের সবারই আশঙ্কা হয়েছিল—এত বড় সম্বন্ধটা যদি হাতছাড়া হয়ে যায়! আমরা ভেবেছিলাম এখন রেজিস্ট্রিটা হয়ে যাক, পরে না হয় বিয়ের অনুষ্ঠান করা যাবে। আমাদের আত্মীয়বন্ধুর সংখ্যাটা বিরাট। বলব না বলব না করেও বেশ কয়েকজনকে বলা হয়ে গিয়েছিল। বাসরঘরের পরিকল্পনাটা ওদেরই একজনের মাথা থেকে বেরিয়েছিল। বুলাকে সবাই খুব ভালবাসে। বলেছিল—বুলার আমরা দুটো বাসরঘর করব। এটা ছোট, পরেরটা বড়। আমাদের বাড়িতে মেয়ের বিয়ে হয়নি বহুদিন। তা ছাড়া বুলা দাদার একমাত্র মেয়ে। কিন্তু কিছু করব না বললেও অনেক কিছু করা হয়ে গিয়েছিল শেষ পর্যন্ত।'

'আচ্ছা বিয়েতে মেয়েকে আপনারা গয়না দিয়েছিলেন কত টাকার?'

ইন্সপেক্টরের প্রশ্নের উত্তরে প্রসেনজিৎ দাদার দিকে তাকালেন। অরিজিৎ একটু কেশে নিয়ে বললেন, 'বুলার মায়ের বেশ কিছু ভারী-ভারী গয়না ছিল, সেগুলো পালিশ করে দেওয়া হয়েছে। আমরা বউবাজারে গিয়েও কিছু কেনাকাটা করেছি।'

'টাকার অঙ্কে কত হবে? সব মিলিয়ে কত টাকার গয়না?'

'তা কম করে সাত-আট লাখ।'

উত্তর শুনে ইন্সপেক্টরের ভুরু কপালের দিকে উঠে গিয়েছিল একটুখানি। উনি টাকার অঙ্কটা চট করে নোট নিয়ে বললেন, 'আজ সকালে তো মেয়ের গায়ে আপনারা একটা গয়নাও দেখতে পাননি?'

'না।'

'আচ্ছা, নগদ টাকা কিছু? পণবাবদ কিছু নেয়নি পাত্রপক্ষ?'

দুদিকে মাথা নাড়িয়ে হতাশ গলায় প্রসেনজিৎ জবাব দিলেন, 'তখন ভেবেছিলাম—কত বড় মন! এখন বুঝতে পারছি, পুরোটাই চাল। আমাদের মধ্যে কারও-কারও একটু দোনামনা ছিল—কিন্তু ছেলের ওই কথা শুনে সব সংশয় কেটে গিয়েছিল সকলের। আধুনিক কোনও শিক্ষিত ছেলেকে তো সরাসরি আর পণের কথা জিজ্ঞেস করা যায় না। তা, আমি একটু ঘুরিয়ে-ফিরিয়েই প্রসঙ্গটা তুলেছিলাম। বলেছিলাম—তোমাকে তো হঠাৎই কিছু বাড়তি সময় কলকাতায় থেকে যেতে হচ্ছে—বাড়তি কিছু খরচপত্তরও আছে; উপস্থিত আমরা না হয় কিছু—। বুলার বিয়ের জন্যে দাদার একটা প্রিপারেশন তো ছিলই। বুলার নামে টাকা রাখা মানে টাকাটা তো বুলারই। তুমি এখন আমাদের বাড়িরই ছেলে। যদি এখন তোমার টাকার দরকার হয়—কোনরকম সঙ্কোচ কোরো না কিন্তু।'

'কী বলেছিল তার উত্তরে?'

'প্রীতম চোখেমুখে এমন একটা ভাব ফুটিয়ে তুলেছিল যেন কত না দুঃখ পেয়েছে আমার কথা শুনে। একটু থেমে বলেছিল—আপনারা আমার জন্যে এ ভাবে ভেবেছেন তার জন্যে আমি কৃতজ্ঞ, কিন্তু দয়া করে এসব আর বলবেন না। ভুল বুঝবেন না আমাকে। টাকাপয়সা, জিনিসপত্র কিছুই আমি নিতে পারব না। মেয়েকেও এখন সাজাতে বসবেন না আপনারা। এখন শুধু বিয়েটা রেজিস্ট্রি করা। ব্যস, আর কিছু নয়! ইন্সপেক্টর, আপনিই বলুন, এসব শোনার পরে কারও মনে কি কোনও সন্দেহ থাকে?'

মাথার পাতলা চুলের মধ্যে আঙুল চালাতে-চালাতে ইন্সপেক্টর জবাব দিলেন, 'পৃথিবীতে

ভাল মানুষের সংখ্যা বেশি বলেই ঠগ-জোচ্চোররা করে খাচ্ছে। তবে শুধু জোচ্চুরির ওপর দিয়ে গেলে এত আফসোস হত না। আসলে আমার মনে হয়, ফ্রডটা আপনাদের মেয়ের গা থেকে গয়না খোলার সময় মেয়ের কাছ থেকে বড় রকমের বাধাটাধা, না হলে—।'

'না হলে কী?'

নিজের অনুমানের বাকি অংশটুকু গিলে ফেলে ইন্সপেক্টর জিজ্ঞেস করলেন, 'আজ ভোররাতের দিকে আপনাদের বাড়ির সবাই কি ঘুমিয়ে ছিলেন?'

'হ্যাঁ, সবাই। সারাদিনের খাটাখাটনি তো ছিলই, তারপর মাঝরাত্তির পর্যন্ত অত হই-হুল্লোড়—।'

'কেউ কোনও রকম শব্দটব্দ শোনেনি?'

'না।'

'ভোরে মেয়েকে কে প্রথম দেখেছিল?'

'আমাদের কাজের মেয়ে মিনতি। বয়েস কম। বুলার ঘর ভেজানো দেখে উঁকি মারে, তারপরেই ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠেছিল।'

ইন্সপেক্টর আবার একটা প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই সাদা পোশাকের একজন পুলিশ এসে বলল, 'স্যার, আপনার ফোন।'

'কে করেছে?'

'পরেশ চৌধুরী স্যার।'

উত্তর শুনে লাফিয়ে উঠলেন ইন্সপেক্টর, তারপর ওদিকের ওই ঘরটায় প্রায় ছুটে গেলেন। রায়দের একটা ফোন ও-ঘরে। আজ সকালে কোয়ার্টার্সে বসে টেলিফোনে খবর পাওয়ার পরে টেলিফোনেই এক প্রস্থ জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন ইন্সপেক্টর। এ বাড়ির ফোন নাম্বারটা নিয়ে নিয়েছিলেন তখনই। তারপর সাব-ইন্সপেক্টর পরেশ চৌধুরীকে গলফ গ্রিনের একটা বাড়ি রেড করতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। চৌধুরী সঙ্গে সঙ্গে ছুটেছিলেন। ওর একটা ফোন থানায় থাকতে থাকতেই পেয়েছিলেন ঘোষরায়। চৌধুরী বলেছিলেন: চল্লিশ নম্বরে তালা দেওয়া স্যার। কী করব? ঘোষরায় নির্দেশ দিয়েছিলেন; আড়ালে দাঁড়িয়ে কম করে ঘণ্টাদুয়েক নজর রাখো বাড়ির ওপর। কাউকে ঢুকতে দেখলেই ফোন করবে আমাকে। প্রথমে ফোন করবে থানায়, না পেলে রায়দের বাড়িতে।'

পরেশের এটা দ্বিতীয় ফোন। ফোনের রিসিভার কানে চেপে চাপা গলায় ঘোষরায় জিজ্ঞেস করলেন, 'কোনও খবর আছে কি?'

পরেশের গলার স্বরও চাপা। আছে স্যার। এই মাত্র চল্লিশ নম্বরে এক ভদ্রলোক আর এক ভদ্রমহিলা ঢুকলেন।'

'বয়েস কেমন?'

'মাঝবয়েসী। পঞ্চাশ-টঞ্চাশ হবে।'

ইন্সপেক্টরের গলার স্বর এবার আরও খাদে নেমে এল। 'দূরে দাঁড়িয়ে নজর রাখো আর কেউ ঢুকছে কি না। এই আধঘণ্টাটাক। তারপর বাড়ির সবাইকে অ্যারেস্ট করো। বাড়ির তল্লাশি নাও। তারপরে ওদের নিয়ে থানায় চলে এসো। আসার আগে ওই বাড়িতে তালা দিয়ে একজন গার্ড পোস্টিং করবে। রাইট? গুড লাক।'

ফোন রেখে ইন্সপেক্টর আগের জায়গায় ফিরে আসতেই উৎকণ্ঠার সঙ্গে প্রসেনজিৎ জিজ্ঞেস করলেন, 'আমাদের ব্যাপারে কি কোনও খবর পেলেন?'

কপালে ভাঁজ ফেলে গম্ভীর গলায় ঘোষরায় বললেন, 'ন্‌না, অন্য ব্যাপারে ফোন। ঠিক আছে, আমি এখন যাচ্ছি। পরে আসব আবার। আমাদের লোকজন থাকল। বডির ঘরে কেউ ঢুকবেন না, কোনও জিনিসে হাত দেবেন না। ফরেন্সিক এক্সপার্টদের কাজ মিটে গেলে বডি মর্গে যাবে পোস্ট-মর্টেমের জন্যে। ভাল কথা, প্রীতম, মানে পাত্রের দাদা-বউদির বাড়ির নম্বর তো চব্বিশ। না?'

'হ্যাঁ।'

'দাদা-বউদির নাম তো সৈকত গুহ আর উমা গুহ?'

'হ্যাঁ।'

দুঁদে ইন্সপেক্টর ঘোষরায়ের মুখে বাঁকানো একটা হাসি ফুটে উঠেছিল। উনি একটু টেনে টেনে বললেন, 'এই যে প্রীতম, সৈকত, উমা—এই তিনটে নামই বোগাস। আমাদের প্রথম কাজ হল আসল নামগুলো উদ্ধার করে অপরাধীদের ধরা। কিংবা—।'

'কিংবা কী?'

'কিংবা অপরাধীদের ধরার পরে আসল নামগুলো জেনে নেওয়া।' কথাটা বলার পরেই বিশাল চেহারার পুলিশ ইন্সপেক্টর অবনী ঘোষরায় বাড়ির দোরগোড়ায় দাঁড়ানো জিপে গিয়ে উঠে বসলেন। ড্রাইভার সিটেই ছিল, ইন্সপেক্টর বসতে না বসতেই গাড়ি ছুট লাগাল সামনের দিকে।

।। দুই ।।

নভেম্বরের শুরু। কলকাতার বাতাসে মৃদু শীতের ভাব। সকাল সাতটায় ঝলমলে রোদ ছড়িয়ে পড়েছে সব জায়গায়, কিন্তু রোদে তাপ নেই বিশেষ। ইন্সপেক্টর অবনী ঘোষরায় একবারও না থেমে লম্বা পায়ে সিঁড়ি ভেঙে চার তলা বাড়িটার তিনতলায় উঠে এলেন। এই ফ্লোরে দুটো ফ্ল্যাট। বাঁদিকের দরজায় পিতলের হরফে লেখা—কৌশিক মিত্র। কোনও পরিচয় লেখা নেই, কিন্তু কলকাতার অনেকেই তরুণ এই প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটরের কাজকর্মের খোঁজ রেখে থাকেন।

বেশ কিছু জটিল রহস্যের সমাধান করেছে গোয়েন্দা, কিন্তু মানুষটি খুব লাজুক প্রকৃতির। খুনি, ডাকাত, গুণ্ডাদের মোকাবিলা করে হাসতে হাসতে—কিন্তু ভয় পায় একটি জিনিসকে, তার নাম প্রচার। তদন্তে সাফল্য এলেই মিডিয়া তাড়া করে গোয়েন্দাকে। গোয়েন্দা তখন গা ঢাকা দেয়। ওর গা ঢাকা দেওয়ার একটা প্রিয় জায়গা হল জঙ্গল।

ইন্সপেক্টর গোয়েন্দার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কয়েক মুহূর্ত হাঁপালেন, তারপর ডোরবেল বাজালেন। দরজা খুলল কৌশিক, তারপর আপ্যায়নের গলায় বলল, 'আসুন-আসুন অবনীদা, অনেক দিন পরে দেখা হল আপনার সঙ্গে।'

পকেট থেকে তোয়ালে-রুমাল বার করে মুখ-গলার ঘাম মুছতে মুছতে গোয়েন্দার অবনীদা বললেন, 'খুব ভয় ছিল। তোমার সঙ্গে দেখা হবে কি না—।'

'আমি তো সাত দিন ছিলাম না, কাল রাত্তিরে ফিরেছি।'

'কোথায় গিয়েছিলে ?'

'আমার জঙ্গুলে স্বভাব। সুন্দরবনে গিয়েছিলাম, কিন্তু কপাল খারাপ, বাঘের দেখা পাইনি। আপনার খবর কী বলুন ?

'আমার ? তুমি বাঘের দেখা পাওনি, আর আমি বাঘের তাড়া খাচ্ছি কাল সন্ধে থেকে। চাকরিজীবনের শেষের দিকে এসে এ ভাবে বড় কর্তা, মেজ কর্তার ধাতানি খাওয়া কি পোষায় !'

হাসতে হাসতে গোয়েন্দা বলল, 'কেন, কী হল আবার ?'

অবাক হয়ে ইন্সপেক্টর বললেন, 'কী হল জিজ্ঞেস করছ তুমি ! আজ সকলের খবরের কাগজ দেখনি ? কাল সন্ধে-রাতের টিভির খবর শোনোনি ?'

আর এক দফা হেসে গোয়েন্দা বলল, 'আপনি তো জানেন আমি ছুটিতে থাকলে খবরের দিকে চোখ-কান বন্ধ করে রাখি। জঙ্গলে গান শুনব বলে ক্যাসেট-প্লেয়ার নিয়েছি, কিন্তু ট্রানজিস্টার নিইনি। সেই জের এখনও চলছে। ওই তো আজকের খবরের কাগজ পড়ে আছে ওখানে, কিন্তু ছুঁয়েও দেখিনি এখনও।'

'দেখ। এটা দেখ। আমার সঙ্গে আরও চারটে কাগজ আছে—সেগুলোও দেখ।'

'ঠিক আছে, দেখছি। কিন্তু আপনি দাঁড়িয়ে কেন, বসুন।'

বলার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পাশের চেয়ারটায় ধপ করে বসে পড়লেন বিশাল চেহারার ইন্সপেক্টর ঘোষরায়। ওঁর মাথার ওপরের পাখাটা চালিয়ে দিয়ে কৌশিক বলল, 'অবনীদা, আপনার কিন্তু এ-ভাবে প্রায় ছুটে তিনতলার সিঁড়ি ভাঙা উচিত হয়নি।'

'কে বলল ছুটে এসেছি ?'

'এর আবার বলাবলির কী আছে, লাফিয়ে-লাফিয়ে সিঁড়ি না ভাঙলে এ-ভাবে হাঁপাতেন না। ডাক্তার বলে, পঞ্চাশ পেরিয়ে গেলে প্রত্যেকেরই একটু সাবধান হওয়া উচিত। তার ওপর আপনার আবার ভারী শরীর। আপনার শ্যুগারের অবস্থা কেমন এখন ?'

'পরশু পর্যন্ত নর্মাল ছিল, এখন তিন-চার গুণ বেড়ে গেছে নির্ঘাত।'

'কেন ?'

'এই কাগজগুলোয় একবার চোখ বুলিয়ে নাও, তা হলেই বুঝতে পারবে।'

'ঠিক আছে, দেখছি। কিন্তু আপনি তো সাতসকালে বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন—ব্রেকফাস্ট করা হয়নি তো ?'

"আরে, সে হবে'খন—।"

হাসতে হাসতে গোয়েন্দা বলল, 'পৃথিবীর সব জ্ঞানী মানুষরা এই একটা ব্যাপারে একমত। সবাই বলেছেন—পেটে খিদে থাকলে বুদ্ধি খোলে না। আগে আমরা কিছু খেয়ে নিই।'

দু-ঘরের এই ফ্ল্যাটে ব্যাচেলার গোয়েন্দা থাকে। কিন্তু ফ্ল্যাটটা যে ব্যাচেলারের—তা দেখে বোঝার উপায় নেই। ঘরের সব কিছু নিখুঁতভাবে সাজানো। গোয়েন্দার কাজের লোক নিমো সব কিছু সামলায়, কিংবা বলা যেতে পারে—গোয়েন্দার নজরদারিতে একটুও

বেসামাল হতে পারে না। একটা জিনিসে ওর খুব লোভের—তা হল রহস্যভেদ হওয়ার পরে গোয়েন্দার মুখে গল্প শোনা। কৌশিক মাঝেমধ্যে ওকে ধাঁধার জট ছাড়াবার কাজেও লাগায়। ওর সঙ্গে আর একটা ব্যাপারেও হাত লাগায় নিমো—সেটা হল ছুটিছাটার দিনে নতুন-নূতন খাবারদাবার বানাবার এক্সপেরিমেন্টে।

মাত্র দু-তিনটে শব্দ খরচ করে আর হাতের ইঙ্গিতে নিমোকে ব্রেকফাস্ট বানাবার অর্ডার দিয়ে দিল কৌশিক, তারপর আজ সকালের পাঁচটা খবরের কাগজ তুলে নিল কোলের ওপর।

প্রয়োজনে অসম্ভব দ্রুতগতিতে ছাপার হরফ পড়ার একটা কায়দা দীর্ঘদিন ধরে রপ্ত করেছে কৌশিক। একটু কোনাকুনি বা তেরছা করে বই বা কাগজ ধরে, তারপর ওই তেরছা পথ ধরে চোখের দৃষ্টিকে দৌড় করায়। এই দৌড়ে দু-দিকের কিছু-কিছু শব্দ না-পড়া থেকে যায়; তবে তাতে কিছু এসে-যায় না, মূল বিষয়টা ও জেনে যায় চটপট। পাঁচ নম্বর খবরের কাগজের বিশেষ খবরটা শেষ করার আগেই ব্রেকফাস্ট নিয়ে এল নিমো। টম্যাটোর কুচি আর কড়াইশুটি ছড়ানো ডাবল ডিমের ওমলেট। সঙ্গে মোটা সাইজের দু-পিস স্যাকা রুটি। ছোট্ট টেবিল টেনে দুজনের চেয়ারের পাশে খাবার সাজাল নিমো।

খবরের শেষের দিকে দ্রুত চোখ ঘোরাতে ঘোরাতে গোয়েন্দা বলল, 'নিন, শুরু করুন অবনীদা।'

দুশ্চিন্তায় মাথা ভার হয়ে থাকলে মুখ দিয়ে খুব একটা কথা বার হতে চায় না। বাধ্য ছেলের মতো খেতে শুরু করে দিলেন ইন্সপেক্টর।

একটু বাদে পড়া শেষ হল কৌশিকের। খবরের কাগজগুলো সেন্টার-টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখতে রাখতে বলল, 'এ তো একজন জঘন্য অপরাধীর কাজ। এমনও হতে পারে, খুনি স্যাডিস্ট। মেয়েটার বয়েস মাত্র বাইশ, স্যাডিস্ট না হলে কেউ কি ওই ভাবে বিয়ের রাতে বউকে খুন করতে পারে!'

কথাটার কোনও উত্তর দিলেন না ইন্সপেক্টর। ওমলেটের শেষ টুকরোটা মুখে ফেলার একটু বাদে বললেন, 'দৈনিক প্রদীপন দেখলে?'

'হ্যাঁ, অনেকটা লিখেছে দেখছি।'

'লিখেছে তো গালগপ্পো, কিন্তু ওই সব পাকামো করার কী দরকার ছিল?'

'কী পাকামো?'

"রেফারেন্স ক্লিপিং থেকে গত ছ' মাসের আটটা ইনসিডেন্ট তুলে দিয়েছে। চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই আর কিডন্যাপিংয়ের কেস। সবক'টাই সাত জলের তলায় পড়ে আছে। পুলিশ একটারও নিষ্পত্তি করতে পারেনি।"

সায় দেওয়ায় গলায় কৌশিক বলল, 'হ্যাঁ, কেসগুলো তুলে দিয়ে ভাল করেছে প্রদীপন।'

'ভাল না কচু! ওই আটটার মধ্যে চারটের ইনভেস্টিগেটিং অফিসার ছিলাম আমি। খবরের কাগজ মনে করিয়ে দেওয়ায় সাহেবেদের টনক নড়েছে। বড় সাহেব আজ ভোরে জগিংয়ে যাওয়ার আগে ফোন করেছিল আমাকে। তারপর আমর ওপর জগিং চালিয়ে গেল পাক্কা পনেরো মিনিট। এতগুলো সেনসেশনাল কেস, অথচ একটাও আপনি সল্ভ করতে পারেননি। আপনার জন্যেই কাগজওয়ালারা আজ আমাদের এভাবে গালাগালি

দিয়েছে। শুনুন, এখন সে কেসটা ইনভেস্টিগেট করছেন—সেটার দশাও যদি আগেরগুলোর মতো হয়—তা হলে কর্তব্যের খাতিরে আমাকে এমনি কিছু করতে হবে যেটা আপনার পক্ষে ভাল হবে না। এই হচ্ছে বড় পোস্টে থাকার মজা! ধমকাও, গালাগাল দাও, তারপর সব দোষ চাপিয়ে দাও নীচের ধাপের একজনের ঘাড়ে। এর চাইতে পুরনো দিনের সেই কাজির বিচারও বোধহয় ভাল ছিল। শেষ গালাগালটা শুনে আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে উঠেছিল দপ্ করে।'

'সর্বনাশ! কী বললেন তখন?'

'বললাম—স্যর, এবার ঠিক পেরে যাব স্যার। একটু সময় দিন আমাকে।'

কৌশিকের গোঁফের ফাঁকে সূক্ষ্ম একটা হাসির রেখা ফুটে উঠেই মিলিয়ে গিয়েছিল। ও তারিফ করার গলায় বলল, 'বাহ্! আপনি তো দেখছি প্রচণ্ড রাগের মাথাতেও বেশ কায়দা করে কথা চালাতে পারেন।'

তারিফটা বেশ খোলা মনে গ্রহণ করলেন ইন্সপেক্টর, তারপর বললেন, 'আমরা পুরনো দিনের লোক, আমাদের ট্রেনিংয়ের ধরনটাই ছিল আলাদা।'

এক টুকরো রুটি আর ওমলেট মুখে ফেলে কৌশিক বলল, 'আপনার তদন্তের কাজ তো এর মধ্যেই বেশ কিছুটা এগিয়ে গেছে। সন্দেহজনক কিছু পেলেন কোথাও?'

'পেয়েছি।'

'বাহ্! কী পেলেন—কিছু কি এখন বলা যেতে পারে?'

বিশাল চেহারার ইন্সপেক্টর ছেলেমানুষের মতো লজ্জা পেয়ে বললেন, 'তুমি হলে গিয়ে আমার ডাক্তার। তোমার কাছে কিছু গোপন করা মানে শখ করে শরীরে রোগ বয়ে বেড়ানো। তোমাকে আমি পুরো ব্যাপারটাই সংক্ষেপে বলে নিই আগে।'

'বলুন। এক মিনিট—চা খাবেন না কফি?

'কফি, কালো কফি।'

গলা সামান্য ওপরে তুলে হাঁক পাড়ল কৌশিক। 'নিমো, দুটো কালো কফি। একটা চিনি ছাড়া।'

পাখার নীচে বসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে ওমলেট আর রুটি খাওয়ার পরে ইন্সপেক্টরকে বেশ চনমনে দেখাচ্ছিল। তোয়ালে-রুমাল দিয়ে আর একবার চোখমুখ মুছে নেওয়ার পরে বললেন, 'খবরের কাগজ বিস্তর উল্টোপাল্টা মন্তব্য করেছে, তবে আসল ঘটনাটা মোটামুটি ঠিকই লিখেছে।'

'খবরটা পেলেন কখন?'

'কাল সকালে, আমার কোয়ার্টার্সে বসেই। অপারেটর লাইনটা বাড়িতে দিয়ে দিয়েছিল। ফোন করেছিল মেয়ের কাকা। সব শুনে বললাম—এখুনি যাচ্ছি আমরা, তবে তার আগে ছেলের দাদা-বৌদির ঠিকানাটা দিন। পাত্রপক্ষের একটা ঠিকানাই ওরা জানে। গল্ফ গ্রিন। ঠিকানা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এস. আই পরেশকে পাঠিয়ে দিলাম ওখানে।'

'বাহ্! তারপর?'

'আমি ফরেনসিকের লোকজন আর আমাদের ফোটোগ্রাফারকে সঙ্গে নিয়ে ছুটলাম পাত্রীর বাড়িতে। সত্যি, খুব শকিং ব্যাপার। মাত্র বাইশ বছরের একটা ফুটফুটে মেয়ে...।

আমার মনে হয়, গয়না খোলার সময় বাধা দিয়েছিল মেয়েটা। তারই জবাব হল—গলা টিপে খুন। যাই হোক, বাড়ির লোকদের জিজ্ঞাসাবাদ করলাম। বডি পাঠানো হয়েছে পোস্ট-মর্টেমের জন্যে। গলফ গ্রিনের যে ঠিকানা মেয়ের বাড়িতে পেয়েছিলাম, সেই ঠিকানা থেকে পরেশ মাঝবয়সী দুজনকে অ্যারেস্ট করেছিল।'

'কারা ওরা ?'

'আইডেন্টিফিকেশনের জন্যে মেয়ের কাকাকে আনিয়েছিলাম। মেয়ের কাকা বলল—না, এরা ছেলের দাদা-বৌদি নয়, অন্য লোক। গল্ফ গ্রিনের ওই বাড়িটা সার্চ করে একটা ব্লু ফিল্মের ক্যাসেট পাওয়া গেছে।'

'ওই দুজনের পরিচয় পেয়েছেন ?'

'হ্যাঁ। ফ্ল্যাটটা ওঁদেরই। ওঁরা থাকেন গল্ফ ক্লাবে। বাড়িটা গেস্টহাউস হিসেবে বিভিন্ন পার্টির কাছে ভাড়া দেন। ওই ভাড়া-করা গেস্টহাউসটাই পাত্রের দাদা-বৌদি, মানে সাজানো দাদা-বৌদি, নিজেদের বাড়ি বলে চালিয়ে দিয়েছিল। ওর গেস্টহাউস ছেড়ে দিয়েছে পরশুদিন সন্ধেবেলাতেই।'

'কিন্তু এই ধরনের গেস্টহাউস তো বাড়ির মালিকরা কোনও একটা রেফারেন্স ছাড়া দিতে চায় না।'

'ঠিক তাই। গেস্টহাউসের মালিক নিরঞ্জন মজুমদার বললেন, গেস্টহাউস ভাড়া দেওয়ার যাবতীয় দায়িত্ব উনি এক ট্রাভেল এজেন্টের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। এজেন্ট তার জানাশোনা পার্টিকেই শুধু ভাড়া দেয়। সুতরাং ভাড়াটেদের ব্যাপারে বাড়িওয়ালার কোনও মাথাব্যথা নেই। ফ্ল্যাট ঠিকঠাক আছে কি না সেটা দেখার জন্যে ওঁরা মাঝেমধ্যে আসেন। কালকের আসাটাও ছিল ওইরকম।'

কৌশিকের কপালে ছোট্ট একটা ভাঁজ ফুটে উঠেছিল। নিজের মনে বলার ভঙ্গিতে বলল, 'পাকা দলের কাজ!' তারপর প্রশ্ন করল, 'আপনি ওই ট্রাভেল এজেন্টের খোঁজ নিয়েছেন তো ?'

'অবশ্যই। ট্রাভেল এজেন্সির নাম ট্রিপস্ অ্যান্ড ট্রিপ্স। চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউতে অফিস। এজেন্টের নাম কী যেন সান্যাল। ইনক্যুয়ারিতে পরেশই গিয়েছিল। খাতা খুলে দেখা গেল—অমুক তারিখ থেকে অমুক তারিখ পর্যন্ত মাদ্রাজের এক মিস্টার আর মিসেস গুহ ভাড়া নিয়েছিল। টাকা পয়সা মিটিয়ে দিয়েছে আগেই।'

'কিন্তু ওদের কোনও রেফারেন্স ছিল না ?'

'ছিল। প্রফেসর মৃদুল ভট্টাচার্য।'

'কে তিনি ?'

'শুনলাম বেশ বড় একজন স্কলার। দেশবিদেশে খুব নাম। তুমি ওঁর নাম শোনোনি ?'

উত্তরে একটু বিব্রত মুখে দু'দিকে মাথা নাড়াল কৌশিক।

সবজান্তার ভঙ্গিতে ইন্সপেক্টর ঘোষরায় বললেন, 'তুমি তো খুব পড়াশুনো করা লোক, তোমার তো ওঁর নাম জানা উচিত ছিল। গত মাসেই ট্রাইবালদের ওপর ওঁর কাজ নিয়ে মস্ত একটা ইন্টারভিউ বেরিয়েছে ডেকান হেরাল্ডে।'

'আপনি কলকাতায় বসে ডেকান হেরাল্ডও পড়ে থাকেন ?'

'পাগল ! আমার অত পড়ার সময় কোথায় ! আমি তো কথায় কথায় প্রফেসর ভট্টাচার্যের কাছ থেকেই জানতে পারলাম যে—।'

'প্রফেসর ভট্টাচার্যকে আপনি পেলেন কোথায় ?'

'পরেশ ট্রাভেল এজেন্টের কাছ থেকে প্রফেসরের ঠিকানা এনেছিল। ওর কাছ থেকে সেই ঠিকানা নিয়ে আমিই গিয়েছিলাম ইনক্যুয়ারি করতে।'

নড়েচড়ে বসল কৌশিক। 'করেছেন কি! একদিনের মধ্যে এত কাজ! একেই বলে ইনক্রেডিবল স্পিড! তা, ওদের ব্যাপারে কী বললেন প্রোফেসর ?'

'প্রথমে মনে করতে পারছিলেন না। পরে বললেন : ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে, গত মাসের পঁচিশ তারিখে চেন্নাইয়ের একটা কনফারেন্স সেরে ফেরার পথে হাওড়া মেলে মিস্টার আর মিসেস গুহর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। ওঁরা প্রবাসী বাঙালি। ইদানীং কলকাতায় ওঁদের খুব একটা যাতায়াত নেই। ওঁরা নেমে গিয়েছিলেন ভাইজাগে। কথায় কথায় বলেছিলেন—এ মাসে একবার কলকাতায় এসে কয়েক দিন থাকবেন, ভাল কোনও গেস্টহাউস আমার জানা আছে কি না জানতে চেয়েছিলেন। তখন ওই ট্রাভেল এজেন্টের নাম করে বলেছিলাম—একবার খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন—। আমার একটা কার্ডের পেছনে ওই এজেন্টের নাম-ঠিকানা লিখে দিয়েছিলাম। আমি ওই ট্রাভেল এজেন্টের পুরনো ক্লায়েন্ট। আমি এয়ার-টিকেট, ট্রেন-টিকেট সব সময় ওদের কাছ থেকেই করে থাকি। সুতরাং আমার রেফারেন্স নিয়ে কেউ ওদের কাছে গেলে ওরা একটু সাহায্য করার চেষ্টা করবে—এ তো স্বাভাবিক ব্যাপার।'

'ঠিক। তা, আর কোনও ইনফরমেশন দিতে পারলেন না ভদ্রলোক ? মাদ্রাজের কোথায় ওরা থাকেটাকে—।'

'না। জিজ্ঞেস করেছিলাম—। আসলে ট্রেনের আলাপ যেমন হয়ে থাকে—। ট্রেনে আলাপ, তারপর ওই ট্রেনেই শেষ।'

'কোন্ কলেজে পড়ান প্রফেসর ?'

'এখন আর পড়ান না, চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন। ওঁর কাজ এখন গবেষণা, লেখালেখি আর মাঝেমধ্যেই এখানে-সেখানে বক্তৃতা দিয়ে বেড়ানো।'

'কিন্তু ওঁর জীবিকা—।'

'জিজ্ঞেস করেছিলাম। তা বললেন, এক বিলিতি পাবলিশার ওঁকে একটা বই লিখে দেওয়ার জন্যে এক কোটি টাকা অ্যাডভান্স দিয়েছে। এক কোটি! অধ্যাপক পাগ্‌লা কিনা বুঝতে পারছি না।'

'কেন ? পাগ্‌লা ভাবছেন কেন ? টাকার অঙ্ক শুনে ?'

'আলবৎ। এক কোটি মানে একশো লক্ষ টাকা। ওই টাকাটা আবার পুরো নয়, অ্যাডভান্স। ভারতীয় লেখকরা এইরকম টাকা পেলে সবাই লেখক হওয়ার জন্যে ছুটত।'

চাপা একটা হাসি ছড়িয়ে পড়েছিল কৌশিকের মুখে। 'ছুটলে তো আর লেখক হওয়া যায় না। তবে ভাল লিখলে নাম-যশের সঙ্গে ভাল টাকাও পাওয়া যায় আজকাল। বিদেশে অনেক আগে থেকেই পাওয়া যাচ্ছিল, এখন কোনও-কোনও ভারতীয় লেখকও পাচ্ছেন।'

'তা বলে এক কোটি টাকা!'

'এর চেয়েও বেশি টাকা পাওয়া যায়। অরুন্ধতী রায়ের নাম শুনেছেন তো ?'

'একটু শোনা-শোনা মনে হচ্ছে—।'

'এই ভদ্রমহিলা জীবনে এখনও পর্যন্ত একটিই উপন্যাস লিখেছেন। খুব একটা বড় উপন্যাস নয়। পাতার সংখ্যা সাড়ে-তিনশোর মতো হবে। বিখ্যাত এক পাবলিশিং জায়ান্ট হারপার কলিন্স ভদ্রমহিলার বইটা ছাপবে বলে পাণ্ডুলিপি হাতে নিয়ে কত টাকা অ্যাডভান্স করেছে বলুন তো?'

'কত?'

'বেশি নয়, মাত্র সাড়ে তিন কোটি টাকা।'

'অ্যাঁ! বলো কী? প্রফেসর ভট্‌চাজ তা হলে তো পাগ্‌লা নয়। তবে পণ্ডিতদের যে দোষটা থাকে—সেটা আছে পুরোমাত্রায়। একবার লেকচার দিতে শুরু করলে আর থামতে পারে না। আদিবাসীদের লাইফস্টাইল, সভ্যতার অগ্রগতি—এসব জেনে আমার কী লাভ? আমি একজন পুলিশ ইন্সপেক্টর। খুনির হাতে হাতকড়া পরানো ছাড়া এখন অন্য কোনও চিন্তা নেই আমার মাথায়। প্রফেসরের বাড়িতে গিয়ে আমার দুটো মূল্যবান ঘণ্টা বরবাদ হল।'

'কেন, বরবাদ হল বলছেন কেন?'

'তা নয়ত কী? পণ্ডিতি লেকচার শুনে আমারা কী হবে?'

'লেকচারের কথা বাদ দিন। ওই প্রফেসরের কাছে গিয়ে তো ওই নকল দাদা-বৌদি সম্পর্কে আপনি একটা দরকারি তথ্য জানতে পারলেন।'

'কী তথ্য?'

'ওই দাদা-বৌদি-সাজা পার্টি আসলে মাদ্রাজের বাসিন্দা।'

'আরে বাবা, মাদ্রাজ একটা মেগা সিটি, তার মধ্যে কোথায় ওরা লুকিয়ে বসে আছে—কারও পক্ষে কি বোঝা সম্ভব! তা ছাড়া ওদেব চেহারার বর্ণনার ওপরেও আমি খুব একটা জোর দিতে চাইছি না। বোঝাই যাচ্ছে, বেশ সেয়ানা র‍্যাকেট। মেয়ের বাড়িতে পাত্রের নকল দাদা-বৌদি নিশ্চয়ই ছদ্মবেশ ধরে গিয়েছিল। উইগ, অন্য কোনও ডিজাইনের চশমা, বানানো তিল-আঁচিল—এই সব দিয়ে মেক-আপ নিয়ে গিয়েছিল নির্ঘাত।'

একটু গলা তুলেই ইন্সপেক্টরকে সমর্থন জানাল কৌশিক—'আপনার সঙ্গে এ-ব্যাপারে আমি একমত। কিন্তু আইডেন্টিফিকেশনের জন্যে যখন মেয়ের কাকাকে ডেকে এনেছিলেন তখন কি তাঁকে এই ব্যাপারটা বলে দিয়েছিলেন?'

'কোন্‌ ব্যাপারটা?'

'একটু খুঁটিয়ে দেখবেন দাদা-বৌদিকে। ধরে নিন, এরাই ছদ্মবেশ ধরে আপনাদের বাড়িতে বিয়ের সম্বন্ধ করতে গিয়েছিল—। এইরকম কিছু বলেছিলেন কি?'

'না তো। কিন্তু—।'

'কিন্তু কী?'

কৌশিকের প্রশ্নের উত্তরে এবার একটা হায়-হায় করার ছাপ ফুটে উঠেছিল ইন্সপেক্টরের মুখে। 'ইশ্‌! মেয়ের কাকাকে এই লাইনে একটু বুঝিয়ে দিলে ভাল হত!'

'কেন-কেন, এ-কথা এখন বলছেন কেন?'

'মেয়ের কাকা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আমাকে বলেছিল; ন্‌না, এরা পাত্রের দাদা-বৌদি নয়। তবে এই ভদ্রমহিলার সঙ্গে ওর বৌদির চেহারার কোথায় যেন একটা মিল আছে!

অথচ আমি ব্যাপারটাকে একেবারেই গুরুত্ব দিইনি। ভেবেছিলাম দুজনের মধ্যে মিল তো থাকতেই পারে। তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে ওই চিটদুটো আমাকে বোকা বানিয়ে সরে পড়েছে।' কথাটা বলার পরেই লাফিয়ে উঠলেন ইন্সপেক্টর। 'ওঁদের গল্‌ফ ক্লাবের ঠিকানা আমার ডায়েরিতে নোট করা আছে। এক্ষুনি তা হলে ঘুরে আসি একবার।'

নিস্পৃহ গলায় উত্তর দিল কৌশিক। 'কী লাভ? ওরা ওই র‍্যাকেটের দাদা-বৌদি হলে আপনাকে নিশ্চয়ই ঠিক ঠিকানা দেয়নি।'

ইন্সপেক্টরের মুখ আবার আগের মতো কালো হয়ে গিয়েছিল। 'কিন্তু ওরা আমাকে ওই ট্রাভেল এজেন্টের ঠিকানা দিল কেন? এজেন্টের খাতা উলটে তো দেখা গেল—চব্বিশ নম্বর বাড়ি সত্যি-সত্যি এক মিস্টার আর মিসেস গুহকে ভাড়া দেওয়া হয়েছিল। রেফারেন্সের জায়গায় প্রফেসর ভট্টাচার্যের নাম লেখা আছে। প্রফেসরের স্টেটমেন্টের মধ্যেও কোনও কনট্রাডিকশন নেই। মিস্টার মজুমদার তো এসব নিয়েও মিথ্যে কথা বলতে পারত!'

'পারত। তবে ইচ্ছে করেই বলেনি।'

'কেন?'

'ওরা আপনাকে দু-চার ঘণ্টা অন্য দিকে আটকে রাখতে চেয়েছিল। সেটা ওরা পেরেওছে।'

'তাতে ওদের কী লাভ?'

'লাভ তো আছেই। তল্পিতল্পা গুটিয়ে সরে পড়ার জন্যে ওদের কিছুটা সময়ের প্রয়োজন ছিল। কায়দা করে আপনাকে অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে সেই সময়টা ওরা পেয়ে গেছে।'

থমথমে মুখে দু'দিকে মাথা নাড়তে নাড়তে ইন্সপেক্টর বললেন, 'এটা নিয়ে তুমি একটু বেশি ভেবে ফেলেছ কৌশিক।' বলার পরে উনি সঙ্গের ফোলিও ব্যাগটা খুলে একটা মোটা ডায়েরি টেনে বার করলেন, 'আরে এই তো, মজুমদারের গল্‌ফ ক্লাবের ঠিকানার সঙ্গে ফোন নাম্বারটাও দেওয়া আছে।'

ঘরের কোনায় কৌশিকের টেলিফোন। ডায়েরি হাতে ওখানে উঠে গিয়ে ফোন করলেন ইন্সপেক্টর। তারপর ফিরে এসে ভাঙা-ভাঙা গলায় বললেন, 'ওরা আমাকে ভুল নাম্বার দিয়েছে। ওখানে ওই নামে কেউ থাকে না। ঠিকানাটাও ভুল। ওটা একটা ইলেকট্রিক্যাল গুড্‌সের দোকান।'

॥ তিন ॥

কৌশিকের চোখেমুখে এবার একটু বিব্রত হওয়ার ভাব ফুটে উঠল। নিচু গলায় বলল, 'অরিজিৎবাবু, ঘটনাটা যে কতখানি মর্মান্তিক—কী বলব! আপনার একমাত্র মেয়ে, বাড়ির সবার কত আদরের—আমি আপনাদের মনের অবস্থা বুঝতে পারছি। কিন্তু ভয়ংকর

অপরাধীকে ধরার সবরকম চেষ্টা তো আমাদের চালাতে হবেই। ইন্সপেক্টর অবনী ঘোষরায় অত্যন্ত দক্ষ এবং সৎ ইন্সপেক্টর। উনি ওঁর তদন্তের কাজে পুরোমাত্রায় লেগে পড়েছেন। আমি একজন সামান্য প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর, ওঁর পাশে থেকে ওঁকে একটু সাহায্য করবার চেষ্টা করব—তবে মনে হয় না আমার সাহায্যের কোনও দরকার হবে শেষ পর্যন্ত। উনি আমাকে ভালবাসেন বলেই আমাকে এই কাজে জড়িয়েছেন। আমি আমার সাধ্যমতো যা করার করব। ঘণ্টাদুয়েক ধরে আপনাদের বিস্তর প্রশ্ন করেছি। দেখি, আপনাদের উত্তরগুলো থেকে কোনও সূত্র মেলে কি না। আচ্ছা, এবার আমার শেষ প্রশ্ন—অপরাধীরা কি আপনাদের বাড়িতে কিছু ফেলে গেছে?'

দুদিকে মাথা নাড়াতে নাড়াতে জবাব দিলেন অরিজিৎ রায়, 'না। উপহার বলতে ওদের পাঠানো ওই শাড়িটাড়ি আর কিছু ঝুটো গয়না।'

'না-না, ওগুলো না। ওগুলো তো দেখলামই। ওসবের বাইরে আর কিছু? খুব তুচ্ছ কোনও জিনিস—যা সাধারণত আমরা হিসেবের মধ্যে ধবি না।'

এবার উত্তর দিলেন খুন-হওয়া পাত্রী বুলার কাকা প্রসেনজিৎ। 'হ্যাঁ-হ্যাঁ মনে পড়েছে, কিন্তু সে তো খুবই ইনসিগনিফিক্যান্ট—। আপনার কোনও কাজে আসবে না।'

গোয়েন্দার চোখ একটু ধারালো হয়ে উঠেছিল। 'জিনিসটা কী?'

'দাঁড়ান, একটু মনে করে বলতে হবে। গাঁয়ের একটা সারের দোকানের ক্যালেন্ডার আর একটা পুরনো খবরের কাগজ জড়ানো হলুদ হয়ে-যাওয়া আদ্যিকালের ফোটোগ্রাফ। সব একটা প্লাস্টিকের প্যাকেটে ছিল।'

'কোথায় ওগুলো? একটু আনবেন?'

'খুঁজে পাব কি! বিয়েবাড়িতে জিনিসপত্র সব টানাহ্যাঁচড়া হয়েছে। দেখছি।' প্রসেনজিৎ বসার ঘর থেকে উঠে গেলেন।

ফিরে এলেন একটু বাদেই। তারপর হাতের প্যাকেটটা গোয়েন্দার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'এই যে।'

প্যাকেট থেকে প্রথমে বেরুল ক্যালেন্ডার। খুব শস্তার ক্যালেন্ডার। প্রায় পুরো পাতাজোড়া মা কালীর ছবি, নীচে ছোট হরফে বাংলা তারিখ। প্যাকেটের দ্বিতীয় সম্পত্তি হল পুরনো খবরের কাগজে জড়ানো পোকায়-কাটা একটা হলুদ ছবি। তৃতীয় সম্পত্তি একটা পলকা ডট পেন।'

জিনিসগুলো আবার প্লাস্টিকের প্যাকেটে ভরে ফেলে কৌশিক বলল, 'এগুলো কি আমি এখন আমার কাছে রাখতে পারি?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ। কী আশ্চর্য, এ আর কী এমন—!'

প্লাস্টিকের প্যাকেটটা হাতের ফোলিও ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে গোয়েন্দা জিজ্ঞেস করল, 'এগুলো আপনার হাতে এল কীভাবে?'

উত্তরে প্রসেনজিৎ বলল, 'ওই ভিলেনটা তো তখন আমাদের কাছে দারুণ সুপাত্র। আমরা বারবার জিজ্ঞেস করছি—কী নেবে? প্রতিবারই এক উত্তর—কিছু না। কিন্তু সম্বন্ধ-করা বিয়েতে তা তো হয় না। বলেকয়ে রাজি করিয়ে পাত্রকে একদিন আমরা একটা স্যুটের দোকানে নিয়ে গিয়েছিলাম। স্যুটের অর্ডার দেওয়া হল, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ডেলিভারি দেবে। তারপর গেলাম জুতোর দোকানে। ওহ্! কত জুতোর দোকানে যে ঘুরেছিলাম, তার আর ইয়ত্তা নেই। ঘণ্টাতিনেক তো বটেই—।'

'কেন, আপনাদের ওই পাত্র কি জুতো কেনার ব্যাপারে খুব খুঁতখুঁতে?'

'না-না, ওকে দেখতে খুব হ্যান্ডসাম হলে কী হবে, পাদুটো রাম-চাষাড়ে। পেল্লায় সাইজের পা। ওই সাইজের জুতোই নেই কোথাও। শেষকালে পাওয়া গেল পার্ক স্ট্রিটের একটা দোকানে। পাত্রের ওই দাদাও ছিল সঙ্গে। ওর হাতে ছিল প্লাস্টিকের এই প্যাকেটটা। বয়স্ক লোক, কখন থেকে হাতে নিয়ে ঘুরছে; আমিই চেয়ে নিই এক সময়। তারপর ভুল করে জুতোর বাক্স-ভরা পলিথিনের মস্ত প্যাকেটটার মধ্যে ঢুকিয়ে রেখেছিলাম। বাড়ি ফেরার পরে টের পাই, তবে তারপর আর মহামূল্যবান জিনিসগুলো ফেরত দেওয়ার কথা মনে ছিল না—।'

প্রসেনজিতের কথায় গোয়েন্দা একটু হেসে বলল, 'মহামূল্যবান জিনিসটা সময়মতো আপনাকে ফেরত দিয়ে যাব আমি। ঠিক আছে, আজ তাহলে উঠি।'

প্রসেনজিৎ সদর দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়েছিল গোয়েন্দাকে।

পথে বেরিয়ে একটুখানি যেতে না যেতেই একটা ট্যাক্সি পেয়ে গিয়েছিল গোয়েন্দা। ট্যাক্সির চাকা সামনের দিকে সামান্য গড়াবার পরে গোয়েন্দা বলল, 'চৌরঙ্গি।'

পরিচ্ছন্ন একটা দুপুর। সোনালি রংয়ের রোদ্দুর চারদিকে। ফুটপাথে একইসঙ্গে ব্যস্ত এবং অলস মানুষজন হাঁটছে। কোথাও কোনরকম অশান্তির ছাপ নেই। কিন্তু গোয়েন্দার মাথার মধ্যে নানা রকমের চিন্তার ঢেউ আছড়ে পড়ছিল একটার পর একটা।

চৌরঙ্গিতে নেমে ধর্মতলা স্ট্রিট ধরে হাঁটতে শুরু করেছিল কৌশিক। একটুখানি হাঁটার পরেই পেয়ে গেল সান্ধ্য-দৈনিক 'সিটি হেরাল্ড'-এর অফিস।

ভাঙাচোরা চারতলা বাড়িটার বয়েস কম করে দুশো বছর। জীর্ণ দশার বাড়ি। পলেস্তরা খসে গেছে বেশির ভাগ জায়গায়। গোটাপাঁচেক ঝাঁকড়া বটগাছ ঝুরি নামিয়ে দিয়েছে বাড়ির সামনে, পাশে। কিন্তু এই বাড়িগুলোই সেই আমলে—বিশেষ করে কলকাতা যখন ব্রিটিস ভারতের রাজধানী—কী দুর্ধর্ষ দেখতে ছিল! কলকাতা তখন ছবির মতো সুন্দর—সেকেন্ড সিটি অব দ্য ব্রিটিশ এম্পায়ার। কলকাতাকে বলা হত 'প্রাসাদ-নগরী'। সাহেব পেন্টারদের আঁকা সেই প্রাসাদ-নগরী কলকাতার অপরূপ সব ছবি দেখলে কৌশিকের বুকের ভেতরটা হু-হু করে ওঠে। ইশ্! কলকাতা তার সেই হারানো চেহারা আর কি কখনও ফিরে পাবে না!

দুশো-আড়াইশো বছরের পুরনো সব বাড়ি এসব জায়গায় কংকালের মতো দাঁড়িয়ে আছে। বাড়িগুলোর চেহারা দেখলে কষ্ট হয়, আবার কখনও-কখনও বেশ মজাও পাওয়া যায়। ধসে-পড়া, প্রায় পোড়ো বাড়ি মার্কা বাড়ির দেয়ালে ভাঙাচোরা সাইনবোর্ডে ঝুলছে 'কেমব্রিজ', 'অক্সফোর্ড' কিংবা 'হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি'। এসব জায়গায় ছাত্ররা পড়তে চাইলেই পড়তে পারে। মাইনেপত্র নামমাত্র। কিন্তু কোনওমতে এখানে দুটো মাস বা একটা বছর কাটিয়ে দিতে পারলে কেমব্রিজ, অক্সফোর্ড বা হার্ভার্ডের সার্টিফিকেট নিয়ে বেরিয়ে আসা যায় দিব্যি।

ঐতিহ্যমণ্ডিত এই বাড়িটিতেই 'সিটি হেরাল্ড'-এর সম্পাদকীয় বিভাগ। চার পাতার সান্ধ্য ট্যাবলয়েডটি গত পঁচিশ বছর ধরে বেরিয়ে যাচ্ছে সমানে। কিন্তু এ-কাগজ নিয়ে হইচই হওয়া তো দূরের কথা—কারও মুখেও এর নাম শোনা যায় না বড়-একটা। কাছাকাছি

একটা প্রেসে ছাপা হয়, তারপর সেই কাগজ কয়েকজন হকারের সাইকেলে চেপে পৌঁছে যায় শহরের কয়েকটা নিউজস্ট্যান্ডে।

সিটি হেরাল্ডের মালিক-কাম-সম্পাদক অরবিন্দ সেন কিন্তু মনের মতো করে পত্রিকার লাইব্রেরিটি সাজিয়েছেন। ভারতবর্ষের প্রায় সব ক'টা ইংরেজি দৈনিকের ফাইল পাওয়া যায় এখানে।

অরবিন্দবাবু কৌশিককে দেখে হইহই করে বলে উঠলেন, 'আরে! এসো-এসো, কী সৌভাগ্য আমার!'

লাজুক মুখে উত্তর দিল কৌশিক, 'ভাল আছেন তো? আসলে একটা দরকারে পড়ে—।'

কথাটা ওকে আর শেষ করতে দিলেন না অরবিন্দবাবু। 'সেটাই স্বাভাবিক। তোমার মতো একজন বিখ্যাত আর ব্যস্ত গোয়েন্দা অদরকারে যেখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াবে কেন? কী চাই? কোনও ক্লিপিং?'

'আপনি ডেকান হেরাল্ড রাখেন?'

'রাখি।'

'গত মাসের ফাইলটা হবে?'

'অবশ্যই। এবার বলো কী খাবে?'

'কিচ্ছু না। একটু আগেই অনেক-কিছু খেয়েছি, তবে আপনার সেই বিখ্যাত লেবু চা খাব।'

ওদিকে মস্ত সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপর গত মাসের ডেকান হেরাল্ডের ফাইলটা রেখে লাগোয়া ছোট্ট ঘরে লেবু চা বানাতে চলে গেলেন অরবিন্দবাবু। উত্তরাধিকারসূত্রে এই মানুষটির হাতে যে টাকা এসেছে তার পরিমাণ নেহাত কম নয়, কিন্তু ইনি উচ্চ মার্গের চিন্তা করতে করতে অত্যন্ত সাধারণভাবে বেঁচে থাকার নীতিতে বিশ্বাসী।

দ্রুত হাতে গত মাসের ফাইলের পাতা ওলটাতে শুরু করে দিয়েছিল গোয়েন্দা। বেশ কয়েক দিনের কাগজ ওলটাবার পরেই ওর চোখ পড়ল একটা রবিবারের সাপ্লিমেন্টের পাতায়। এই তো প্রফেসর মৃদুল ভট্টাচার্যকে নিয়ে মস্ত এক সাক্ষাৎকার বেরিয়েছে। সঙ্গে ছবি। ছবির দিকে তাকালেই বোঝা যায় মানুষটি বেশ বুদ্ধি ধরে।

সাক্ষাৎকারটি পড়ে ফেলল কৌশিক, তারপর আলগোছে আরও কিছু পাতা ওলটাতে লাগল। খবরের কাগজের হেডিংগুলোর ওপর ওর চোখ ঘুরছিল। হঠাৎ কী যেন দেখে চমকে উঠে বলল, আরে! তারপর পকেট থেকে নোটবুক বার করে দ্রুত কিছু নোট করে নিল।

একটু বাদে পর্দাফেলা ছোট ঘরটা থেকে দু-কাপ চা হাতে নিয়ে বেরিয়ে এলেন অরবিন্দবাবু। ওঁকে এগোতে দেখে কৌশিক প্রায় ছুটে গিয়ে ওঁর হাত থেকে চায়ের একটা কাপ তুলে নিয়ে বলল, 'কী আশ্চর্য! আপনি হাতে করে—। ওখান থেকে একটা হাঁক পাড়লেই তো আমি উঠে গিয়ে চা নিয়ে আসতাম।'

হাসতে হাসতে জবাব দিলেন অরবিন্দবাবু। 'শুধু শুধু একজন কাজের মানুষকে ব্যস্ত করার কোনও মানে হয় না। ভারী তো এক কাপ চা বানিয়ে এগিয়ে দিচ্ছি—। তবে হ্যাঁ, চা বানাতে আমার একটু দেরি হয়ে গেছে। আসলে আমার গ্যাসটা ফুরিয়ে গেল

এইমাত্র। হিটার ছিল আলমারির মধ্যে। ওটা খুঁজে বার করতে গিয়েই সময় চলে গেল কিছুটা। চা কেমন হয়েছে বললে না তো?'

চায়ের কাপ এখনও পর্যন্ত ঠোঁটে ঠেকায়নি কৌশিক। প্রশ্ন শুনে ছোট্ট একটা চুমুক দিল, তারপর বলল, 'আহ্! ফাস্‌ক্লাস!'

চায়ের প্রশংসায় খুশি হয়ে বৃদ্ধ মানুষটি বললেন, 'তা, ফাইল চেয়েছিলে—কাজ মিটেছে তোমার?'

'হ্যাঁ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।'

ঝলমলে মুখে অরবিন্দবাবু বললেন, 'অসংখ্য ধন্যবাদ নিয়ে করবটা কী? আমার চাহিদা খুব কম। এখন কি তোমার সঙ্গে একটু গল্প করার সময় পাওয়া যাবে?'

বিব্রত মুখে কৌশিক বলল, 'গল্প করার সময় কিছুটা পিছিয়ে দিন। পরে একদিন এসে একটু নয়, অনেকক্ষণ ধরে গল্প করব। মিনিট-পনেরোর মধ্যে মৌলালির মোড়ে পৌঁছতে হবে আমাকে। এক বান্ধবী অপেক্ষা করবে।'

'বান্ধবী? তাহলে তো তোমাকে এখানে আর এক মিনিটও সময় নষ্ট করতে দেওয়া উচিত নয়।'

হেসে উঠল কৌশিক। 'না-না, আপনি যা ভাবছেন তা নয়, বান্ধবীকে ডেকেছি জরুরি একটা কাজ সারার জন্যে।'

'তোমার কথা আমি একেবারেই অবিশ্বাস করছি না। বন্ধুরা চিরটাকাল বান্ধবীদের সঙ্গে জরুরি কাজ সারে। যাত্রা শুভ হোক।'

কৌশিক আর একবার হাসল, তবে এবারের হাসিতে আগের বারের সেই জোর ছিল না। বলল, 'যেদিন আসব, প্রমিতাকে সঙ্গে নিয়েই আসব। আপনার কথা ওকে আমি অনেক বলেছি।'

'যা বলেছ তার মধ্যে আপত্তিকর কথা খুব বেশি নেই তো?'

'পুরোটাই আপত্তিকর, কারণ ভালমানুষরা নিজেদের প্রশংসাকে সব সময়ই আপত্তিকর বলে মনে করে থাকে। আজ চলি তাহলে।'

আদ্যিকালের বাড়ির কাঠের সিঁড়ির মধ্যিখানের অংশগুলো ক্ষয়ে-ক্ষয়ে গেছে। সাবধানে সিঁড়ি ভেঙে রাস্তায় নেমে ছোট্ট একটা ছুট্ লাগিয়ে চলন্ত ট্রামে উঠে পড়েছিল কৌশিক। রাস্তা মোটামুটি ফাঁকাই ছিল, চারটে পাঁচে মৌলালিতে পৌঁছে গেল গোয়েন্দা।

চারটের সময় আসার কথা প্রমিতার, এল চারটে দশে। এসেই বলল, 'বলো, কী জন্যে জরুরি তলব?'

'জরুরি একটা কাজে যাচ্ছি, আমার সঙ্গে যেতে হবে তোমাকে।'

'তোমার সঙ্গে গিয়ে আমি কী করব?'

'একটু গল্পটল্প কবতে হবে। অচেনা লোকের সঙ্গে এই ব্যাপারটা আমার ঠিক আসে না। আমি হচ্ছি হোয়াট আফটার হ্যালোর দলে। হ্যালো বলার পরে আর কোনও কথা খুঁজে পাই না!'

নকল একটা বিরক্তি চোখেমুখে ফুটিয়ে প্রমিতা বলল, 'কলেজে পড়ার সময় আমাদের এক প্রফেসর বলতেন—আর যার সঙ্গেই হোক না কেন, প্রাবন্ধিকের সঙ্গে কক্ষনো

ভাব করবে না। ভাব করলে প্রায়ই গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ শুনতে হবে। তখন যদি তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় থাকত, ঠিক বলতাম—স্যার, প্রাবন্ধিকের সঙ্গে গোয়েন্দাকেও জুড়ে দিন। গোয়েন্দার বন্ধু হলে প্রায়ই উলটোপালটা তদন্তে বেরুতে হবে তার সঙ্গে।'

হেসে উঠল কৌশিক। 'তোমার তুলনা টানাটা ঠিক হল না। প্রাবন্ধিকরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ভুল শ্রোতা বাছাই করে। কিন্তু গোয়েন্দারা সহকারী বাছাইয়ের ব্যাপারে একেবারে নিঁখুত। মারদাঙ্গার ব্যাপারে তোমাকে তো কক্ষনো ডাকি না, কিন্তু এই কাজটায় তুমি আদর্শ। বেশি দূরের পথ নয়। হেঁটেই যাব। হাঁটতে-হাঁটতে এখানে তোমার ভূমিকাটাও তোমাকে বুঝিয়ে দেওয়া যাবে।'

কলকাতায় এখন শুধু লোকসংখ্যা নয়, যানবাহনের সংখ্যাও বেশ কয়েক গুণ বেড়ে গেছে। প্রতিটি গাড়িই আবার মনের আনন্দে হর্ন বাজায়। তার ফলে এই শহরের রাস্তায় চলতে চলতে যে-কোনও গোপন কথা যে-কারও সঙ্গে অনায়াসে সেরে নেওয়া যেতে পারে। মৌলালি থেকে আনন্দ পালিতে পৌঁছবার আগেই প্রমিতাকে ওর পার্ট বুঝিয়ে দিয়েছিল গোয়েন্দা।

অধ্যাপক মৃদুল ভট্টাচার্যের বাড়ির ঠিকানা ইন্সপেক্টর ঘোষরায়ের কাছ থেকেই জোগাড় করে নিয়েছিল। সহজ ঠিকানা। বাড়ি খুঁজে বার করতে একটুও অসুবিধে হল না। সাবেক কালের মস্ত বাড়ি, কিন্তু বেশ ঝকঝকে-তকতকে।

ডোরবেল টিপতেই যে মানুষটি দরজা খুললেন তাঁর খোঁজেই গোয়েন্দারা আজ এখানে এসেছে। ভদ্রলোকের চোখেমুখে প্রশ্ন ফুটে উঠেছিল। গোয়েন্দা বলল, 'আমরা প্রফেসর ভট্টাচার্যের সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই—।'

প্রফেসরের কপালের ভাঁজ আর একটু বোধহয় বাড়ল। 'বলুন।' ছোট্ট শব্দটার জবাবে কৌশিক আর প্রমিতা দুজনেই হাত তুলে নমস্কার করল অধ্যাপককে। তারপর কৌশিক মুখ খুলল আবার। 'আমরা একটা পত্রিকার তরফ থেকে এসেছি। আপনাকে নিয়ে আমাদের কাগজের জন্যে একটা কভার-স্টোরি করতে চাই। আসলে ডেকান হেরাল্ডে আপনার ইন্টারভিউটা আমাদের এত ভাল লেগেছে!'

প্রশংসা শুনে খুশি হয় না এমন মানুষ বোধহয় পৃথিবীতে একজনও নেই। অধ্যাপকের মুখেও খুশি হওয়ার হালকা একটা ঢেউ বয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পরমুহূর্তেই গম্ভীর গলায় বললেন, 'আমি এসব প্রচারট্রচার একেবারেই পছন্দ করি না। বিশেষ একজনের অনুরোধ এড়াতে পারিনি বলেই ওই কাগজটায় সাক্ষাৎকার দিতে হয়েছে আমাকে। কিন্তু বিস্তর ভুলভাল লিখেছে। বলেছি এক, বুঝেছে আর এক। বলেছিলাম, ছাপতে দেওয়ার আগে আমাকে একবার দেখিয়ে নেবেন। তখন খুব হ্যাঁ-হ্যাঁ বলেছিল, কিন্তু পরে আর—। আপনারা আমার ঠিকানা পেলেন কোত্থেকে?'

'ইন্টারভিউয়ে আপনার বাড়ির রাস্তার নাম দেওয়া আছে, এখানে এসে একটু জিজ্ঞেসটিজ্ঞেস করতেই পেয়ে গেলাম—।'

অধ্যাপকের চোখেমুখে এখনও কোনও আপ্যায়নের ছাপ ধরেনি, বরং কেমন যেন দরজা আগলে দাঁড়িয়েছিলেন। একটু থমকে যাওয়ার পরে কৌশিক বলল, 'আচ্ছা, এই টোডা মেয়েদেরই কি দ্রৌপদী বলা হয়?'

উদ্ভাসিত হয়ে উঠল অধ্যাপকের মুখ। 'আপনি কোত্থেকে জানলেন ?'

'একটা স্টাডি-রিপোর্টে পড়েছিলাম—।'

'আরে! আপনারা তখন থেকে বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন—। আসুন-আসুন, ভেতরে আসুন।'

ভেতরে ঢোকার সময় চোখে চোখে একটু কথা হয়ে গিয়েছিল কৌশিক আর প্রমিতার—যার অর্থ হল ; যাক, পণ্ডিত লোকটাকে এবার একটু বাগ মানানো গেছে।

এ ঘরটা বসার ঘর। বড়লোকদের বসার ঘর যেমন হয় ঠিক তেমনি, মহামূল্যবান আসবাবপত্রে সাজানো। কোণের দিকের টেবিলের ওপর একটু অগোছালো ভাবে পড়ে আছে আদিবাসীদের নিয়ে লেখা একগাদা ইংরেজি বইপত্র।

আগের কথার জের টেনে অধ্যাপক বললেন, 'হ্যাঁ, টোডা মেয়েদের দ্রৌপদী বলা হয়। এক স্ত্রীর অনেক স্বামী। এদের সমাজ এটা বেশ খোলা মনে মেনে নেয়। পাত্রের আদর্শ পাত্রী কে জানেন ? আপন মামাতো বোন। ফ্রেটারনাল পলিয়ানড্রি। তবে এদের বহুবিবাহ এখন ধরতে গেলে এক বিবাহে নেমে এসেছে।'

'কেন ?'

'কেন আবার, উপজাতিটির সংখ্যা কমতে কমতে এখন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার মুখে এসে দাঁড়িয়েছে।'

'কেন, এত কমে গেল কেন ?'

'ভালভাবে খেতে-পরতে পায় না। অপুষ্টিতে ভুগছে! অসুখ—সবচেয়ে বড় রোগ হল যৌনরোগ। সরকার, বিভিন্ন ওয়েলফেয়ার কমিটির এখন নজর পড়েছে এদের ওপর—কিন্তু বড্ড দেরি হয়ে গেছে। আপনারা দাঁড়িয়ে কেন, বসুন।'

ওদিকের সোফায় ওরা বসার পরে এদিকের চেয়ারে অধ্যাপক বসলেন। ওঁর চোখমুখ দেখে যে-কেউ বুঝতে পারবে উনি বিষয়টার ভেতরে ঢুকে গেছেন। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে অধ্যাপক বললেন, 'কাঠ-খোদাই আর ছুঁচের কাজে টোডাদের তুলনা মেলা ভার। এদের মিউজিকও অসাধারণ। কিন্তু আমরা যারা সভ্য মানুষ বলে বড়াই করে থাকি, আমরাই এদের খতম করেছি। এরা নিজেদের ঘরেই এখন, কী বলব, পরবাসী।'

'কীরকম ?' খুব নিচু গলায় প্রথম প্রশ্ন করল প্রমিতা।

প্রমিতাকে একবার দেখে নিয়ে অধ্যাপক বললেন, 'একটা সময় নীলগিরি হিল্সের গোটা টেবল-ল্যান্ডটাই এদের দখলে ছিল। চাষবাস করে দিব্যি মনের সুখে দিন কাটাত। বাফেলো-কাল্টের লোক এরা। প্রচুর মোষ ছিল এদের। চরাবার জায়গার অভাবও ছিল না! কিন্তু সেই জায়গাগুলো কেড়ে নেওয়া হয়েছে। ওদের জায়গায় এখন ফলাও করে চা আর কফির চাষ হচ্ছে। উটাকামন্ড, কুনুর, কোটাগিরি তো ওদের জায়গা ছিল। আমরা এখন ভোগদখল করছি। আমি আমার লাস্ট সেমিনারে সভ্য মানুষদের এই অসভ্যতার তীব্র সমালোচনা করেছি।'

'কোথায় হয়েছিল সেমিনারটা ?' এবার প্রশ্ন করল কৌশিক।

'ম্যাড্রাসে।'

'কবে ?'

'গত মাসের পঁচিশ তারিখে। সেমিনার সেরে সেই রাতেই হাওড়া মেলে চেপেছিলাম।

আমার একটা গ্রুপ ডিসকাসন ছিল সাতাশ তারিখ কলকাতায়। লম্বা ট্রেন জার্নি আমি মাঝেমধ্যে পছন্দ করি। কারণ ট্রেনে টেলিফোন নেই, মাঝপথে কেউ বিরক্ত করতেও আসতে পারে না।'

ইঙ্গিতটা খুব স্পষ্ট। কৌশিক বিব্রত মুখে বলল, 'আজ আপনার ইন্টারভিউ নিতে কিন্তু আসিনি আমরা। একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে এসেছিলাম। টেলিফোন নাম্বারটা জানা থাকলে—।'

অধ্যাপক টেবিল থেকে একটা কাগজ টেনে নিয়ে খসখস করে কয়েকটা সংখ্যা লিখে কৌশিকের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'আমার বাড়ির টেলিফোন নাম্বার, তবে এ-সপ্তাহে ফোন করবেন না।'

'ঠিক আছে, আজ তাহলে চলি। নমস্কার।' ওরা ঘর থেকে বেরুবার মুখে একটা কাজের মেয়ে এসে প্রমিতাকে বলল, 'আপনাকে দিদি ভেতরে ডাকছে।'

অবাক হল প্রমিতা। 'আমাকে!'

অধ্যাপক প্রসন্ন একটা হাসি হেসে বললেন 'ওর দিদি মানে আমার স্ত্রী। যান না, ভেতরে যান।'

প্রমিতা ভেতরে যাওয়ার পরে অধ্যাপক ভট্টাচার্য বললেন, 'আমি একটা কাজ করছিলাম। কাজের খেই হারিয়ে গেলে মুশকিলে পড়ব। আপনি যদি কিছু মনে না করেন—।'

কথাটা শেষ করতে না দিয়ে কৌশিক কোনওমতে বলে উঠল, 'আরে! কী আশ্চর্য! যান, আপনি আপনার কাজ করতে যান—। আমি বলছি, আমার কোনও অসুবিধে হবে না।'

অধ্যাপক ভট্টাচার্য চলে যাওয়ার মিনিট-পনেরো পরে প্রমিতা এল। ওকে দেখেই উঠে দাঁড়িয়েছিল কৌশিক। সাবেক আমলের বাড়ি পেছনে ফেলে কয়েক পা হেঁটে আসার পরে প্রমিতা বলল, 'অধ্যাপক ভট্চাজের স্ত্রী তো আমাদের সুনেত্রাদি। আমার এক মাসতুতো দিদির বন্ধু। একটা সময় খুব আসত আমাদের বাড়িতে। ওঁর চেহারা কী খারাপ হয়ে গেছে এখন! আমি তো প্রথমে চিনতে পারিনি। বোধহয় অসুস্থ। আমাকে বলল, 'তুই পরে একবার আয়। তোর সঙ্গে অনেক কথা আছে।'

'কী নিয়ে?'

'জিজ্ঞেস করেছিলাম, বলতে চাইল না। বোধহয় খুব গোপন কিছু।'

।। চার ।।

দোর্দণ্ডপ্রতাপ ইন্সপেকটর ঘোষরায়ের যদি কোনও ব্যাপারে কোনও সাফল্য আসে এবং সেই সময় উনি যদি নিজের চেয়ারে বসে থাকেন, সামনের টেবিলে একবার একটু তবলা

বাজিয়ে নেবেনই। একটু আগে বাজিয়েছেন, এখন তরুণ গোয়েন্দা কৌশিককে দেখে আরও একবার বাজিয়ে নিয়ে বললেন, 'এসো-এসো। টেলিফোন করেছি আধঘণ্টা আগে—এইটুকু পথ আসতে এত সময় লাগিয়ে দিলে!'

কৌশিক ইন্সপেকটরের সামনের চেয়ারগুলোর একটা টেনে নিয়ে বসে হাসতে হাসতে বলল, 'টেলিফোনে জরুরি তলব, অথচ কিছুই ভাঙলেন না—। তার মানে বুঝতে পারছি সুখবর আছে। কী, অপরাধী ধরা পড়ল?'

'অভিনেতা-অভিনেত্রী ধরা পড়েছে। ক্যামেরাম্যান ধরা পড়েছে। তবে সরে পড়েছে চিত্র-পরিচালক। কিন্তু সরে পড়ে যাবে কোথায়? ঠিক ছেঁকে তুলব।'

অবাক হয়ে গেল কৌশিক। 'অভিনেতা-অভিনেত্রী, ক্যামেরাম্যান! কী বলছেন আপনি!'

'যাও না, পাশের ঘরে গিয়ে দেখে এসো—। একটু বাদে সব কটাকে কোর্টে প্রোডিউস করব বলে তোমাকে এখানে আসার জন্যে অত তাগাদা লাগাচ্ছিলাম টেলিফোনে।'

কৌশিকের বিস্ময় একটুও কমল না। 'অবনীদা, কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। একটু খুলে বলুন।'

টেবিলে তবলার দু-চারটে বোল্ ফোটাবার পরে ইন্সপেকটর বুলি ফোটালেন। 'ওই যে গল্ফ গ্রিন, ওই যে চব্বিশ নম্বর বাড়িটা—ওটার ওপর থেকে আমি একবারের জন্যেও নজর সরাইনি। এস. আই. পরেশের ওপর দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছিলাম—। বলেছিলাম, পর-পর সাতটা দিন-রাত ওই বাড়িটার ওপর চোখ রাখার ব্যবস্থা করো। পার্টি ধরা পড়ল কাল মাঝরাত্তিরে। মাঝরাত্তির না হলে কিন্তু ধরা যেত না। পরেশ ছিল ওই বাড়িটার উলটো দিকের একটা লুকনো জায়গায়। চব্বিশ নম্বরের জানলা-দরজা সব ভালভাবে বন্ধ। কিন্তু ফাঁকফোঁকর, ভেন্টিলেটার তো আর বন্ধ করা যায় না। মাঝরাত্তিরে পরেশ হঠাৎ দেখে, ওই বাড়িটার ফাঁকফোকর দিয়ে খুব জোরালো আলোর ঝলকানি বার হচ্ছে। অস্বাভাবিক ঘটনা। ও কিন্তু আসল ব্যাপারটা কিছুই আন্দাজ করতে পারেনি। তুমি কিছু পারলে?'

'বোধহয় পেরেছি। তবু আপনার মুখে শুনি।'

'পরেশ কিছু ধরতে পারেনি, তবে এটা বুঝতে পেরেছিল—উলটো-পালটা কিছু-একটা চলছে ওখানে। পরেশরা ছিল তিনজন, তিনজনের মধ্যে দুজন আর্মড। মাঝরাত্তিরেই রেড করল। অ্যাকটর-অ্যাকট্রেস অ্যারেস্টেড, ক্যামেরাম্যান আরেস্টেড; তবে নাটের গুরু ডিরেকটর ওই বাড়ির পেছনের দরজা দিয়ে ধাঁ। পরেশের এই ধরনের অভিজ্ঞতা আগে হয়নি। বলল: কী বলব স্যার, চোখ খুলে রাখা যায় না। অন্যদিকে তাকিয়ে বললাম—পাঁচ মিনিট সময় দিচ্ছি, কাপড়চোপড় সব পরে নাও। সাতসকালে ওদের নিয়ে এখানে হাজির। বেশ ইলাবোরেট অ্যারেঞ্জমেন্ট ছিল ওদের। তিনটে ক্যামেরা, চারটে ফিল্মের ক্যান। ব্লু ফিল্মের বাজার তো এখানে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। এখন তো ঘরে ঘরে ফিল্ম দেখার যন্তর। ভদ্রলোকের পাড়ার মধ্যে খালি কোঠি। চুটিয়ে ব্যবসা চালাচ্ছে। শুটিং রাতের বদলে দিনে হলে তো ধরার কোনও উপায় থাকত না। ফিল্ম শুটিং মানেই কয়েক হাজার ওয়াটের জোরালো আলো। তবে চাঁইটাকে তুলতে পারেনি পরেশ, হারামজাদা পালিয়েছে।'

'যাদের ধরেছেন তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন?'

'হ্যাঁ, সব কটাকে। ওই ইনটারোগেট করতে গিয়ে আজ সকালে চা খাওয়ার সময় পর্যন্ত পাইনি।'

'তা, তেমন কিছু জানতে পারলেন ?'

'ই-য়ে-স। তবে এটা হল গিয়ে নাটকের প্রথম অঙ্ক। প্রথম অঙ্কে যখন ঢুকতে পেরেছি, শেষ অঙ্কে পৌঁছে যাবই।'

'বুলা বলে যে মেয়েটা খুন হয়েছে তাদের সঙ্গে এদের কানেকট করতে পারলেন ?'

'না, তা পারিনি।'

'গত কয়েক মাসের অন্য কোনও ক্রাইমের সঙ্গে ?'

'না, এখনও পর্যন্ত তেমন, তবে—। তুমি একবার ওদের জিজ্ঞাসাবাদ করো না ?'

'কী লাভ! আপনি তো করেছেন।'

'তা অবশ্য করেছি। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যত রকম করে করা সম্ভব—যাকে বলে একেবারে খোল-নলচে উলটে দেখা। আমার জেরায় হাঁটু কেঁপে যায়নি, এমন লোক খুব কম আছে। ভগবান প্রকাণ্ড একটা চেহারা দিয়েছেন, আর দিয়েছেন বাজখাই গলা। এই দুটো আমি পুরো মাত্রায় কাজে লাগাই। আমার একটা পপুলার টেকনিক কী জানো? প্রশ্নের উত্তর বেয়াড়া ঠেকলেই ধমকে উঠে বলি—মিথ্যে বলছিস। তখন কাউ-কাউ করে সাফাই গাইতে গেলে আবার ধমকে উঠে বলি—মিথ্যে বলছিস। ঘন-ঘন বারপাঁচেক একইভাবে ফের মিথ্যে বলছিস বললে বেশির ভাগ অপরাধীরই কথাবার্তা তালগোল পাকিয়ে যায়। তখন যা জানার সব জেনে ফেলি আমি।'

'এখানে কী জানালেন ?'

'বলছি। ক্যামেরাম্যানটা সাধারণ ক্যামেরাম্যান। বিয়েবাড়িতেই বেশির ভাগ ছবিটবি তোলে। এদিক-ওদিকও খেপ মারে কিছু-কিছু। বলল, মোটা টাকার লোভে এই প্রথম ব্লু-ফিল্ম তুলতে এসেছে। প্রথম কথাটা বাজে, এ কাজ এর আগেও ও বেশ কয়েকবার করেছে। তবে মনে হয়, এই র‍্যাকেটের সঙ্গে ওর এই পর্যন্তই যোগাযোগ। দামি ক্যামেরাগুলো পার্টির কাছ থেকে টাকা নিয়ে ভাড়া করা হয়েছে। নীল ছবির নায়কের চেহারাটা সুন্দর, বোধ হয় কোনও ভদ্র পরিবারের বখে-যাওয়া ছেলে। অ্যান্ড ডেফিনিটলি এ সেক্স-ম্যানিয়াক। না হলে এ কাজ করত না। তবে একে দেখে মনে হয় এর পক্ষে হার্ডকোর ক্রিমিনাল হওয়া সম্ভব নয়। রিয়েল হারামি হল এ ছবির নায়িকা—এক নম্বরের গেছো খান্‌কি।'

কথাটা বলার পরে একটা ঢোক গিললেন কৌশিকের অবনীদা, তারপর সামান্য আমতা-আমতা করে বললেন, 'তুমি আমার চেয়ে বয়েসে অনেক ছোট। তোমাকে আমি একটু অন্য চোখেও দেখি। তবে তুমি তো খুব ভাল ভাবেই জানো, পুলিশের মুখ একটু আলগা হতে বাধ্য।'

প্রসঙ্গটাকে অন্যদিকে ঘোরাবার জন্যে গম্ভীর মুখে কৌশিক বলল, 'তা, এই মেয়েটাকেই আপনার সন্দেহজনক বলে মনে হচ্ছে ?'

'না-না, সন্দেহজনক বলতে যা বোঝায়, ঠিক তা নয়। তবে লাইনের মেয়েছেলে। সব রকমের খারাপ কাজেই পাকা। মনে হয় ড্রাগ-পেড্‌লিংও করে থাকে। ও যে এ-লাইনে পুরনো তার সবেচেয়ে সহজ প্রমাণটা কী জানো ? প্রথমেই বলল—বড়বাবু, আমার কোনও

দোষ নেই। ওরে, তুই সতী হলে আমি বড়বাবু জানলি কী করে? কথাটা শুনেই হাড়পিত্তি জ্বলে গিয়েছিল আমার। কষে একটা ধমক লাগিয়ে বললাম—।'

'মিথ্যে বলছিস তুই।'

'ঠিক তাই। তারপর আবার প্যানপ্যানানি শুরু করতেই কষে আর এক ধমক লাগিয়ে বললাম—।'

'ফের মিথ্যে বলছিস তুই?'

'এগ্‌জ্যাক্টলি। তবে মনে হয় না ওর পেট থেকে সব সত্যি কথা বার করতে পেরেছি। পরে ধরব আর একবার। এদিকে নাকি কান্না কাঁদছে, ওদিকে আবার বিড়বিড় করে বলছে; আমাদের পেট চলবে কী করে বলুন? নেক্‌স্ট টাইম ওকে যখন জিজ্ঞাসাবাদ করব—তখন ঠিক এক ফাঁকে ওর মুখ থেকে বেরিয়ে আসবে; আমি সেক্স ওয়ার্কার, অমুক অ্যাসোসিয়েশনের মেম্বার। ব্যস্‌, আইন তা হলে ওদের আর ছুঁতে পারবে না। দেশ শাসন করার দায়িত্ব যাদের হাতে, তারাই এখন ওদের ওপর দরদ দেখাচ্ছে। অনেকেই বলছে, প্রিভেনশন অব ইমমরাল ট্রাফিক অ্যাক্ট-এর সংশোধন করো। ভাল একটা নাম দেওয়া হয়েছে ওদের—সেক্স ওয়ার্কার। প্রথম যখন কথাটা কানে এসেছিল, মনে হয়েছিল—ওরা বোধহয় সোশাল ওয়ার্কার, নিষিদ্ধ পাড়ার জনকল্যাণমূলক কাজকম্ম করে। পরে জানতে পারি এনারা হচ্ছেন তেনারা। ট্রেড ইউনিয়ন রাইট চেয়ে এখন আবার মিটিং করে বেড়াচ্ছে। অদ্ভুত সব যুক্তি— ঠেলাওয়ালা, মুটেওয়ালা, কুলি-কামিন গতর খাটাচ্ছে—আমরাও খাটাচ্ছি। ওরা শ্রমিক হলে আমরা শ্রমিক নই কেন?'

মৃদু গলায় তর্ক করার ভঙ্গিতে কৌশিক বলল, 'এইসব মেয়েরা খুব অপ্রেস্‌ড, এ ব্যাপারে তো কোনও সন্দেহ নেই। এদের সাঁড়াশির মতো চেপে রেখেছে একদিকে বাড়িউলিরা, অন্যদিকে দালাল বা গুণ্ডারা। তার ওপর নানা ধরনের সামাজিক লাঞ্ছনা। রোগভোগ, ছেলেমেয়েকে মানুষ করতে না পারার কষ্ট—।'

'বড়-বড় কথা বোলো না তো। আমাদের দেশ ইওরোপ-আমেরিকা নয় যে গাদা-গাদা সেক্স-শপ সাজিয়ে বসে থাকবে। ওসব দেশে সবাই খেয়েপরে আরাম করে বেঁচে থাকে। শিক্ষার হার হান্ড্রেড পারসেন্ট। ওখানে একটা ভিখিরি পাবে না, বাউণ্ডুলেপনা করলে পুলিশ ধরবে। অসুখ-বিসুখ করলে নিজের সামর্থ্য না থাকলে চিকিৎসার দায়িত্ব নেবে স্টেট। আর এখানে? থার্ড ওয়ার্ল্ডে? এখানে কথায়-কথায় ইন্টারন্যাশনাল ফোরামের নজির টানা মানায় না।'

'কিন্তু ওরা তো একটা গুরুত্বপূর্ণ সোশাল নিড ফুলফিল করে। সমাজেরও তো একটা দায়িত্ব আছে ওদের ওপর। প্রস্টিটিউশন কেন তা হলে প্রোফেশন হিসেবে স্বীকৃতি পাবে না?'

ইন্সপেক্টর ঘোষরায়ের গলা এবার গাঁক-গাঁক করে উঠল। 'প্রস্টিটিউশনকে প্রফেশন হিসেবে দেখা পুরোমাত্রায় একটা ওয়েস্টার্ন কনসেপ্ট। এখানে ওসব চলে না। তুমি তো বিয়েই করোনি, ব্যাপারটা তুমি বুঝবে না। আমার দুটো মেয়ে আছে—কলেজে ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। ওরা সিনেমা-থিয়েটার দেখতে যাওয়ার জন্যে পথে-ঘাটে দাঁড়িয়ে হয়তো অপেক্ষা করছে কোথাও কোনও বন্ধুর জন্যে—বিশেষ করে চৌরঙ্গি

এলাকায়—অমনি ওদের বিরক্ত করা শুরু হয়ে গেল। আসলে কলকাতার নানা এলাকায় বিকেল-সন্ধে থেকে তোমার ওই সেক্স-ওয়ার্কাররা খদ্দের ধরার জন্যে ঝাঁক বেঁধে অপেক্ষা করে। তুমি বড় বড় কথা বলছ, এরা নিপীড়িত শ্রেণী। কিন্তু এরা কি নিপীড়ন করে না? করে। দালাল, গুণ্ডা আর বেশ্যা দল পাকিয়ে বহু ভাল মানুষের সর্বস্ব কেড়ে নেয়। লজ্জায় বেশির ভাগ লোক পালায়, কিছু কিছু লোক এসে পুলিশের কাছে নালিশ করে। কী বলবে এখন সেক্স ওয়ার্কারদের? মহান শ্রমিক?'

'না, কখনওই না। তবে ভাল মন্দ তো সব শ্রেণীর মধ্যেই আছে।'

একটু বাঁকা হাসি হেসে ইন্সপেকটর ঘোষরায় বললেন, 'শোনো কৌশিক, চোখ খুলে চলো। আগে থেকেই তত্ত্বের মধ্যে ঢুকতে গেলে মাথা খারাপ হয়ে যাবে। আমার মাথার দিকে তাকাও, এখন কল্পনাও করতে পারবে না—কিন্তু একটা সময় আমার মাথা ঠাসা ছিল ঝাঁকড়া চুলে। বাংলা গল্পের বইতে সে আমলের ডাকাতদের চুলের যে বর্ণনা থাকে—ঠিক সেই ধরনের চুল ছিল আমার। কালো, কোঁকড়ানো বাবরি। সেই চুলের প্রায় সবটাই চলে গিয়েছে এখন, কিন্তু ওগুলো যাওয়ার বিনিময়ে আমি যা পেয়েছি—তার নাম মহামূল্যবান অভিজ্ঞতা। গোয়েন্দাগিরিতে তোমার বুদ্ধি খুব পাকা, কিন্তু সংসারে বেঁচেবর্তে থাকার নিয়মগুলো খুব জটিল—। একটু বয়েস না হলে ওগুলো ঠিক ধরা যায় না।'

কয়েক মুহূর্ত থমকে থাকার পরে কৌশিক বলল, 'আজ আপনি কিছুটা চটে আছেন, পরে একদিন এই নিয়ে আপনার সঙ্গে তর্ক করা যাবে।'

ইন্সপেকটর লম্বা করে মাথা নাড়ালেন দুপাশে। 'না, একটুও চটিনি। তবে এসব নিয়ে বলতে গেলে চটে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে যে লোকটা সারাদিন মাঠে চাষ করল সে শ্রমিক। যে মজুর দিনে আট-দশ ঘণ্টা মাথায় করে ইট বইছে সেও শ্রমিক। আর যে সেক্স-ওয়ার্কার মালফাল খেয়ে রাতের বিছানায় ফুর্তি করছে সেও শ্রমিক। বাহ্! একেই বলে মুড়ি-মিছরির এক দর। চাষা বা মজুর হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে দিনে মজুরি পাচ্ছে তিরিশ থেকে ষাট টাকা। আর ওই বিবি-শ্রমিকরা দু-চার ঘণ্টার ফুর্তির বিনিময়ে রোজগার করছে কয়েকশো বা কয়েক হাজার টাকা। কী, এদের হয়ে এখনও ওকালতি করতে চাও?'

'আমি তো ওকালতি করছি না, আমি শুধু বলছি—।'

'বলাবলির কিচ্ছু নেই, আমি তোমাকে হালের একটা রিপোর্ট শোনাচ্ছি। গত তিন বছরে পশ্চিমবঙ্গের পাঁচটা জেলা থেকে কমপক্ষে সাত হাজার মেয়ে বেচাকেনা হয়েছে। কিনেছে দালালরা। বেশির ভাগ চালান গেছে দিল্লি আর মুম্বইয়ের রেডলাইট এরিয়ায়। জেলাগুলো হল উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর আর হাওড়া। এক-একটা মেয়ের দাম উঠেছে দশ থেকে বিশ হাজার টাকা। বাবা-মাদের দালালরা বুঝিয়েছিল মেয়েদের ভাল জায়গায় ভাল চাকরি পাইয়ে দেবে। সাত হাজারের মধ্যে মাত্র পঞ্চাশটি মেয়েকে এখনও পর্যন্ত উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। ওদের আর ওদের বাবা-মাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে আসল ব্যাপারটা জানা গেছে এখন। এই তো আমাদের দেশের হাল। কমবেশি সব জায়গাতেই একই ধরনের ছবি। এই অবস্থায় তুমিই বলো—বেশ্যাদের সামাজিক স্বীকৃতি, আইনগত সুযোগসুবিধে পাইয়ে দিলে কী সাঙ্ঘাতিক অবস্থা হবে! ওদের কষ্টের কোনও

লাঘব না, মধ্যিখান থেকে লুটেপুটে খাবে দালাল আর ব্রথেল-ওনাররা। মেয়ে-চালান রাতারাতি দশ গুণ বেড়ে যাবে। এই মেয়েগুলোর দুঃখের কাহিনীগুলো কেমন যেন ছকবাঁধা। কেউ বলে—অমুক আমাকে ফুসলে এনেছে। কেউ বলে—অমুক আমাকে জবরদস্তি করে এই কাজে নামিয়েছে। কেউ আবার বলে, আমার স্বামীই আমাকে এই লাইনে—। এই মেয়েটাও ওই ধরনের একটা গপ্পো মেরেছে আমার কাছে।'

'তাই ?'

'বলো না ডেকে পাঠাচ্ছি।'

'আপনার সামনে ভয়ে ও মুখ খুলবে না।'

'ঠিক আছে, আমি কোয়ার্টার্স থেকে একটু ঘুরে আসি। সকাল থেকে তিনটে ফোন এসেছে। চা-টা আর ব্লাড শ্যুগার কমাবার ওষুধটা খেয়ে আসি। তুমি কী খাবে বলো ?'

'শুধু চা।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে ইন্সপেকটর ছোট্ট একটা হুঙ্কার ছাড়লেন, অমনি স্যুইং-ডোর ঠেলে একজন কনস্টেবল ঢুকে স্যালুট ঠুকল। ইন্সপেকটর গম্ভীর গলায় বললেন, 'রেড্ করে আজ সকালে যে মেয়েছেলেটাকে নিয়ে আসা হয়েছে, এখানে নিয়ে আয়। সাহেব জিজ্ঞাসাবাদ করবে, কেউ যেন এখন এখানে না আসে।'

ইন্সপেকটর ঘোষরায় ঘর ছাড়ার একটু পরেই এ ঘরে একটা মেয়েকে ঢুকিয়ে দিয়ে গেল কনস্টেবল।

মেয়েটার দিকে তাকিয়ে প্রায় চমকে উঠেছিল কৌশিক। কী সজীব চেহারার মেয়ে। বয়েস বড় জোর একুশ-বাইশ। ছিপছিপে চেহারা। টিকালো নাক, নাকে নাকছবি। বড় বড় চোখ, ভয়-পাওয়া চোখে কৌশিককে একবার দেখেই চোখ নামিয়ে নিয়েছিল। ভাবাই যান না, এই মেয়েটা ওই ধরনের জঘন্য একটা কাজের সঙ্গে জড়িত।

মেয়েটার চেহারার মধ্যে বেশ একটা ভদ্র এবং সম্ভ্রান্ত ছাপ আছে। অন্য কোনও জায়গা হলে কৌশিক নির্ঘাত বলে ফেলত ; দাঁড়িয়ে কেন, বসুন। কিন্তু কোনও অপরাধীকে পুলিশ ইন্সপেকটরের ঘরে চেয়ারে বসাবার রেওয়াজ নেই।

অল্প কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পরে নিজের চেয়ারটা সামান্য ঘুরিয়ে নিয়ে গোয়েন্দা বলল, 'তোমার নাম কী ?'

মিহি গলায় উত্তর দিল মেয়েটি, 'সন্ধ্যা।'

'শোনো সন্ধ্যা, তোমাকে শুধু আমি একটা ঘটনার কথাই জিজ্ঞেস করব। যদি মিথ্যে বলো, তোমার ক্ষতি। যদি সত্যি বলো, তোমার কিছুটা লাভ হতে পারে।'

গোয়েন্দার কথার কোনওরকম প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না মেয়েটির মধ্যে।

গোয়েন্দা কেশে গলা পরিষ্কার করে খুব সহজ ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি বিবাহিত ?'

প্রশ্নের কোনও উত্তর দিল না মেয়েটা।

এবার আরও সহজ করে আরও সহজ ভঙ্গিতে গোয়েন্দা জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কি বিয়ে হয়েছে ?'

হঠাৎই কেমন যেন ঝাঁজিয়ে উঠল ঠাণ্ডা চেহারার মেয়েটি। 'হয়েছিল, তবে ওকে বিয়ে বলে না।'

'আমি বড়বাবুর কাছে একটুখানি শুনেছি। ওই ব্যাপারটা আমাকে তুমি খুলে বলো। ব্যাপারটা কী জানো সন্ধ্যা, যদি প্রমাণ করা যায়—তুমি নিজের ইচ্ছেয় নয়, অন্যের জোরাজুরিতে এই পথে নেমেছ—তোমার শাস্তির মাত্রা অনেকটা কমে যাবে।'

সহানুভূতির ভঙ্গিতে বলা সামান্য এই কয়েকটা কথা শুনেই মেয়েটি একটু যেন কেঁপে উঠল। ওর চোখ ফেটে কয়েক ফোঁটা জল পড়ল ঘরের মেঝেয়।

কৌশিক জিজ্ঞেস করল, 'তোমার বাবা কি চাকরি করতেন?'

'হ্যাঁ, সরকারি চাকরি।'

"ক'ভাইবোন তোমার?"

'তিন বোন। ভাই নেই।'

'তুমি কি বড়?'

'না, সবচেয়ে ছোট।'

'তোমার বিয়ে কে ঠিক করেন?'

'বাবা।'

'তোমরা কেউ পাত্রকে চিনতে আগে থেকে?'

আবার ফুঁসে উঠল মেয়েটি। 'চিনলে কি আমার ওই সর্বনাশ হত! দেড় বছর আগে রিটায়ার করেছে আমার বাবা। হাতে কিছু টাকা এসেছিল। সেই টাকা ভেঙে গয়না গড়িয়ে দিয়েছিল। অন্যান্য জিনিসপত্তরও দিয়েছিল সাধ্যের বাইরে গিয়ে। আদরের ছোটমেয়ের বিয়ে বলে কথা। তা, আমার স্বামী বিয়ের তিনদিনের মধ্যেই আমার গয়নাগাটি, জিনিসপত্র কেড়েকুড়ে নিয়ে মসজিদবাড়ি স্ট্রিটে এক বাড়িউলির কাছে আমাকে বেচে দিয়েছিল। তারপর থেকে তো রোজ রাত্তিরে নতুন নতুন স্বামী। লজ্জায়-ঘেন্নায় বাবার কাছে আর মুখ দেখাতে পারিনি। মা মরে বেঁচেছে অনেক দিন আগে।'

'বাবার কথা মনে পড়ে না?'

'পড়ে। যখন পড়ে তখন কষ্ট পাই।'

'অন্য সময়?'

'খুব ফুর্তিতে থাকি। বাড়িউলিমাসি খুব ভাল মানুষ। জানে আমি পালাব না। তাই যখন যেখানে খুশি যেতে পারি।'

'যার সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়েছিল তার কথা মনে পড়ে?'

'মনে পড়বে না আবার! আমি জোর করে মনে করি। ভুললে চলবে না। একদিন না একদিন ওর সঙ্গে দেখা আমার হবেই। তখন আমি শোধ তুলব।'

'শোধ তোলার জন্যে মনে রাখতে চাও?'

'ঠিক তাই।'

গোয়েন্দার চোখের মধ্যে মুহূর্তের জন্যে কৌতুকের কয়েকটা তারা ফুটে উঠেছিল। একটু থেমে বলল, 'তা হলে তোমার মুখ থেকে তোমার ওই স্বামীর চেহারার বর্ণনাটা আমার শুনে রাখা দরকার। আমাদের কাজকারবার তো অপরাধীদের নিয়েই। কেমন দেখতে তোমার স্বামীকে?'

'ময়ূরছাড়া কার্তিকের মতো।'

'তার মানে খুব সুন্দর দেখতে?'

'সুন্দর দেখেই তো আমরা বাপ-বেটি দুজনেই ভুল করেছিলাম।'

'সুন্দর তো বুঝলাম। কিন্তু কী ধরনের সুন্দর ? কোনও একটা চিহ্নটিহ্নের কথা বলো, যা দেখে ওকে আমরা চিনতে পারব।'

'চিহ্নটিহ্ন চোখে পড়েনি ছোটবাবু, তবে ওই বরের সঙ্গে ঘর করলে লাথি খেয়ে আমাকে মরতে হত।'

'কেন, এ-কথা বলছ কেন ?'

'অত বড় পা আমি আর কোনও মানুষের দেখিনি !'

উত্তর শুনে হঠাৎই মেরুদণ্ড কেমন যেন টানটান হয়ে উঠেছিল গোয়েন্দার।

।। পাঁচ ।।

গোয়েন্দা কৌশিক মিত্রের চেম্বারটি ফ্লোর স্পেসের হিসেবে বেশ ছোটই, কিন্তু কায়দা করে সাজানো-গোছানোর জন্য খুব একটা ছোট দেখায় না। চার দেয়ালে আলমারি, ওপরে বুককেস। ঘরের দু-প্রান্তে একটু ছোট মাপের দুটো চেয়ার-টেবিল। এদিকেরটা গোয়েন্দার, ওদিকেরটা তার প্রবীণ সহকারী সনাতন মুখার্জির।

গোড়ার দিকে গোয়েন্দা আর তার সহকারীর বয়সের গরমিল একটু ধাঁধায় ফেলত মক্কেলদের। এটা কেমন যেন নিয়মের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে—গোয়েন্দার চাইতে সহকারী বয়েসে বেশ কিছুটা ছোট হবে, নিদেনপক্ষে সমবয়সী। কিন্তু গোয়েন্দার বয়স ছাব্বিশ আর সহকারীর বাহান্ন হলে সাধারণ মক্কেলরা একটু ঘাবড়ে যায়। কিন্তু মাদক ও মূর্তি পাচারকারী মস্ত একটা চক্রকে ধরার পর থেকে এই জুটির বেশ সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে। ওদের বয়সের বেয়াড়া হিসেব নিয়ে কেউ আর এখন মাথা ঘামায় না।

সনাতন মুখার্জিকে কৌশিক মুখার্জিবাবু বলে ডাকে। মুখার্জিবাবু গোয়েন্দাকে খুব একটা ডাকাডাকিব মধ্যে যান না, তবে মাঝেমধ্যে 'স্যার' বলে ফেলেন।

এই 'স্যার' শব্দটা কৌশিকের একদম ভাল লাগে না, কিন্তু আপত্তি তুললেই মুখার্জিবাবু মুখে তুবড়ি ছোটান। বলেন—স্যার, কেন বলব না, বলুন তো ? প্রথমত আপনি আমার মালিক, আমি কর্মচারী ; মালিককে স্যার বলার মধ্যে কোনও দোষ নেই। দ্বিতীয়ত, আপনি অসম্ভব বুদ্ধিমান। ভাস বাংলাটা এখন মনে পড়ছে না, কিন্তু ওই যে যাতে বোঝায় বুদ্ধিতে ক্ষুরের ধার আছে—আপনি তাই।

এই কথাটাতেও গোয়েন্দার খুব আপত্তি, কিন্তু মুখার্জিবাবুকে থামানো কঠিন। গলার স্বর আর একটু ওপরে তুলে উনি তুবড়ি ছোটান আবার। 'বুদ্ধিমানকে বুদ্ধিমান বলতেই হবে। মারাত্মক সব খুন চুরি-জোচ্চুরি-জালিয়াতির রহস্য ভেদ করা কি চাট্টিখানি কথা !

এ-ব্যাপারে আমার ধারণা খুব পরিষ্কার। যে বুদ্ধিমান সে বিশ বছর বয়েসেও বুদ্ধিমান, ত্রিশ বছর বয়েসেও বুদ্ধিমান; আবার পঞ্চাশ-ষাট বছর বয়েস হলেও বুদ্ধিমান; যে বোকা সে সব বয়েসেই বোকা। ধরুন আমাদের বয়েসটা পালটাপালটি হয়ে গেল, তার মানে কি অল্প বয়েসের সুবাদে আমি আপনার চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান হয়ে যাব? না, কখনওই না। মগজ আমার যতটা খাটে, ততটাই খাটবে। আপনার গুণের কদর করতেই হবে আমাকে। হাতে তেমন কাজকর্ম না থাকেল এই সব প্রসঙ্গ তুলে মুখার্জিবাবুকে একটু তাতিয়ে দেয় কৌশিক। ব্যস, অমনি শুরু হয়ে যায় ওঁর লেকচার। ওই লেকচারেই বেশ কিছুটা সময় গড়িয়ে যায় দিব্যি।

অবসর সময়ে মুখার্জিবাবু নিজেও অনেক গল্প ফাঁদেন। মানুষটি রসিক। নানা ঘাটের জল খেয়েছেন। সুতরাং ওঁর গল্প এগিয়ে চলে তরতর করে।

কিন্তু আজ ক'টা দিন আবহাওয়া কেমন যেন থমথমে। বেশির ভাগ সময় কৌশিক চেম্বারে থাকে না। যখন থাকে তখন নিজের মধ্যে ডুবে থাকে। চোখমুখের চেহারা অন্য রকম হয়ে যায়। কপালে মাঝেমধ্যেই ভাঁজ ফুটে ওঠে কয়েকটা। ডায়েরি টেনে সাঙ্কেতিক ভাষায় নানা ধরনের নোট নেয়।

এখন কৌশিক যে কেসটা হাতে নিয়েছে, মুখার্জিবাবু শুধু তার মোদ্দা বিষয়টুকু জেনেছেন। গোয়েন্দার এই প্রবীণ সহকারীর ঠোঁটের ডগায় বেশ কয়েকটি প্রশ্ন ঝুলে আছে, কিন্তু উনি খুব ভাল করেই জানেন---প্রশ্ন করা এখন অর্থহীন। গোয়েন্দা একটা কথারও উত্তর দেবে না। মুখ খুলবে রহস্যভেদের রুপোলি রেখা কোথাও একটু-আধটু দেখতে পেলেই।

কোনও জটিল কেস হাতে নেওয়ার পরে গোয়েন্দার এ ভাবে মুখ টিপে থাকাটা সহকারীর কাছে একটু অপমানজনক। বাস্তব জীবনে কিংবা গল্পের বইতে গোয়েন্দা কোথাও সহকারীর কাছে বোবা হয়ে থাকে না। বোবা হয়ে থাকলে সহকারী রাখাব কী দরকার! কিন্তু মৌনী গোয়েন্দা কয়েক দিন বাদে আবার আগের চেহারায় ফিরে এলে সহকারীর পুরনো মান-অভিমান উধাও হয়ে যায়।

ইদানীং মুখার্জিবাবু আর এক ধাপ এগিয়ে ভাবছেন। ভাবছেন, অতিরিক্ত মনঃসংযোগ করার সময় বুদ্ধিমান মানুষমাত্রই খুব চুপচাপ হয়ে যায়। সুতরাং এ ক্ষেত্রে গোয়েন্দার সহকারীর কাজ হল গোয়েন্দাকে বিরক্ত না করা।

হঠাৎ কৌশিক লম্বা একটা শিস দিয়ে উঠল, তারপর রাইটিং-প্যাডের হিজিবিজি-কাটা পাতাটা গোল্লা পাকিয়ে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ফেলল। সহকারী ওর দিকে তাকাতেই গোয়েন্দা বলল, 'মুখার্জিবাবু, একটু কফি খেলে কেমন হয়?'

'খুব ভাল হয়', বলেই মুখার্জিবাবু আলমারি থেকে ফ্লাস্ক বার করে চেম্বার থেকে বেরিয়ে গেলেন। এখান থেকে মিনিট-তিনেক হাঁটলেই একটা কফি শপ পাওয়া যায়। বেশ ভাল কফি বানায় দোকানটা। মুখার্জিবাবু দু-কাপ কফি কিনে চটপট ফিরে এলেন।

মক্কেলদের জন্যে বেশ কয়েকটা কাপ কিনে রেখে দেওয়া হয়েছে আলমারিতে। মুখার্জিবাবু ওখান থেকে দুটো কাপ বার করলেন। তারপর গোয়েন্দার টেবিলে কফি পরিবেশন করার কাজটা চটপট শেষ করে নিজের চেয়ারে গিয়ে বসলেন আর এক কাপ কফি হাতে নিয়ে।

গোয়েন্দা কফির কাপে ছোট্ট একটা চুমুক দিয়ে বলল, 'আহ্! দারুণ বানিয়েছে তো কফিটা!'

'এ দোকানটা বরাবরই ভাল কফি বানায়, তবে দিশেহারা অবস্থায় থাকলে সে কফি তো আর তারিফ করা যায় না।'

'মানে ?'

রহস্যপূর্ণ হাসিটা আর একটু ছড়িয়ে দিয়ে মুখার্জিবাবু বললেন, 'গোলমেলে খুনের তদন্ত ঠিক কোন্ দিক থেকে শুরু করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। এবার সেই সমস্যাটা কেটেছে। অর্থাৎ আপনি এখন আর দিশেহারা নন। নন বলেই কফির স্বাদটা নিতে পারছেন।'

অবাক হল গোয়েন্দা। 'কী যা-তা বলছেন!'

'কিচ্ছু যা-তা বলিনি। মুখের ভাষা মিথ্যে বলতে পারে, কিন্তু শরীরের ভাষা পারে না।'

'মানে ?'

'আপনার মতো এমন একজন বুদ্ধিমান মানুষ বারবার মানে জানতে চাইছেন কেন বলুন তো ?' বডি ল্যাঙ্গুয়েজ তো আপনিই আমাকে শিখিয়েছেন। ওহ্‌ দারুণ ভাষা। ওই ভাষাটার চর্চা করা আমি এখনও থামাইনি। কাউকে মুখ ফুটে কিচ্ছু বলতে হবে না, কিন্তু ভাবভঙ্গি দেখে তার মনের কথাটা বুঝে ফেলা যাবে। পৃথিবীতে এত বড় ভাষা আর একটাও নেই!'

মুচকি হেসে গোয়েন্দা বলল, 'আপনি তো সাঙ্ঘাতিক লোক মশাই! তা, আমার শরীরের ভাষা পড়ে কী জানলেন ? পড়লেনই বা কী ভাবে ?'

'বলছি'—বলার পরে কফিতে লম্বা একটা চমুক দিলেন মুখার্জিবাবু, তারপর মুখ খুললেন আবার। 'বুলা বলে ওই মেয়েটার মার্ডার কেসটা হাতে নেওয়া পর থেকে ভীষণ অন্যমনস্ক হয়ে গেছেন আপনি। খুব স্বাভাবিক। অল্পবয়সী, ফুটফুটে একটা মেয়ের বিয়ের রাতে এ ভাবে খুন হয়ে যাওয়ার মতো দুঃখজনক ঘটনা আর কী থাকতে পারে! তবে গোয়েন্দা তো আর দুঃখে ভেঙে পড়ে না, তার মাথার মধ্যে রহস্যভেদ করার অঙ্ক কষা চলতেই থাকে। সেই অঙ্ক কষা চলছিল আপনার একটু আগে পর্যন্ত—।'

গোয়েন্দা হেসে উঠে সহকারীকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'চলছিল ? এখন থেমে গেছে ? কী করে বুঝলেন ?'

'একেবারে থেমে যায়নি, তা হলে তো এক্ষুনি খুনিকে ধরে ফেলতেন। তবে অঙ্কের প্রথম পর্বটা শেষ। কোন্ দিক দিয়ে এগোতে হবে সেটা এবার কিছুটা ধরে ফেলেছেন আপনি।'

'তাই নাকি! তা, আপনি এটা ধরলেন কী ভাবে ?'

'আপনার শরীরের ভাষা পড়ে।'

'সে তো একটু আগেই বললেন। কিন্তু শরীরের সেই ভাষাটা কী ?'

কফির কাপে এবার পর-পর দুটো চুমুক দিয়ে মুখার্জিবাবু বললেন, 'আজ চেম্বারে ঢোকার পর থেকে আপনি কালকের মতোই গম্ভীর হয়ে ছিলেন। রাইটিং প্যাড টেনে হিজিবিজি কাটছিলেন। সত্যি-সত্যি হিজিবিজি নয়, ওটা আপনার মগজের অঙ্কের যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ। কিন্তু অঙ্ক মিলছিল না।'

'কী করে বুঝলেন ?'

'আপনার চোখমুখের ভাবভঙ্গি, কপালের ভাঁজ দেখে।'

'ব্যস, এইটুকুই ?'

'না। আপনি একটু পর-পর হিজিবিজি-কাটা পাতাগুলো বিচ্ছিরি ভাবে দল পাকিয়ে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে ফেলছিলেন। আপনি এমনিতেই খুব গোছানো স্বভাবের মানুষ। চেম্বারের মধ্যে যেখানে-সেখানে এ ভাবে কাগজ ছড়ানো আপনার প্রকৃতির বাইরে। কিন্তু কেন করছেন তা হলে? এর একটাই উত্তর। আপনার হিসেব মিলছে না। আর মিলছে না বলেই আপনি অস্থির হয়ে যা করার নয়, তাই করছেন।'

গোয়েন্দার মুখে এক চিলতে হাসি ছড়িয়ে পড়েছিল। 'বেশ। তারপর?'

'আপনি প্রায়ই আঙুল দিয়ে নাক ঘষছিলেন। নাক ঘষার মতো শারীরিক কোনও কারণ না থাকলে কেউ যদি বারবার নাক ঘষে, শরীরের ভাষার ব্যাকরণ অনুসারে ধরে নিতে হবে—তার অপছন্দ করার মতো কোনও কারণ ঘটেছে। থেকে থেকেই আপনার নাক ঘষার কারণ—রহস্যভেদের অঙ্ক আপনার মিলছে না।'

গোয়েন্দার মুখের এক চিলতে হাসি এবার আর একটু বড় হল। 'শেষে যে মিলেছে—সেটা কী করে ধরলেন?'

'আপনি হিজিবিজি-কাটা রাইটিং প্যাডের শেষ পাতাটা ছিঁড়ে নিয়ে খুব যত্ন করে গোল্লা পাকালেন। তারপর সেটা আপনার স্বভাব অনুসারে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ফেললেন। অকারণে আর নাক ঘষলেন না। সুরেলা লম্বা একটা শিস দিলেন। গম্ভীর মুখে হাসি ফুটল। স্বাভবিক গলায় কফি খেতে চাইলেন। এসব দেখে বুঝলাম, আপনার প্রথম পর্বের অঙ্ক মিলেছে এবার। কী, ঠিক বলেছি কি?'

খোলামেলা গলায় হেসে উঠে গোয়েন্দা বলল, 'ঠিক কি বেঠিক, আপনার কথায় আমার সায় আছে কি না—সেটাও আমার শরীরের ভাষা পড়ে বুঝে নিন।'

লাজুক মুখে জবাব দিলেন মুখার্জিবাবু, 'এইমাত্র তো একটা পরীক্ষা দিলাম—। আবার পরীক্ষা? শুনুন, শরীরের ভাষা শেখার তালিম তো আপনার কাছ থেকেই পেয়েছি। ঠিক হলে আপনি তারিফ করবেন, ভুল হলে শুধরে দেবেন। মাস্টারমশাইরা তো তাই করে থাকেন। আপনার সম্পর্কে এতক্ষণ ধরে যা বললাম, তা কি সত্যি?'

আর একবার হাসল গোয়েন্দা। 'শতকরা ষাট ভাগ সত্যি। তবে আমার মনের কথা জেনে তো কাজের কাজ কিছু হবে না। বাইরের কিছু-কিছু লোকের শরীরের ভাষা পড়ে তাদের ভেতরের কথা জানতে হবে। এই যেমন ধরুন ট্রিপস অ্যান্ড ট্রিপস ট্রাভেল এজেন্সির বুকিং ক্লার্ককে বাজাতে হবে আপনাকে। আলাপ করবেন, কথা বলবেন, আবার ওর শরীরের ভাষাও পড়বেন।'

'কেন?'

'কেন আবার, খবর বার করার জন্যে। মিস্টার অ্যান্ড মিসেস গুহ ওই ট্রাভেল এজেন্সির মাধ্যমে গলফ গ্রিনের গেস্ট হাউস ভাড়া নিয়েছিল। নিয়েছিল তো?'

'হ্যাঁ, প্রাথমিক খবর তো তাই বলে।'

'উপস্থিত প্রাথমিক খবর ধরেই এগোনো যাক। ট্রাভেল এজেন্সির মাধ্যমে ওরা গেস্ট হাউস ভাড়া নিয়েছিল। গুহরা মাদ্রাজের লোক। হয় ওরা ইতিমধ্যে ফিরে গেছে, কিংবা ফিরবে। ফিরে গেলে কবে ফিরছে, কোন্ ট্রেনে এবং ঠিক কোথায়? যদি না ফিরে থাকে—কবে, কোন্ ট্রেনে কোথায় ফিরবে? এই খবরগুলো আপনাকে কায়দা করে জানতে হবে।'

'কিন্তু টিকিট ওর ওই ট্রাভেল এজেন্টের কাছ থেকে কিনতে যাবে কেন?'

'কিনবেই যে তার কোনও মানে নেই, তবে কেনার সম্ভাবনাই বেশি। এজেন্সি ওদের গেস্ট হাউস ঠিক করে দিয়েছে। সুতরাং ওদের কাছ থেকে ফেরার টিকিট কেনার একটা দায় থেকে যাচ্ছে পার্টির। ট্রাভেল এজেন্সিও টিকিট বেচার চেষ্টা করবে।'

'কবে যাব ?'

'আজকেই। ট্রাভেল এজেন্সির ঠিকানাটা আপনাকে আমি লিখে দিচ্ছি। আপনি ক্লায়েন্ট সেজে যাবেন। বেশ বড়সড় ক্লায়েন্ট। ট্রেনের টিকিটের ব্লক-বুকিংয়ের জন্য যাচ্ছেন। আপনি বুড়োবুড়ির বড় একটা ঝাঁককে তীর্থধর্ম করাবার জন্যে দক্ষিণ ভারতে নিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু এই লাইনে আপনি নতুন। কী ভাবে কী করলে দুটো পয়সার সাশ্রয় হয় সেই ব্যাপারে ওই এজেন্সির বুকিং ক্লার্ক বা ম্যানেজারের উপদেশ চাইবেন। ব্যস, তা হলেই দেখবেন আপনার অর্ধেক সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। বাঙালি প্রতিষ্ঠান। বাঙালিরা যা-যা ভালবাসে তার মধ্যে সবার ওপরে আছে উপদেশ দেওয়া। ভিড়ের মধ্যে কোনও একটা সমস্যার কথা তুলুন না, দেখবেন চারদিক থেকে ঝাঁক-ঝাঁক উপদেশ ভেসে আসছে। অযাচিতভাবে উপদেশ দেওয়ার লোকের সংখ্যাও কম নয়। কেউ হয়তো এসে বলবেন—আরে, আপনার শরীরটা তো বেশ খারাপ দেখাচ্ছে, আপনি আপনার ব্লাডশুগারটা পরীক্ষা করিয়ে নিন। তবে আজেবাজে ডায়াগনস্টিক সেন্টারে যাবেন না। আপনি সোজা চলে যান—। আপনার এই সোজা পথ শেষ পর্যন্ত ঘুরে-ঘুরে কোথায় গিয়ে থামবে, তার আর ঠিকঠিকানা নেই। মোদ্দা কথা, ট্রাভেল এজেন্সির কাছে উপদেশ চেয়ে এবং মোটা লাভের লোভ দেখিয়ে ওই গুহদের সম্পর্কে যাবতীয় খবরাখবর বার করে আনতে হবে। ছদ্মবেশ ধরে যাবেন, আর—।'

'বাকিটা আর বলার দরকার নেই।'

'কী বলতে চাইছি বলুন তো ?'

'ওই তো আপনার আসল পরিচয় আর উদ্দেশ্যের কথা ওরা ঘুণাক্ষরেও টের না পেয়ে যায়—তাই তো ?'

সামান্য একটু বিব্রত হওয়ার ভাব ফুটে উঠল গোয়েন্দার চোখেমুখে। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে বলল, 'বাড়তি এই সাবধানতা নেওয়ার কথাটা শুধু যে আপনাকে বলি, তা নয়—। আপনাকে বলার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও শোনাই। আমাদের পেশাটা তো অদ্ভুত। এখানে একটু ভুল হওয়া মানে পুরো ব্যাপারটাই কেঁচে যাওয়া। আপনি বেরিয়ে পড়ুন, আমাকেও বেরুতে হবে—।'

'আপনি কোথায় যাবেন ?'

'অনেক দূরে, শহর ছাড়িয়ে গাঁয়ের পথে—। তবে একটা জিনিস আমাকে খুব ভাবিয়ে তুলেছে। এ অনেকটা সেই ইয়েতির গল্পের মতো—।'

'ইয়েতির গল্প !'

'হ্যাঁ। হিমালয়ের অনেক উঁচুতে সতেরো-আঠারো হাজার ফুট উঁচুতে, তুষার-মানব দেখেছেন কেউ-কেউ। বিশাল চেহারার, দু-পেয়ে রোমশ প্রাণী। চোখে পড়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তুষারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছে। তবে ওদের পায়ের ছাপ দেখা গেছে পরিষ্কার। এক-একটা পায়ের ছাপ সাধারণ মাপের মানুষের পায়ের ছাপের চেয়ে তিন গুণ বড়। আজ থেকে বছর-সত্তর আগে একটা ব্রিটিশ টিম মাউন্ট এভারেস্ট জয় করতে গিয়ে

প্রথম তুষার-মানব দেখে। পরে ওদের পায়ের ছাপ দেখে বরফের ওপর। রিপোর্টটা ছাপা হয়েছিল এখানকার স্টেটসম্যান কাগজে। এখন আমি সেই ইয়েতিকে খুঁজছি।'

'মানে ?'

'মানে তো পরিষ্কার। ইয়েতির পায়ের মতো পা-ওয়ালা একটা মানুষকে আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি।'

'শহর ছেড়ে এই যে গাঁয়ের দিকে যাচ্ছেন সে কি ওই ইয়েতির খোঁজে ?'

'না, তবে কপাল ভাল হলে ওকে পেয়েও যেতে পারি।'

মুখার্জিবাবু পরিষ্কার বুঝতে পারলেন, এখন উনি যত প্রশ্নই করুন না কেন, গোয়েন্দা হেঁয়ালিটাকে জিইয়ে রাখবে ঠিক। সুতরাং উনি ওদিকে না গিয়ে বললেন, 'দিন, ট্রাভেল এজেন্টের ঠিকানাটা আমাকে লিখে দিন।'

গোয়েন্দা রাইটিং প্যাডের পাতায় খসখস করে ঠিকানাটা লিখল। তারপব একটানে পাতাটা ছিঁড়ে ধরিয়ে দিল সহকারীর হাতে।

হেঁয়ালি ফাঁদার হাসিটা গোয়েন্দার মুখে ফিরে এসেছিল আবার। একটু থেমে থেমে বলল, 'ধরুন, কোনও একটা ইয়েতি কলকাতায় জুতো কিনতে এসেছে। কিন্তু ও কি কোনও দোকানে ওর পায়ে মাপের জুতো পাবে ?'

মুখার্জিবাবু মুচকি হেসে বললেন, 'আপনি সঙ্গে থাকলে ঠিক পেয়ে যাবে। ভাল গোয়েন্দারা তো সব সময় অসাধ্যসাধন করে থাকে।'

মুখার্জিবাবুর কথায় গোয়েন্দা কিন্তু হাসল না। বরং হঠাৎই বেশ গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলল, 'এই ইয়েতিরা খুব হিংস্র প্রকৃতির হয়। আজ থেকে বছর-কুড়ি আগে নেপাল থেকে পাঠানো একটা প্রেস-রিপোর্টের ক্লিপিং দেখছিলাম সেদিন। একটা ইয়েতি স্নোফিল্ড থেকে কিছুটা নেমে এসে একটা গরু আর তিনটে ইয়াক মেরে ফেলেছিল। কী ভাবে জানেন ? গরুটার টুটি ছিঁড়ে আর ইয়াক-তিনটের মাথা ঘুঁষি মেরে থেঁতলে দিয়ে।'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে মুখার্জিবাবু বললেন, 'ঠিক আছে, আমি আজ চলি তা হলে। আপনিও তো বেরুবেন বলছিলেন—। বেরুলে বেরুবেন, আপনার কাছে তো ডুপ্লিকেট চাবি আছে। কাল দেখা হবে আবার।'

।। ছয় ।।

দোতলা রেস্টুরেন্ট। জানালার ধারের দু-জোড়া চেয়ার-টেবিলের ওপর শীতের একফালি মিষ্টি রোদ এসে পড়েছে। দোতলায় খুব একটা খদ্দের নেই। জানলার ধারে মুখোমুখি বসে আছে কৌশিক আর প্রমিতা। টেবিলে এক প্লেট চিজ স্যান্ডুইচ আর দু-কাপ কফি। কফিতে ছোট্ট একটা চুমুক দিয়ে খুশি-খুশি গলায় প্রমিতা বলল, 'যাক, আমাকে আর

বেকার বলে ঠাট্টা করতে পারবে না। সুনেত্রাদির কিন্ডারগার্টেনে আমি এখন একজন রেগুলার টিচার। মাইনে উপস্থিত দু-হাজার টাকা। চাকরি দেওয়ার পরেই সুনেত্রাদি কথা দিয়েছে, ছ-মাস বাদে আরও কিছু টাকাপয়সা বাড়াবে।'

একটা স্যান্ডুইচে কামড় বসিয়ে কৌশিক বলল, 'বাহ্! খুব ভাল খবর। মাইনে পাওয়াব পরে একদিন খাইয়ে দিও।'

'মোটে একদিন!'

'আমি অল্পেই খুশি। তবে তুমি যদি রোজ খাওয়াতে চাও, খাওয়াতে পারো। আমি আপত্তি করব না।'

ঠোঁট উলটে জবাব দিল প্রমিতা—'তোমাকে রোজ খাওয়াতে হলে তো চোর-ডাকাতদের ডেরায় যেতে হবে আমাকে। গোয়েন্দারা সব চেয়ে বেশি ভালবাসে চোর-ডাকাতদের।'

'আমরা ভালবাসলে কী হবে, ওরা বাসে না। এই তো বেশ ক'টা দিন কেটে গেল, কিন্তু একটা চোর-ডাকাতের টিকিও দেখতে পেলাম না। তুমি বরং তোমার সুনেত্রাদিকে বলেকয়ে আমারও একটা চাকরি জুটিয়ে দাও ওঁর স্কুলে। গোয়েন্দগিরি করা ছেড়ে দেব একদম। গোয়েন্দার কাজ বাজে কাজ।'

'বাজে লোক তো বাজে কাজই করে থাকে। এই শোনো, আমি না আর একটু হলেই সুনেত্রাদির কাছে ধরা পড়ে যাচ্ছিলাম!'

'ধরা! কী নিয়ে?'

'আরে তুমি তো পত্রিকার লোক সেজে প্রফেসর মৃদুল ভট্‌চাজের সাক্ষাৎকার নিতে গিয়েছিল—। তোমার সঙ্গে আমিও ছিলাম। তার মানে আমিও পত্রিকার লোক—ছোটখাটো সাংবাদিক-টাংবাদিক। গতকাল ওর কিণ্ডারগার্টেনে চাকরির অফারটা দিয়ে সুনেত্রাদি বলল, তুমি এই কাজটা করলে আমি খুব খুশি হব। সঙ্গে সঙ্গে আমি সায় দিয়ে বললাম—ঠিক আছে, আমি করব। সুনেত্রাদি বলল, কিন্তু কাজটা তোমার চাকরির সঙ্গে ক্ল্যাশ করবে না তো? আমি আর একটু হলেই বলে ফেলছিলাম—আমার আবার চাকরি কোথায়! অতি কষ্টে সামাল দিয়ে বলেছি—আমার ওই পত্রিকার কাজটা কোনও কাজই নয়। নেহাত বেকার বসেছিলাম বলে—। ওটা আমি ছেড়ে দেব, ঠিকই করে ফেলেছি।'

'খুব ভাল করেছ। আমি যে মিথ্যে পরিচয় দিয়ে ওদের বাড়িতে গিয়েছিলাম, সেটা আবার বলে বসোনি তো?'

'ন্‌না। বরং বলেছি তুমি পাক্কা সাংবাদিক। কাজ শেখাবার জন্যে মাঝেমধ্যে আমাকে এখানে-সেখানে নিয়ে যাও। তবে কাজটা আমার কখনওই ভাল লাগেনি।'

'যাক, তোমার মাস্টারনির চাকরি তো পাকা?'

'হ্যাঁ, কাল থেকেই জয়েন করছি। সকাল সাতটা থেকে বারোটা। শনি-রবি ছুটি।'

স্যান্ডুইচের বাকি অর্ধেকটি মুখের মধ্যে ফেলে দিল কৌশিক। তারপর কফির কাপটা টেনে নিল। রোদ্দুরে পরিষ্কার সোনালি রং। এমন শীতের জন্যে এমন রোদ্দুরই আদর্শ। রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে কৌশিক কয়েক মুহূর্ত কেমন যেন ঝিম মেরে বসে থাকার পরে বলল, 'তোমার সুনেত্রাদি তো বিরাট বড়লোক! তা, উনি আবার বাড়িতে স্কুল খুলতে গেলেন কেন?'

কথাটা শুনে প্রমিতা একটু বুঝি চটে উঠল। 'কী আশ্চর্য, কিন্ডারগার্টেন খোলা মানেই

কি রোজগারের আর একটা পথ বার করা! সুনেত্রাদিরা কী বড়লোক তুমি জানো না। বিশাল সম্পত্তি, মালিক বলতে সুনেত্রাদি আর ওর দাদা। বাবা-মা মারা গেছেন অনেক দিন আগে। শুনেছি টাকাপয়সা, বিষয়আশয় যা আছে, তাই ভাঙিয়ে ওদের পরের তিনটে পুরুষ বসে খেতে পারবে। রোজগারপত্তর বাড়াবার প্রশ্নই ওঠে না। সুনেত্রাদি কিন্ডারগার্টেন খুলেছে সময় কাটাবার জন্যে। আর আমাকে চাকরি দিয়েছে কেন বলো তো?'

'কেন?'

'আসল কারণটা আমি ঠিক ধরে ফেলেছি। আমাকে চাকরি দিয়েছে মনের কথা বলার মতো একটা লোক পাওয়ার জন্যে।'

অবাক হল কৌশিক। 'কেন, ভদ্রমহিলার মনের কথা বলার মতো কেউ নেই নাকি। ওঁর স্বামী?'

'পণ্ডিত বর। দিনরাত্তির বই মুখে দিয়ে বসে আছে। তার ওপর আজ এখানে সেমিনার, কাল ওখানে কনফারেন্স। কী কথা বলবে ওর সঙ্গে বলো?'

'কথা বলার মতো আর কেউ নেই বাড়িতে?'

'আছে। ঝি, চাকর, বেয়ারা, বাবুর্চি, দারোয়ান—। কিন্তু কারও সঙ্গেই তো মনের কথা বলা যায় না।'

'তোমার সুনেত্রাদির কি কোনও বন্ধু নেই?'

'আছে। রিমিদি। আমরা মজা করে বলতাম, একজন আর একজনের ছায়া। স্কুল-কলেজে একসঙ্গে পড়েছে। বিয়ের পরেও সম্পর্ক নষ্ট হয়নি। কিন্তু মাসছয়েক হল রিমিদিরা জব্বলপুরে বদলি হয়ে গেছে। রিমিদির বর রেলের ডাক্তার। এখনও টেলিফোন আসেনি ওদের কোয়ার্টার্সে। সপ্তায়-সপ্তায় চিঠি চালাচালি হয় দুই বন্ধুর মধ্যে। কিন্তু মুখের গল্পের অভাব কি আর চিঠিতে মেটে!'

'ওহ্! তোমার তা হলে এখন দুটো চাকরি। টিচার-কাম-কথা বলার লোক।'

'আমাকে পেয়ে সুনেত্রাদি বেঁচে গেছে। মনের কষ্ট জানাবার মতো মানুষ পেয়েছে একটা। প্রথম দিন ওকে দেখেই আমার মনে হয়েছিল—খুব অশান্তিতে ভুগছে। চেহারাটাও খারাপ হয়ে গেছে বেশ।'

'অশান্তি কাকে নিয়ে?'

'ওর দাদা অপুদাকে নিয়ে। অপুদা অসম্ভব খেয়ালি। এক-একটা খেয়াল আবার বেশি দিন টেকে না। সুনেত্রাদি বলছিল, একবার অপুদার খেয়াল হল—ছবি তুলবে। প্রচণ্ড দামি-দামি ক্যামেরা কেনা হল, স্টুডিও বানানো হল—তারপর বছর ঘুরতে না ঘুরতেই ছবির নেশা ছুটে গেল একদম। স্টুডিওতে তালা ঝুলিয়ে দিয়ে শুরু হল অর্কিডের চাষ—। এইরকম একটার পর একটা। খালি টাকার শ্রাদ্ধ।'

'ভদ্রলোকের বউ কিছু বলে না?'

'বিয়ে করলে তো বউ! দাদার বিয়ে দেওয়ার জন্যে সুনেত্রাদি কম চেষ্টা করেনি। শেষে দাদা একদিন বলল—তুই বিয়ে কর, তা হলে আমিও করব।'

'ওহ্! তোমার সুনেত্রাদির লেট ম্যারেজ?'

'আসলে সুনেত্রাদিকে দেখতে পরমাসুন্দরী হলে কি হবে, পোলিও ভিকটিম। ছোটবেলায় পোলিও হওয়ার পরে একটা পা কিছুটা শুকিয়ে গেছে। ক্রাচ বা লাঠি নেয় না, তবে

একটু পা টেনে হাঁটতে হয়। ভাল পাত্রের অভাব অবশ্য ওর কখনও হয়নি। সুন্দরী, শিক্ষিতা, তার ওপর বড়লোকের মেয়ে। অনেক ভাল-ভাল সম্বন্ধ এসেছিল, তবে সুনেত্রাদি রাজি হয়নি। ঠিক করেছিল, বিয়েই করবে না। শেষে, দাদাকে সংসারী করার জন্যে বিয়েতে মত দিয়েছে বেশি বয়েসে। দাদাই সব ব্যবস্থা করে বিয়ে দিয়েছে। ভাল বিয়ে। দাদা কিন্তু ব্যাচেলরই থেকে গেল।'

'খারাপ কী, অনেকেই তো বিয়ে করে না।'

রেস্টুরেন্টের এদিকে কেউ নেই, ওদিকে দু-চারজন নিজেদের মধ্যে গল্প করছে। এ দিকের কথা অত দূর পর্যন্ত পৌঁছবার কোনও সম্ভাবনা নেই। তবু গলার স্বর বেশ খাদে নামিয়ে প্রমিতা বলল, 'আর পাঁচ জন ব্যাচেলরের মতো থাকলে তো কোনও কথা ছিল না, ইদানীং অপুদা নাকি কুসঙ্গে মিশে—।'

হা-হা করে হেসে উঠে প্রমিতাকে থামিয়ে দিল কৌশিক। 'চরিত্রদোষ দেখা দিয়েছে?'

'আহ্! আস্তে।'

'শোনো, তোমার সুনেত্রাদিকে ওঁর দাদাকে নিয়ে অকারণে দুর্ভাবনা করতে বারণ করে দাও। বিয়ে-থা করেনি। প্রচুর পয়সা আছে। এখন উনি যদি নির্মল চরিত্র নিয়ে চিতায় উঠতে না চান—।'

'তুমি ব্যাপারটকে খুব সহজ করে দেখছ। সুনেত্রাদির ধারণা, খুব বাজে একটা চক্রের সঙ্গে ওর দাদা জড়িয়ে গেছে। এর ফলে ভয়ঙ্কর কোনও বিপদের মধ্যেও পড়তে পারে।'

'এ নিয়ে উনি ওঁর স্বামীর সঙ্গে কথা বলেননি?'

'বলেছে, কিন্তু তাতে কোনও লাভ হয়নি। প্রফেসর ভট্টাচার্য চটে গিয়ে বলেছেন—বিচ্ছিরি সব স্ক্যান্ডালাস ব্যাপার, তুমি তোমার দাদার সঙ্গে সব সম্পর্ক শেষ করে দাও। এ সব বলা খুব সহজ। সুনেত্রাদির দাদাঅন্ত প্রাণ। আমাকে বলছিল—তুমি কি ভাল কোনও প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সির খবর দিতে পারো আমাকে; আমি দাদার পুরো ব্যাপারটা জানতে চাই—।'

'তুমি কী বললে?'

'আমি বললাম, ডিরেক্টলি কাউকে চিনি না। তবে একটা সোর্স থেকে—। দেখো না, তুমি যদি ওকে একটু সাহায্য করতে পারো।'

'একসঙ্গে দুটো ঝামেলা সামলবার কোনও ক্ষমতা নেই আমার। আমার মাথায় এখন শুধুই বুলা মার্ডার কেস।'

প্রমিতার কফি ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল, ঠাণ্ডা কফিটা ও জলের মতো একচুমুকে শেষ করে বলল, 'আচ্ছা, বাঙ্গালোরে বা মহীশূরে কোনও ভাল এজেন্সিব সঙ্গে তোমার পরিচয় নেই?'

'কেন, ওখানকার এজেন্সি দিয়ে কী হবে?'

'সুনেত্রাদির দাদা তো এখন ওখানেই আছে। মাথায় ভূত চেপেছে—সিল্কের ব্যবসা করবে, মাইসোর সিল্ক। নামেই ব্যবসা, দেদার টাকা ওড়াচ্ছে। টাকা ওড়ানো নিয়ে সুনেত্রাদির কোনও মাথাব্যথা নেই। তবে অপুদা নাকি আন্ডারওয়ার্ল্ড এলিমেন্টসের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে আস্তে আস্তে।'

'এ খবরটা তোমার দিদি পেলেন কোত্থেকে?'

'ওই তো ওই প্রসেনজিৎ রায় জানিয়েছে।'

'কে সে?'

'বারে, তোমার মুখ থেকেই আমি ওর নাম শুনেছি। ভদ্রলোক হচ্ছেন বুলার কাকা।'

'কোন্ বুলা?'

'বুলা বলতে তো একজনকেই আমরা চিনি। তোমার ওই বুলা মার্ডার কেসের বুলা।'

কথাটা শুনেই কেমন যেন ছিটকে গিয়ে সোজা হয়ে বসল গোয়েন্দা। কয়েক মুহূর্ত ওর মুখ থেকে কোনও শব্দ বার হল না। একটু বাদে কেটে কেটে জিজ্ঞেস করল, 'প্রসেনজিৎ তোমার ওই সুনেত্রাদির দাদা অপুকে চিনল কী করে?'

'কেন চিনবে না, ওরা তো দুই বন্ধু। অপুদা মাইসোরে গেছেন বছর-দেড়েক। তার আগে পর্যন্ত দুজনের মধ্যে নিয়মিত আড্ডা হত। বুলার কেসটা নিয়ে সারা শহর তোলপাড়। কাগজে কাগজে কত লেখালেখি। সুনেত্রাদিই বলছিল—বুলা নামের মেয়েটার খুনের খবর পড়েছ তো কাগজে, ওই বুলার কাকা প্রসেনজিতের সঙ্গে আমার দাদার খুব ভাব।'

কৌশিকের কপালে বেশ কয়েকটা ভাঁজ। চৌকো ধাঁচের মুখ থেকে চোয়ালের হাড় একটু যেন ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। দৃষ্টি ধারালো। গোয়েন্দা বলল, 'তুমি তোমার সুনেত্রাদির কাছ থেকে ওঁর দাদার মাইসোর-ব্যাঙ্গোলোরের ঠিকানাটা লিখে নিও তো—। কালকেই চাই। আমার দেখা না পেলে আমার অফিসের মুখার্জিবাবুর কাছে ঠিকানাটা রেখে যেও।'

'তা হলে তুমি অপুদার ব্যাপারে খোঁজখবর নিচ্ছ তো?'

'হয় আমি নেব, না হলে অন্য কেউ। তুমি শুধু বলবে, ঠিকানাটা একটা ডিপেন্ডেবল এজেন্সির কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি। খোঁজখবর নেওয়া শেষ হলে ওরা রিপোর্টটা আপনাকে জানিয়ে দেবে। তবে একটু সময় লাগবে।'

রোদের যে ফালিটা এ পাশে এতক্ষণ পড়েছিল সেটা এখন সরে গেছে। বাতাসে শীতের ভাব বেড়েছে একটু। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে কৌশিক বলল, 'চলো এবার ওঠা যাক। কয়েকটা দরকারি কাজ সারতে হবে আমাকে এখন।'

প্রমিতার আর একটু গল্প করার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু ও খুব ভাল ভাবেই জানে—কাজ পণ্ড করে আড্ডা মারার মানুষ নয় গোয়েন্দা। সুতরাং একটু ব্যাজার মুখেই উঠে পড়েছিল চেয়ার ছেড়ে।

গোয়েন্দার মাথার মধ্যে নতুন একটা চিন্তার ঝড় উঠেছিল। মাথার মধ্যে অমন ঝড় উঠলে মুখে খুব একটা কথা আসে না। রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে চার রাস্তার ক্রসিং পর্যন্ত হাঁটার সময়টুকু কথা যা বলার শুধু প্রমিতাই বলেছিল। গোয়েন্দার কানে বোধহয় সব কথা যায়নি, গেলে ও দু-তিনবার বেয়াড়া জায়গায় হুঁ-হ্যাঁ বলে ফেলত না। চার রাস্তার মোড়ে এসে সামান্য হাত নাড়ানাড়ি করে দু'দিকের রাস্তা ধরেছিল দু'জন।

ফাঁকা একটা মিনিবাস পেয়ে গিয়েছিল কৌশিক। মিনিট-কুড়ির মধ্যে ও ওর ছোট্ট অফিসে পৌঁছে গিয়েছিল। ওর প্রবীণ সহকারী মুখার্জিবাবু ঝলমলে মুখে বললেন, 'মনে হচ্ছিল আজ আর আপনার দেখা পাব না, তবু ভাবলাম একবার ঘুরে যাই—। আপনি কোথায় যাবেন বলেছিলেন, যাননি?'

'গিয়েছিলাম। ভোরেই বেরিয়েছিলাম। দুপুরে ফিরেছি।'

'কাজ হল?'

'হ্যাঁ, কিছুটা। আপনার খবর কী বলুন? গিয়েছিলেন ট্রাভেল এজেন্টের কাছে?'

'হ্যাঁ। খুব সাজানোগোছানো ট্রাভেল এজেন্সি ট্রিপ্‌স অ্যান্ড ট্রিপ্‌স। এজেন্সির ম্যানেজার মধুবাবু—মধু ধর খুব গপ্পোবাজ লোক। দোকানে খদ্দেরপত্তর ছিল না। আমি বড় খদ্দেরের ভান করলাম—ব্লক বুকিং চাই। কিন্তু এই ধরনের কাজে আমারে কোনও অভিজ্ঞতা নেই। কী ভাবে কী করলে ভাল হবে বলুন—জিজ্ঞেস করলাম। আপনি ঠিকই বলেছেন, বাঙালিরা উপদেশ দিতে অসম্ভব ভালবাসে। ভদ্রলোকের উপদেশ আর থামে না। মাঝপথে দুবার চা খাওয়ালেন—।'

একটু অসহিষ্ণু হয়ে পড়েছিল গোয়েন্দা। 'আপনি যে কাজে গিয়েছিলেন তার কী হল? গুহদের কোনও খবরাখবর বার করতে পারলেন?'

'পেরেছি। সে অনেক কায়দা করে।'

'কায়দার কথা পরে শুনব। আগে খবরটা বলুন।'

'গুহরা মাদ্রাজে ফিরে যাওয়ার কোনও টিকিট কাটেনি। ব্যাঙ্গালোরের টিকিট কেটেছে শুধু। কিন্তু—।'

'কিন্তু কী?'

'নিজেদের জন্যে নয়, মিস্টার আর মিসেস সামন্তের নামে দু'খানা টিকিট কেটেছে।'

'এ নিয়ে অত চিন্তার কী আছে? না বদল করে টিকিট কেটেছে। আগেরটা ভুয়ো ছিল, এটাও ভুয়ো।'

মাথা চুলকে মুখার্জিবাবু বললেন, 'আজ্ঞে আমিও প্রথমে তাই ভেবেছিলাম, কিন্তু পরে দেখলাম তা নয়।'

কৌশিকের কপালে দুটো ভাঁজ পড়ল। 'কী করে বুঝলেন তা নয়?'

'ট্রাভেল এজেন্সির টিকিট বুকিং করার খাতায় ওই টিকিটের জেরক্স কপি ক্লিপ দিয়ে লাগানো আছে। দেখলাম, সামন্তদের বয়েস তেইশ আর তিরিশ। ওই গুহদের বয়েস তো বলছিলেন পঞ্চাশের ওপরে।'

গোয়েন্দার কপালে আবার ভাঁজ পড়ল। এবার ভাঁজের সংখ্যা বেশ কয়েকটা। সেগুলো আবার চট করে মিলিয়েও গেল না। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করল, 'ওই সামন্তরা কবে বাঙ্গালোরে যাচ্ছে?'

'আট তারিখ, তার মানে পরশু। ম্যাড্রাস মেল ধরে ম্যাড্রাসে নামবে। তারপর খুব সম্ভবত ওখান থেকে বৃন্দাবন এক্সপ্রেস ধরে ব্যাঙ্গালোরে।'

'আপনি তৈরি থাকুন। ওই সামন্তদের সঙ্গে আপনাকেও বাঙ্গালোরে যেতে হবে।'

'আমাকে! কেন?'

'কেন আবার, কাজে। আউটস্টেশনের কাজে তো আগে কখনও যাননি। এবার থেকে যেতে হবে মাঝেমধ্যে। সাউথ ইস্টার্ন রেলের সিনিয়র পি আর ও-র সঙ্গে আমার সম্পর্ক খুব ভাল, মনে হয় একটা বার্থ রিজার্ভেশন পেতে কোনও অসুবিধে হবে না।'

'কিন্তু ব্যাঙ্গালোরে আমাকে কী কাজ করতে হবে?'

'কাজটা শুরু হয়ে যাবে আপনার হাওড়া স্টেশন থেকেই। সামন্তদের চোখে চোখে রাখবেন। কোথায় যায়, কী করে—সব খবর নেবেন। আর ব্যাঙ্গালোরে কিংবা অন্য

কোথাও ওরা যদি হোটেলে ওঠে, সেই হোটেলে ঘর নেওয়ার চেষ্টা করবেন। মাঝেমধ্যে রাত এগারোটা নাগাদ আমাকে একবার ফোন করবেন বাড়িতে। সঙ্গে লাগেজ বেশি নেবেন না। মাঝারি মাপের কাঁধে ঝোলানো একটা ব্যাগ থাকলেই আপনার সব প্রয়োজন মিটে যাবে।'

'শীতকাল, শীতের কিছু জামাকাপড় তো নিতে হবে।'

'কোনও দরকার নেই। মাদ্রাজে শীত পড়ে না। ব্যাঙ্গালোরে সন্ধেবেলায় হাফহাতা একটা সোয়েটার পরলেই যথেষ্ট।'

'আচ্ছা, এই সামন্তদের পিছু নেওয়া ছাড়া ব্যাঙ্গালোরে আর কোনও কাজ নেই তো?'

'আছে। একজন ভাল মানুষ খারাপ একটা দলে পড়ে ডুবে যাচ্ছে। তার সম্পর্কেও খোঁজখবর নিতে হবে। ভদ্রলোকের নাম-ঠিকানা কাল দিয়ে দেব আপনাকে।'

।। সাত ।।

শীতের সকাল। ঘড়িতে সাড়ে-ছটা। কিন্তু ঘড়ির দিকে না তাকিয়ে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালে মনে হবে শেষ রাত। চারদিকে চাপ-চাপ কুয়াশা, দৃষ্টি বেশি দূর যায় না। কিন্তু প্রকৃতি নয়, সব ঋতুতেই ঘড়ি ধরে চলে প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর কৌশিক মিত্র। বেশ কনকনে বাতাস ছেড়েছে, কিন্তু ঘণ্টাখানেক হল সম্পদ বৃদ্ধির কাজ চালিয়ে যাচ্ছে ও নিষ্ঠার সঙ্গে। ভোরবেলায় গোয়েন্দা বোধহয় একটু গভীর ভাবেই বিশ্বাস করে থাকে স্বাস্থ্যই সম্পদ।

ব্যায়াম শেষ করার মুখে ডোরবেল বেজে উঠল। সামান্য সময়ের ব্যবধানে পর-পর তিনবার। গলা একটু ওপরে তুলে কৌশিক চেঁচাল, 'আসছি অবনীদা।' তারপর একটা পুলওভার গায়ে চাপিয়ে এসে দরজা খুলল।

বিশাল চেহারার পুলিশ ইন্সপেক্টর অবনী ঘোষরায়কে একটু উদ্‌ভ্রান্তের মতো দেখাচ্ছিল। ইন্সপেক্টর বললেন, 'আমি তো আওয়াজ দিইনি, তোমার দরজায় আইহোল না কী বলে—তাও তো নেই, তাহলে কী করে বুঝলে যে আমি এসেছি!'

বিব্রত মুখে কৌশিক বলল, 'এ প্রশ্নের উত্তর আমি বোধহয় দুয়েকবার দিয়েছি আপনাকে।'

'নো। কখনই দাওনি। দিলে নির্ঘাত মনে থাকত। আমি শুধু একটা জিনিস নিয়েই গর্ব করতে পারি—তা হলে প্রখর স্মৃতিশক্তি। ওটা আমার আছে। তবে হ্যাঁ, একটু-আধটু ভুল কার না হয়! কী করে বুঝলে যে আমি এসেছি?'

'আপনি বসুন তো। পরে আবার বলা যাবে একদিন।'

'না-না, আগে বলো।'

'আরে ওই তো—। আপনার ডোরবেল বাজাবার দুটো ভঙ্গি আছে। দুর্ভাবনা-টাবনা না থাকলে খুব লম্বা করে একবার বাজান। আর দুর্ভাবনা থাকলে পর পর তিনবার, এখন যেমন—।'

বিশাল চেহারার মানুষটা হঠাৎই ছেলেমানুষের মতো কৌশিকের হাত চেপে ধরে বললেন, 'দুর্ভাবনা বললে কম বলা হয়। শরীরের মধ্যে কী যে এক অস্থিরতা! কাল রাত্তিরে দু-চোখের পাতা এক করতে পেরেছি কি না সন্দেহ! যত ঝামেলা সব শালা আমার কপালে! অত কষ্ট করে ছেঁকে তুললাম, আর মাগিটা জাল কেটে পালাল।'

অবাক হয়ে গেল কৌশিক। 'কার কথা বলছেন?'

'কেন, খবরটা তোমার কানে আসেনি? খবর-কাগজওয়ালাদের চোখ এড়ালেও তো তোমার কান এড়ায় না।'

'আমাকে একটু কলকাতার বাইরে যেতে হয়েছিল। কী হয়েছে কী?'

ওদিকের বেতের চেয়ারটায় হাত-পা ছড়িয়ে বসে পড়ে ইন্সপেক্টর বললেন, 'ভাগ্যের মার বড় জব্বর মার ভাই। যাকে একবার মারতে শুরু করে, তাকে শুধু মেরেই যায়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ওই খানকিটাকে একটু কষে জেরা করতে পারলে বুলা মার্ডার কেসের ভেতরের খবরগুলো ঠিক বেরিয়ে আসত। কিন্তু এমনই কপাল যে, সে-সুযোগ আর পাওয়া গেল না।'

'কার কথা বলছেন? ব্লু ফিল্মের নায়িকা সন্ধ্যা নামের ওই মেয়েটা কি?'

'তা নয়তো কি! সে দিন তোমার কাছে চেপে গিয়েছিলাম, কিন্তু ওকে এক দফা জেরা করেই বুঝে গিয়েছিলাম—বুলা মার্ডার কেসের ব্যাপারে ও অনেক কিছু জানে। ভেবেছিলাম পরে ভাল করে ধরব, কিন্তু কোর্ট থেকে অর্ডার হল—ওকে হোমে পাঠাও। ভেবেছিলাম, ভালই হল। পরে হোমে গিয়ে ওকে ধরব। কিন্তু মাগি সে সুযোগ আমাকে দিল না। হোমে ঢোকার পরেই পালিয়েছে। আসলে এরা হল মস্ত একটা র‍্যাকেটের মেম্বার। আমার আফসোস কী জানো, অত কষ্ট করেও ওকে ধরে রাখতে পারলাম না। আসলে আমার আরও বেশি সাবধানী হওয়া উচিত ছিল—।'

কৌশিক সান্ত্বনা দেওয়ার গলায় বলল, 'কিন্তু দোষটা তো আপনার নয়। ও তো পালিয়েছে হোম থেকে।'

রীতিমত হতাশ দেখাচ্ছিল দুঁদে পুলিশ ইন্সপেক্টরকে। 'দোষগুণের প্রশ্ন নয়, আসলে মেয়েছেলেটাকে কোর্টে তোলার আগে আর একবার আমার জেরা করে নেওয়া উচিত ছিল। ওর কাছে খবর ছিল। আর একটু চাপ দিলেই সেটা বেরিয়ে আসত ঠিক। ও গায়েব হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুরো পরিশ্রমটা আমার বেকার হয়ে গেল। কালকেও বড় সাহেব ধমকেছে তদন্ত কদ্দুর এগলো। সব বললাম। শুনে এমন একটা কমেন্ট করল না, যেটা রীতিমত আপত্তিকর। নীচের ধাপে পড়ে আছি। মুখ বুজে অপমানটা হজম করতেই হল।'

'বুলার পোস্ট-মর্টেম রিপোর্টটা পেয়েছেন?'

'পেয়েছি। ইট্‌স আ কেস অব স্ট্রাঙ্গুলেশন। গলা টিপে মারা হয়েছে মেয়েটাকে।'

'তদন্তের জন্যে ওদের বাড়িতে কি আর গিয়েছিলেন?'

'না। ওদের বাড়ির ইনকুয়ারির কাজটা তো গোড়াতেই শেষ হয়ে গেছে। তবে আমরা

কত দূর কী করতে পারলাম জানার জন্য ভিকটিমের কাকা আমার কাছে এসেছিলেন দুবার।'

কথাটা শুনেই যেন নড়েচড়ে বসল গোয়েন্দা। দৃষ্টি ধারালো হয়ে উঠেছিল কিছুটা। 'বুলার কাকা মানে কি প্রসেনজিৎ?' তারিফ করার গলায় জবাব দিলেন ইন্সপেক্টর, 'আরে! তোমার স্মৃতিশক্তি তো খুব ভাল। হ্যাঁ, কাকার নাম প্রসেনজিৎ—। আমি ভুলে গিয়েছিলাম, তুমি বলতেই মনে পড়ে গেল।'

'আচ্ছা, ওব কাকাকে আপনার কেমন মনে হয়?'

'কেমন আর মনে হবে—আর পাঁচজন ভদ্রলোকের মতো। এরকম ক্ষেত্রে সবাই চায়—দোষীর শাস্তি হোক। সুতরাং ওঁর খবর নেওয়ার মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু নেই।'

'আচ্ছা, ওদের ব্যবসাটা কি পারিবারিক ব্যবসা? প্রসেনজিৎ কি ব্যবসার মধ্যে আছে?'

'জানি না। ও সব জানার সঙ্গে এ-কেসের কোনও সম্পর্ক নেই। শোনো ভাই, তোমার ওপর আমি কিন্তু পুরোমাত্রায় নির্ভর করে আছি। না হলে হেনস্থার একশেষ হবে। বুলা মার্ডার কেসে তোমার ইনভেস্টিগেশন কত দূর এগলো? তোমাকে তো ধরতেই পারছি না। যখনই ফোন করি, শুনি বাইরে। ছোটাছুটি আমার কেসটার ব্যাপারে তো?'

প্রশ্নের উত্তরে রহস্যময় একটা হাসি ফুটে উঠল গোয়েন্দাব মুখে। 'আমি এখন ইয়েতিব খোঁজ করছি।'

'ইয়েতি!'

'হ্যাঁ। মস্ত বড় একজোড়া পায়ের খোঁজ পেয়েছি। কিন্তু ওই পা-ওয়ালা প্রাণীর খোঁজ পাইনি। অত বড় পা, তার পক্ষে ইয়েতি হওয়াও অসম্ভব নয়।'

ধাঁধাব রহস্যভেদের মধ্যে একেবারেই যাওয়ার চেষ্টা করলেন না ইন্সপেক্টর। বিশাল চেহারার মানুষটা কেমন যেন ছেলেমানুষের মতো অভিমানী হয়ে উঠে বললেন, 'এই ঝামেলাটার হাত থেকে বাঁচাবার পরে আমাকে নিয়ে তুমি যত খুশি মজা কোরো। অপরাধীকে ধরতে না পারলে বেইজ্জতের চূড়ান্ত হবে। এটা তো কেস নয়। গ্রহের ফের বলতে পারো—। গত কয়েক মাসের মধ্যে ধরতে গেলে একটা ক্রাইমেরও কিনারা করতে পারিনি আমি। উদ্বেগ-উত্তেজনায় শরীরের সব কলকব্জা বিগড়ে যেতে বসেছে।'

'আপনার সেই মর্নিংওয়াক, জগিং—এগুলো চলছে তো?'

'আর মর্নিংওয়াক, জগিং—এখন তো খ্যাপা ষাঁড়ের তাড়া খেয়ে ছুটে বেড়াবার দশা হয়েছে। এখুনি ছুটতে হবে আর এক জায়গায়, তার আগে তোমাকে একটু তাগাদা দিয়ে গেলাম।'

'চা-টা খাবেন তো?'

'না, তার আর সময় হবে না।' উঠে দাঁড়াতে-দাঁড়তে উত্তর দিলেন ইন্সপেক্টর।

'কোন্ দিকে যাবেন এখন?'

'উত্তরে।'

'না, তাহলে আপনার সঙ্গে গিয়ে লাভ হবে না। আমি যাব উল্টোদিকে।'

'উল্টোদিকে কোথায়?'

'গার্ডেনরিচে। সাউথ-ইস্টার্ন রেলের অফিসে। পি আর ওকে টেলিফোনে ধরতে পারছি না। একজনের জন্যে একটা বার্থ রিজার্ভেশন দরকার। ঘুরেই আসি একবার।'

'ঠিক আছে, কিন্তু আমার কাজটায় আর একটু সময় দাও ভাই।'

উত্তরে গোয়েন্দা একটুখানি হাসল শুধু।

হাত নেড়ে বিদায় নিলেন ইন্সপেক্টর।

ইন্সপেক্টর কৌশিকের ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরেই কুয়াশা কেটে গিয়ে ঝকঝকে রোদ উঠল। রোদ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বইতে লাগল কনকনে হাওয়া।

পরদিন খবরের কাগজের প্রথম পাতায় বার হল—গতকাল ছিল এই মরসুমে কলকাতার শীতলতম দিন। খবরটা দেখে মুখার্জিবাবু গোয়েন্দার পরামর্শমতো একটামাত্র হাফহাতা সোয়েটার সঙ্গে নিয়ে সুদূর বাঙ্গালোরে যেতে ভরসা পেলেন না। উনি হাফহাতা সোয়েটারের সঙ্গে একটা মোটা পুলওভার নিলেন। তারপর তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে কানঢাকা একটা টুপি ঢুকিয়ে নিলেন ব্যাগের মধ্যে।

শেষ বিকেলে তরুণ গোয়েন্দা কৌশিক আর তার প্রবীণ সহকারী মুখার্জিবাবুর মধ্যে জরুরি আলোচনা হল আর এক প্রস্থ।

একটু বাদে টেলিফোন এল একটা। কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলার পরে রিসিভার নামিয়ে রেখে গোয়েন্দা বলল, 'যাক, এবার নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। ইমার্জেন্সি কোটায় আপনার বার্থ রিজাভেশন কনফার্মড। কোচ নম্বর এস সিক্স, লোয়ার বার্থ পেয়েছেন। তবে ওই সামন্তদের কোচ নম্বর তো থ্রি। দিনের বেলায় যে-সব স্টেশনে ট্রেন একটু বেশিক্ষণ দাঁড়াবে, ওদের একটু দেখে যাবেন তখন। কিন্তু চেন্নাইয়ে ট্রেন থামার সঙ্গে সঙ্গে নেমে পড়বেন, না হলে ওদের পিছু নিতে অসুবিধে হবে। ওখানেই তো বাঙ্গালোরের জন্যে ট্রেন বদল। হয় ওদের সঙ্গে তখন এক কামরায় উঠবেন, না হলে পাশের কামরায়। প্রমিতা অপূর্ববাবুর যে ঠিকানাটা দিয়ে গেছে সেটা সঙ্গে রেখেছেন তো ?'

উত্তরে বেশ লম্বা করে একদিকে মাথা কাত করলেন মুখার্জিবাবু।

'কী ছদ্মবেশ ধরবেন ঠিক করেছেন ?'

'হ্যাঁ, বড় কোনও ছদ্মবেশের মধ্যে যাব না। সরু একটা গোঁফ আর ছোট্ট একটা গোটি, যাকে বলে ছাগলদাড়ি। ব্যস, ওতেই চলে যাবে।'

হেসে উঠে দুদিকে মাথা নাড়াতে নাড়াতে গোয়েন্দা বলল, 'খবর্দার! ওই ধরনের ছদ্মবেশের মধ্যে কক্ষনো যাবেন না।'

গোয়েন্দার হাসিতে সহকারী একটু আহত বোধ করলেন। 'আপনি তো জানেন যাত্রা-থিয়েটারের সঙ্গে আমি অনেক দিন ছিলাম। আমার মেক-আপ কি কখনও আনাড়ির মতো হয়েছে ?'

'না, বরং আপনার মতো ভাল মেক-আপম্যান আমি খুব কমই দেখেছি। প্রোফেশনাল স্টেজের লোকরা আপনাকে পেলে লুফে নেবে।'

'তাহলে আমার মেক-আপের কথা শুনে হাসলেন কেন ?'

উত্তরে আর একবার হেসে উঠে গোয়েন্দা বলল, 'অন্য কারণে হেসেছি। ম্যাড্রাস মেলে চেপে ম্যাড্রাস পৌঁছতে আপনার ক'টা রাত লাগবে ?'

'কেন, দুটো রাত।'

'এই দু-রাত আপনি ঘুমোবেন না ?'

'মানে ?'

এবার বেশ চড়া গলায় হেসে উঠে গোয়েন্দা বলল, 'দাড়ি-গোঁফ লাগিয়ে রাতে বিছানা পেতে ঘুমোলে পরদিন সকালে সেই দাড়িগোঁফের অবস্থা কী হবে বলুন তো? তাও আবার একটা রাত নয়, পর-পর দুটো রাত।'

জিভ কেটে মুখার্জিবাবু বললেন, 'আসলে আপনি তো কখনও আমাকে এত দূরে কোনও তদন্তের কাজে পাঠাননি, তাই---।'

গোয়েন্দার আগের গাম্ভীর্য ফিরে এসেছিল আবার। 'শুনুন, ট্রেনে তো এক কামরায় আপনারা যাচ্ছেন না, সুতরাং ট্রেনে আপনার খুব একটা মেক-আপের দরকার নেই। আপনি চুল আঁচড়াবার ভঙ্গিটা পালটান। আপনার একটা বাহারি চশমা আছে, এটা পালটে সেটা পরে নিন। হাতে একটা খবরের কাগজ রাখবেন, আপনার সঙ্গে ওদের চোখাচোখি হওয়ার উপক্রম হলে ওটা তুলে মুখ আড়াল করবেন। ঠিক আছে, আর দেরি করবেন না। বাড়ি গিয়ে খেয়েদেয়ে বেরিয়ে পড়ুন। হাতে একটু সময় নিয়ে বেরুবেন। রাস্তাঘাটে জ্যাম তো আজকাল লেগেই থাকে। স্টেশনে আপনার সঙ্গে দেখা হবে আমার।'

হাওড়া স্টেশন থেকে ম্যাড্রাস মেল ছাড়বে আটটা পনেরোয়। ঘণ্টাখানেক আগে স্টেশনে এসে গেছেন মুখার্জিবাবু। কাঁধে একটা পেটমোটা ব্যাগ। কিন্তু ওঁর চলার ভঙ্গি দেখে যে-কেউ বুঝতে পারবে, ব্যাগটার ওজন নেহাত কম নয়। প্লাটফর্মে ট্রেন এল ছাড়ার সময়ের আধঘণ্টা আগে। একটু বাদেই রিজার্ভেশন চার্ট সাঁটা শুরু হয়ে গেলে বিভিন্ন স্লিপার কোচের গায়ে। ট্রেন ছাড়তে এখনও পঁচিশ মিনিট বাকি, কিন্তু কিছু-কিছু যাত্রীর মধ্যে অদ্ভুত ধরনের পড়িমরি ভাব দেখা যাচ্ছিল। ওদের দেখলে যে কারও মনে হবে---এই বুঝি ট্রেন ছেড়ে দিল!

নির্দিষ্ট কোচের গায়ে লাগানো চার্টে নিজের নাম দেখার পরে নিজের বার্থটাও দেখে নিয়েছেন মুখার্জিবাবু। ভারী ব্যাগটা কাঁধ থেকে নামিয়ে সিটের ওপর রেখে দিতে পারলে ভাল হত, কিন্তু সঙ্গী কেউ না থাকলে এই ঝুঁকিটা নেওয়া ঠিক নয়।

ট্রেনের কামরা থেকে মালপত্তর হাতাবার একটা আদর্শ সময় হল দূর পাল্লার ট্রেন ছাড়ার আগের সময়টুকু। অনেক কষ্টে ট্যাক্সি ধরে, রাস্তার ভিড় ঠেলে স্টেশনে পৌঁছে নির্দিষ্ট ট্রেনের সংরক্ষিত আসনটি খুঁজে পাওয়ার পরে বহু যাত্রীর কাঁপুনি দিয়ে জ্বর ছেড়ে যাওয়ার মতো অবস্থা হয়। একসঙ্গে অনেকটা উদ্বেগ, উত্তেজনা হুশ্ করে নেমে গেলে যে-কারও বুঝি চোখ বুজে আসে। সারা শরীরে ছাড়া-ছাড়া ভাব। ওই রকম একটা হালকা শরীর-মন নিয়ে যাত্রীরা যখন সি-অফ করতে-আসা মানুষজনের সঙ্গে গল্প জোড়ে তখন আর আশেপাশের মালপত্তরের ওপর নজর থাকে না তেমন। এই সুযোগটা চোররা কাজে লাগায়। কিছু স্যুটকেস, ব্যাগ হাতবদল হয়ে নেমে যায় কামরা থেকে। কোনও-কোনও যাত্রী এইভাবে সর্বস্ব খুইয়ে সফর বাতিল করে নেমে যায় ট্রেন থেকে। এই তথ্যগুলো মুখার্জিবাবু খুব ভাল ভাবে জানেন বলে কাঁধের ব্যাগ আর কাঁধ থেকে নামাননি।

ঘড়ির সময় এগিয়ে চলেছিল একটু-একটু করে। ট্রেন ছাড়তে আর মাত্র দশ মিনিট বাকি, কিন্তু কই কৌশিক তো এখনও এল না! মুখার্জিবাবু দৃষ্টি ধারালো করে চারদিক দেখে নিলেন একবার। গোয়েন্দার নতুন করে কিছু আর বলার নেই ওঁকে। যা বলার সবই বলে দিয়েছে। তবু স্টেশনে আসবে বলেছিল একবার।

কোচ নম্বর রিজার্ভেশন চার্টটা আর একবার দেখে নিলেন মুখার্জিবাবু। ষোলো আর

সতেরো নম্বর বার্থ মিস্টার আর মিসেস সামন্তের। কিন্তু বার্থে কেউ নেই। কোচের সামনে টুকরো-টুকরো কয়েকটা জটলা। যাত্রী আর তাদের বিদায় জানাতে আসা মানুষজনের ভিড়। আর একটু বাদেই যাত্রীরা উঠে পড়বে ট্রেনে। সামন্তদের চেনার কাজটা তারপরেই করা সম্ভব।

হঠাৎ মুখার্জিবাবু কানে চেনা গলা ভেসে এল, 'ষোলো, সতেরো নম্বর বার্থের যাদের তাদের চিনতে পারলেন ?'

চমকে উঠে মুখার্জিবাবু বললেন, 'আরে আপনি !'

গোয়েন্দা তার সহকারীকে শান্ত হওয়ার জন্যে পিঠে আলতো করে চাপড় মেরে বলল, 'আস্তে।'

খুব আস্তেই এবার কথা বললেন মুখার্জিবাবু। 'সাঙ্ঘাতিক মেক-আপ নিয়েছেন আপনি ! আমি তো আপনাকে একজন গুজরাটি ব্যবসায়ী ভেবে নিয়েছিলাম। কখন এসেছেন আপনি ?'

'মিনিট-কুড়ি। আপনি সামন্তদের চিনতে পেরেছেন ?'

'না তো। আপনি ?'

'ওই যে লাল শাড়ি-পরা সুন্দরী মেয়েটি, ওর নাম হচ্ছে ঝিমলি। নতুন বউ। একদম ডানদিকের ওই যে হ্যান্ডসাম লম্বা ছেলেটা—বাঁ হাতের কব্জিতে লাল সুতো বাঁধা, ডান হাতে ঘড়ি—ওর নাম সোমেন। এরাই হল নববিবাহিত সামন্ত দম্পতি। এক সপ্তাহ আগে বিয়ে হয়েছে ওদের। এখন বাঙ্গালোরে হানিমুনে যাচ্ছে। যারা সি-অফ করতে এসেছে তাদের মধ্যে মেয়ের বাড়ির লোকজনই বেশি।'

চাপা গলায় মুখার্জিবাবু বিস্ময় প্রকাশ করলেন। 'আপনি এর মধ্যে এত কিছু জেনে গেছেন ?'

'ভিড়ের মধে ওদের পাশে দাঁড়িয়ে থাকলে যে-কেউ এই তথ্যগুলো জানতে পারত !'

ট্রেন ছাড়তে আর মিনিট-পাঁচেক বাকি। নবদম্পতি কয়েকজন গুরুজনকে প্রণাম করে ট্রেনে উঠে নির্দিষ্ট বার্থে গিয়ে বসল।

কৌশিক নিচুগলায় মুখার্জিবাবুকে বললেন, 'চলুন, আপনাকে তুলে দিই এবার।'

বেশ জোরেই ছ'নম্বর কোচের দিকে পা চালাল দুজন। কামরায় ওঠার আগে গোয়েন্দা শেষ কথাগুলো বলে নিল সহকারীকে। 'চোখ-কান খুলে রাখবেন সব সময়। যা-যা বলেছি, সব করবেন। যদি মনে হয়, আরও একটু বেশি করা দরকার—করবেন। তবে অতিরিক্ত ঝুঁকি নেবেন না। হ্যাপি জার্নি।'

কথাগুলো বলার পরেই তিন নম্বর কোচের কাছে ফিরে গিয়েছিল গোয়েন্দা। ট্রেন ছাড়ল নির্দিষ্ট সময়ে।

ট্রেন ছাড়ার পরে কিছুক্ষণ হাত নাড়ানাড়ির পালা চলে। ওদিকে ট্রেনের যাত্রী এদিকে তাদের বিদায় জানাতে আসা মানুষজন। গতি বাড়াতে বাড়াতে ট্রেনটা হঠাৎই একসময় দূরে চলে যায়, তারপরেই শুরু হয় প্লাটফর্মের মানুষদের ঘরে ফেরার পালা।

জনস্রোতের পাশাপাশি কিংবা ঠিক পেছনে-পেছনে চলার মধ্যে কোনও অসুবিধে নেই। সামন্ত-দম্পতিকে বিদায় জানাতে-আসা মানুষদের সঙ্গে মিশে গিয়ে গেটের দিকে এগোচ্ছিল গোয়েন্দা। বেশ কিছু আত্মীয়স্বজন একসঙ্গে থাকলে কথাবার্তা বুঝি কখনওই থামে না।

গোয়েন্দা চোখেমুখে উদাসীন থাকার ভাব ফুটিয়ে এই পরিবারের সব কথা শুনছিল খুব মন দিয়ে।

স্টেশন থেকে বেরুবার পরে ওই পরিবারের কয়েকজন বিদায় নিয়ে বাস-মিনিবাসের পথ ধরল। মেয়ের মা, দাদা-বৌদি, আর এক দিদি দাঁড়াল ট্যাক্সির লাইনে। ওদের ঠিক পেছনেই দাঁড়িয়েছিল গোয়েন্দা।

খুব একটা ভিড় ছিল না। ট্যাক্সি পাওয়া গেল চটপট। আগের ট্যাক্সিতে মেয়ের আত্মীয়রা, পরের ট্যাক্সিতে গোয়েন্দা।

ট্যাক্সির চাকা একটুখানি গড়াবার পরে গোয়েন্দার ট্যাক্সিওয়ালা জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাবেন ?'

একটু নিচু গলায় উত্তর দিল গোয়েন্দা, 'সামনের ওই ট্যাক্সিটার পিছু নিন।'

।। আট ।।

গ্রামের নাম চণ্ডীপুর। কিলোমিটারের হিসেবে মেদিনীপুরের এই গ্রামটি কলকাতা থেকে বেশি দূরে নয়। কিন্তু এখানে পৌঁছতে গেলে সময় লেগে যায় প্রচুর। ঝরঝরে বাস, টালামাটাল নৌকো, সবশেষে গরুর গাড়ি। গন্তব্যস্থলের দিকে শামুকের গতিতে এগোবার সময় মাঝেমধ্যেই মাথার মধ্যে অদ্ভুত সব চিন্তাভাবনা খেলে যাচ্ছিল তরুণ গোয়েন্দা কৌশিক মিত্রের।

কালকেই ও খবরের কাগজে পড়েছে কলকাতায় ভিডিও ফোন আসছে। ফোন মানে এবার আর শুধুই কানে কানে কথা নয়, কথা-বলা-মানুষটির ছবিও ফুটে উঠবে টেলিফোনের পাশে রাখা স্ক্রিনে। উন্নত দেশে টেলিকমিউনিকেশনের বিপ্লব শুরু হয়ে গিয়েছে বহুদিন। এ-দেশেও এখন তার হাওয়া বইতে শুরু করেছে ভালরকম। এ যুগ সাইবারস্পেস টেকনোলজির। যোগাযোগ এখন আর নাকি কোনও সমস্যা নয়। কিন্তু গাঁয়ের পথে গরুর গাড়ি চেপে চলার সময় কৌশিকের মনে হচ্ছিল—কোনও একজন মাতব্বর প্রযুক্তিবিদকে এখানে এনে ছেড়ে দিলে বেশ হয়!

ধানখেত, ভাঙাচোরা মাটির পথ, জলা জমি, পুকুর, গাছপালা-ঘেরা মাটির ঘরবাড়ি—এসবের ধারেকাছে আসতে প্রযুক্তির বহু কাল লেগে যাবে। দূর থেকে ঝিমধরানো পাখির ডাক ভেসে আসছিল। শহুরে মানুষ কৌশিক খুব একটা পাখি চেনে না, কিন্তু কেন জানে না ওর বারবার মনে হচ্ছিল—ওই ডাকটা নির্ঘাত ঘুঘুর ডাক।

চণ্ডীপুরের চণ্ডীতলায় 'মা চণ্ডী স্টুডিও'তে কৌশিক যখন পৌঁছল তখন ওর ঘড়িতে বেলা দুটো। মাটির বাড়ি, টিনের চাল। খুঁটির ওপরদিকে একটুকরো রঙ-জ্বলা সাইনবোর্ড। ওই বোর্ডের ভেতর থেকে স্টুডিওর নাম খুঁজে বার করা আবিষ্কারের কাজ। খুঁটির একেবারে

ওপরে আর একটা বোর্ড ঝোলানো। আঁকাবাঁকা হরফে ওখানে যা লেখা আছে, দূর থেকেই তা চোখে পড়ে। 'কালীমাতা সার ভাণ্ডার'কে দেখার পরেই ওদিকে পা বাড়িয়েছে গোয়েন্দা।

পাত্রের জুতো কেনার দিনে সৈকত গুহ বুলার কাকা প্রসেনজিতের হাতে যে অমূল্য সম্পদ ধরিয়ে দিয়েছিল, তারই সূত্রে তিন দফায় তিনটে দিন বিস্তর ঘোরাঘুরির পরে আজ এখানে এসে পৌঁছেছে গোয়েন্দা। হলুদ-হয়ে-যাওয়া ফোটোগ্রাফের পেছনে ছোট্ট একটা রবারস্ট্যাম্প আছে। স্ট্যাম্পটি 'মা চণ্ডী স্টুডিও'র। সঙ্গে ঠিকানা। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলাতেই বেশ কয়েকটি চণ্ডীপুর আর চণ্ডীতলা আছে। আগের দুটি সফরে ভুল জায়গায় পৌঁছেছিল গোয়েন্দা। কিন্তু এবার মনে হয় ভুল হয়নি। এক খুঁটিতেই 'মা চণ্ডী স্টুডিও' আর 'কালীমাতা সার ভাণ্ডার'। এই সার ভাণ্ডারের ক্যালেণ্ডারও হলুদ ওই ফোটোগ্রাফের সঙ্গে হাতে এসেছে গোয়েন্দার।

দুপুরবেলায় এখানে বোধহয় দোকানপাট বন্ধ থাকে। কালীমাতা সার ভাণ্ডারের ঠিক পাশের ঘরের দরজাটা ভেজানো ছিল। একটু ইতস্তত করে ওই দরজার কড়া নাড়ল গোয়েন্দা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দরজা খুলে গেল। অল্পবয়সী একটি বউ। অবাক চোখে কৌশিককে একবার দেখে নিয়েই ছুট লাগাল বাড়ির ভেতরদিকে। একটু পরেই বেরিয়ে এল মাঝবয়সী একটা লোক। খালি গা, পরনে খাটো ধুতি। শহুরে বাবু দেখে এ মানুষটিও অবাক হলেন। কৌশিক বলল, 'আমি কলকাতা থেকে আসছি। আসলে আমার ছেলেবেলায় একবার এসেছিলাম এখানে। এদিকে একটা দরকারে আসতে হয়েছিল——। আগে থেকেই ভেবে রেখেছিলাম, এদিকে যখন আসছি——এই জায়গাটা থেকে ঘুরে যাব একবার। আচ্ছা, এখানে একটা স্টুডিও ছিল না? মা চণ্ডী স্টুডিও?'

শেষ প্রশ্নটা শুনে হাসি ফুটল মানুষটির মুখে। 'সে তো অনেকদিন আগের কথা। আমার কাকার মাথায় খেয়াল চেপেছিল——বানিয়েছিলেন। তা, সে স্টুডিও বছর ঘুরতে না ঘুরতেই উঠে গেছে। গাঁ-গঞ্জে কে আর স্টুডিওতে এসে ছবি তোলাবে বলুন? ওই স্টুডিওর জায়গাতেই আমি আমার সারের দোকান বানিয়েছি।'

'ওহ্! দোকানটা আপনার! বাহ্! ভাল চলছে নিশ্চয়ই?'

'নিজের মুখে বলা ঠিক নয়। তবু বলব আপনাদের পাঁচজনের আশীর্বাদে ভালই চলছে। আসলে যেখানে যা চলে, সেটারই ব্যবসা করা উচিত। গাঁয়ের মানুষজন চাষবাস নিয়েই থাকে। চাষ করতে সারের দরকার হয়। আমি সেই সার বেচি। আমার কাকা খুলেছিলেন স্টুডিও। গাঁয়ের চাষি-মজুররা খাটনির পয়সা খরচা করে ছবি তোলাতে যাবে কেন বলুন তো? নিজেকে দেখার ইচ্ছে হলে আয়নায় মুখ দেখবে। তাই না?' নিজের রসিকতায় মানুষটি নিজেই বেশ গলা ছেড়ে হেসে উঠেছিলেন।

রসিকতাটা যে সত্যিই বেশ উঁচু দরের——এটা বোঝাবার জন্যে কৌশিকও হাসল। তারপর বলল, 'ভাল বলেছেন——!'

গাঁয়ের লোকটির আতিথেয়তা বোধ হঠাৎই বেশ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। বলল, 'আপনি বাইরে দাঁড়িয়ে কেন? আসুন, ভেতরে আসুন।'

বাড়ির ভেতর বলতে বেশ বড়সড় একটা উঠোন। একধারে ধান শুকোচ্ছে। আধখানা বৃত্তের রেখায় খানপাঁচেক মাটির ঘর। প্রতিটি ঘরের সামনে নিকনো দাওয়া। গৃহকর্তা একটা দাওয়া গামছা দিয়ে ঝেড়ে পরিষ্কার করে বললেন, 'বসুন।'

কৌশিক অন্য কোনও দিকে তাকায়নি, কিন্তু পরিষ্কার বুঝতে পারছিল আশপাশের ঘর থেকে বেশ কিছু কৌতূহলী চোখ ওকে খুঁটিয়ে দেখছে। দেখাটাই বুঝি স্বাভাবিক। বাহারি প্যান্ট-শার্ট-পরা এমন শহুরে বাবুকে বোধহয় কদাচিৎ এই ধরনের অজ পাড়াগাঁয় দেখা যায়।

গৃহকর্তা বাবুকে আপ্যায়ন করার জন্য হাঁক পাড়লেন—'যা, শিগ্গির যা, ডাব পেড়ে নিয়ায়।' হাঁক শুনে কোন্ এক অদৃশ্য জায়গা থেকে লাফিয়ে পড়ে রোগাপটকা দুটো ছেলে তীরবেগে ছুটে বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে।

পা ঝুলিয়ে দাওয়ায় বসেছিল কৌশিক। বাড়ির কর্তা তাই দেখে আবার ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। 'ও কী, পা ঝুলিয়ে বসেছেন কেন? পা তুলে বসুন। মনে করুন, এ বাড়ি আপনার।'

কিছু-কিছু মানুষ এই ধরনের কথা আকছার বলে থাকে, কিন্তু সেই সব কথার সঙ্গে এই কথাটার অনেক তফাত। চোখের দিকে তাকিয়ে তফাতটা ধরতে পেরেছিল কৌশিক। কী অকপট চাউনি। কথাগুলো যেন মানুষটির বুক থেকে উঠে এসেছে।

ডাব এসে গিয়েছিল এক কাঁদি। ধারালো কাটারির কয়েকটি কোপে বড়সড় একটা ডাব কেটে অতিথির হাতে তুলে দিয়েছিল বাড়ির কর্তা। ডাবের মধ্যিখানে চৌকো গর্ত। কিন্তু কোনও স্ট্র নেই। স্ট্র এখানে বোধহয় মানায়ও না। বেশ মিষ্টি জল। তৃপ্তির সঙ্গে একটু একটু করে পুরো জলটাই গলার মধ্যে ঢেলে দিয়েছিল কৌশিক।

গৃহকর্তা এবার আত্মপরিচয় দিলেন। 'আমার নাম শ্রী মাধবরঞ্জন গিরি। আমরা এই চণ্ডীতলার তিন পুরুষের বাসিন্দা। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

মাধবরঞ্জনের দৃষ্টিতে রহস্যের চাপা আলো ফুটে উঠেছিল। 'আপনি তো আমার কাকার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। তাই না?'

অবাক হল কৌশিক। 'আপনার কাকা?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার কাকাই তো রাধাগোবিন্দ গিরি।'

কী বলতে চাইছেন মাধবরঞ্জন! অবাক চোখে মানুষটির দিকে তাকিয়েই রইল কৌশিক।

এবার অবিকল বাচ্চাদের মতো আহ্লাদে আটখানা হলেন মাধবরঞ্জন। 'সামনের মাসেই তো কাকা ওঁর পঁচাশি নম্বর বিয়েটা করেছেন।'

'মানে?'

'কেন, চুরাশির পরে তো পঁচাশিই হয়। আপনি কত নম্বর পর্যন্ত জানতেন?'

'নম্বর?'

আবার শিশুর হাসি খেলে গেল মাধবরঞ্জনের মুখে। 'নম্বর আপনার কী করে খেয়াল থাকবে! আমাদেরই থাকে না। গত বছরের গোড়ার দিকে লালমুখো এক সাহেব আর মেম এসেছিল কাকার সঙ্গে দেখা করতে। সঙ্গে দোভাষী। ওরা কোত্থেকে কাকার খবর পেয়েছে কে জানে! সাহেব কাকার অনেকগুলো ছবি তুলেছিল। তারপর হাসতে হাসতে বলছিল; আপনার সঙ্গে দেখা করে ধন্য হলাম। আমি আশিজন মেয়েকে বিয়ে করা লোক এই প্রথম দেখলাম। সাহেবের সঙ্গে যে মেম এসেছিল সে সাহেবের বউ নয়—বন্ধু। মেমসাহেব তো কাকাকে সরাসরি বিয়ের প্রস্তাবই দিয়ে বসল। বলল: আমি ভারতে আর দু-মাস থাকব। এই দু-মাস আপনাকে বিয়ে করে আপনার সঙ্গে থাকতে চাই।'

ধাঁধার জট কৌশিকের কাছে বেশ কিছুটা খুলে গিয়েছিল। মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করল, 'তা, আপনার কাকা কি রাজি হলেন ?'

প্রশ্ন শুনে কেমন যেন হতাশ হয়ে গেলেন মাধবরঞ্জন। 'আর বলবেন না ; কাকার সব ভাল, তবে গোয়ার্তুমিটা বড্ড বেশি। দোভাষী কত করে বোঝাল, আমরাও ঠারেঠোরে সায় দিলাম। কিন্তু কাকার এক কথা—না, দেশি মেয়ে ছেড়ে মেমসাহেব বিয়ে করব না। আসলে কাকা তো ব্রিটিশ আমলে স্বদেশী করেছিলেন কিছুদিন। তা, ভেতরে-ভেতরে সেই ব্যাপারটা রয়ে গেছে। সবই আমাদের কপাল!' শেষ কথাটা আফসোসের গলায় বললেন মাধবরঞ্জন।

'কেন, কপালের কথা টানছেন কেন ?'

অতি সহজ এই কথাটা শহুরে বাবুটি বুঝতে না পারার জন্যে অবাক হলেন মাধবরঞ্জন। 'কপালের দোষ নয়তো কী বলুন! একটা সময় এই গাঁয়ের অর্ধেকের ওপর জমি আমাদের ছিল। এখন কমতে-কমতে মাত্র কয়েক বিঘেয় এসে ঠেকেছে। কাকা যদি ওই মেমসাহেবকে দু-মাসের জন্যে বিয়ে করতেন, আমরা আমাদের হাতছাড়া জমিটমি বেশ কিছু আবার কিনে নিতে পারতাম। সাহেবমেমদের তো টাকাপয়সার অভাব নেই। বরপণবাবদ কাকা দু-পাঁচ লাখ টাকা দাবি করলেই পেয়ে যেতেন। বিয়ে তো আবাব মাত্তব দু-মাসের জন্যে—।'

কৌশিক এবার মাথা নেড়ে মাধবরঞ্জনের বিষয়বুদ্ধির প্রশংসা করে বলল, 'এটা আপনি ঠিকই বলেছেন। তবে কপালের কথা তো কিছুই বলা যায় না। শিগগিবই হয়তো আর এক মেমসাহেব এখানে এসে হাজির হবে। সে হয়তো বিয়ের ব্যাপারে আপনার কাকার মত করিয়ে ছাড়বে।'

আবার হতাশার ছাপ ফুটে উঠল মাধবরঞ্জনের মুখে। 'সে হবার নয়। বললাম না, কাকা সে আমলে স্বদেশী করতেন। যাত্রাপালায় মুকুন্দদাসের গান গাইতেন। মেমসাহবকে কাকা মরে গেলেও বিয়ে করবেন না। দাওয়ায় বসিয়ে আদরযত্ন করে ডাব খাওয়াবেন। মুড়ি-নারকেল খাওয়াবেন। কিন্তু ঘরে তুলবেন না কিছুতেই।'

কৌশিক এখন গল্পেব মধ্যে ঢুকে গেছে পুরোমাত্রায়। 'আপনার কাকা কোথায় ?'

'ঘুমোচ্ছেন। ওঠার সময়ও হয়ে এসেছে।'

'আচ্ছা, আপনার কাকার বয়েস এখন ঠিক কত হল ?'

'এই কার্তিকে একাশিতে পা দেবেন।'

'একাশি! কী যেন বলছিলেন আপনি— আপনার কাকা আর একটা নাকি বিয়ে করতে যাচ্ছেন ?'

'হ্যাঁ। পাত্রী ঠিক হয়ে গেছে। সামনেব মাঘেই আবার বিয়ের পিঁড়িতে উঠবেন কাকা।'

'এই বয়েসে!'

কৌশিকের বিস্ময়ে এবার গলা ছেড়ে হেসে উঠলেন মাধবরঞ্জন। 'কাকা ঘুম থেকে উঠুক—তখন দেখবেন। দেখলে মনে হবে বয়েস আমার চেয়েও কম। শুধু একটা কানে একটু কম শুনছেন এখন—এই যা।'

'আচ্ছা, এই যে আপনার কাকা—।' কথাটা শেষ হওয়াব আগেই মাধবরঞ্জনের কাকা এসে হাজির হলেন ওখানে। মাধবরঞ্জন একটু ব্যস্তসমস্ত হয়ে আলাপ করিয়ে দিলেন। 'এই যে আমার কাকা বাধাগোবিন্দ গিরি, আর ইনি এসেছেন শহর থেকে আপনাকে দেখতে।'

কথাটার কোনও প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না রাধাগোবিন্দর মুখে। উনি শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি জলটল খেয়েছেন তো?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, খেয়েছি। আপনি বসুন।'

রাধাগোবিন্দকে দেখতে ভারী সুন্দর। লম্বা, টান-টান চেহারা। শরীরে এক কুচিও বোধহয় বাড়তি মেদ নেই। ভাইপো ঠিকই বলেছেন, চেহারা দেখলে কখনোই মনে হবে না আশি-পেরুনো মানুষ। আসল বয়সের চেয়ে কমপক্ষে বছর-পনেরো কম দেখায় রাধাগোবিন্দকে।

দাওয়ায় বসেই রাধাগোবিন্দ বললেন, 'আমি এক সময় পাশের গাঁয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছি। তখন ছাত্র-মাস্টার দুটোই খুব কম ছিল, কিন্তু ইস্কুলে পড়াশুনো হত। এখন আমাদের গাঁয়েও ইস্কুল হয়েছে। ছাত্র-মাস্টার দুটোই আগের তুলনায় ঢের বেড়েছে, কিন্তু পড়াশুনোর পাট চুকে গেছে একদম।'

বিষয়টা এমনই যে, এখানে একবার ঢুকলে চট করে বেরিয়ে আসা কঠিন। সুতরাং ওদিকে না গিয়ে গলা সামান্য ওপরে তুলে কৌশিক বলল, 'এ বাড়িতে পা দিয়েই তো একটা ভাল খবর শুনলাম। সামনের মাঘেই তো আপনার—।'

'বিয়ে। পঁচাশি নম্বর বিয়ে।' কৌশিককে থামিয়ে দিয়ে খুব শান্ত গলায় উত্তর দিলেন রাধাগোবিন্দ।

'আপনি কি এখানেই থামবেন? নাকি আরও বিয়ে করার ইচ্ছে আছে আপনার?'

'আছে। যদি মরে না যাই, একশোটায় গিয়ে থামব।' একজন চাষি স্বাভাবিক চাষবাসের কথা যে গলায় বলে থাকে, বিচিত্র এই পুরুষটির গলা এখন সেইরকম।

একটু চটিয়ে দেওয়ার জন্যে কৌশিক বলল, 'আপনি নিশ্চয়ই জানেন, আমাদের দেশে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ।'

'বাড়িতে আপত্তি তুললে নিষিদ্ধ, না হলে নয়। আমি তো বিয়ের জন্যে কাউকে জোর করি না। মেয়ের বাবা-মায়েরা নিজের থেকে আসে।'

'কেন?'

'কেন আবার—আমি উঁচু বংশের। বড় ঘরে মেয়ে দিতে অনেকেই চায়। তাছাড়া আমার সঙ্গে বিয়ে দিলে লাভ আছে।'

'কী লাভ?'

'আমি বিয়ের তিন থেকে ছয় মাসের মধ্যে প্রতি বউকে কিছু জমি লিখে দিই। নাহলে আমি চোখ বুজলেই জমিজমা নিয়ে বউদের মধ্যে চুলোচুলি শুরু হয়ে যাবে।'

'আপনি সত্যিই বিচক্ষণ মানুষ। কিন্তু কেউ যদি বলে আপনি জমির লোভ দেখিয়ে বিয়ে করছেন?'

'শহরে এখন কী হয়েছে জানি না, কিন্তু দেশ-গাঁয়ে এমন কথা কেউ ভুলেও বলবে না। এখানে পণপ্রথা একশো বছর আগেও যা ছিল, এখনও তাই। পণের বকেয়া টাকা মেটাতে না পারার জন্যে এসব জায়গায় বহু মেয়ের ওপর অত্যাচার চালানো হয়। অত্যাচারে মারা যায় অনেক মেয়ে। আত্মঘাতীও হয় বেশ কিছু। আমি বিয়ের জন্যে পণ নিই না। কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করি বলে কত বাপ-মা প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করে। বলতে পারেন আমি জনসেবা করছি।'

শেষ কথাটা রাধাগোবিন্দ মজা করে বললেন কি না বুঝবার চেষ্টা করল কৌশিক। না, মজাটজার মধ্যে একেবারেই যাননি উনি। 'কিন্তু বহুবিবাহ—।'

এবার ঠিক চটা নয়, একটু বুঝি বিরক্ত বোধ করলেন রাধাগোবিন্দ। 'বহুবিবাহ কোনও দোষ নয়, আমাদের দেশের ধারা। ধৃতরাষ্ট্র, দশরথের কতকগুলো বউ ছিল বলুন তো? তারপর আমাদের শ্রীকৃষ্ণ, রাক্ষসরাজ রাবণ—। এখন এসব নিয়ে অযথা চেল্লামেল্লি—। আসলে দু-দশটা মাগ সামলাতে হিম্মত থাকা দরকার। আপনার কী মত?'

এইরকম দাবড়ে-ওঠা কথার তোড়ে কৌশিক একটু ম্লান হয়ে গিয়েছিল। রাধাগোবিন্দ ওর সায় চাইতেই কৌশিক বলে উঠল, 'আজ্ঞে, আপনি ঠিকই বলেছেন।'

কিন্তু এত সহজে ও পার পেল না। রাধাগোবিন্দ চাঁছাছোলা গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার ক'টা বিয়ে?'

এবার অবিকল মিঁউ-মিঁউ-করা গলায় উত্তর দিল কৌশিক, 'আজ্ঞে, আমি এখনও শুরুই করিনি।'

'করুন। অকারণে আর দেরি করছেন কেন? আমার প্রথম বিয়ে আঠারো বছর বয়েসে। ভারী লক্ষ্মী ছিল বউটা। কিন্তু দু-বছর বাদে বাচ্চা হতে গিয়ে মারা গেল। তখনকার কথা আমার পরিষ্কার মনে আছে। মনে বড্ড দুঃখ পেয়েছিলাম। আমার এক মাসতুতো ভাই আমাকে না ঠেকালে আমি ঠিক ঘরসংসার ছেড়ে সন্নিসি হয়ে যেতাম! সংসারে আমার মতি ফেরাবার জন্যে বাড়ির লোকেরা আমার আর একটা বিয়ে ঠিক করেছিল। প্রথম স্ত্রী মারা যাওয়ার ঠিক পাঁচ মাস বাদেই আমার দ্বিতীয় বিয়ে।'

বিরাগী মানুষের সংসারে এত চটপট মতি ফিরে আসার কাহিনী শুনে চমৎকৃত হল কৌশিক। তারপর মনে মনে বলল, ক্রিকেটে লম্বা রান তুলতে হলে প্রথম থেকেই হাত খুলে খেলতে হয়। এখানে আবার বাউণ্ডারি, ওভার-বাউন্ডারি নেই, সব সিঙ্গল রান। একটা-একটা করে চুরাশিটা বিয়ে হয়ে গিয়েছে রাধাগোবিন্দর! সামনের মাঘে পঁচাশি নম্বর। এ লোক পাকা খেলোয়াড়, আচমকা কোনও অঘটন ঘটে না গেলে ঠিক সেঞ্চুরি করবে।

কাকা আসার পরে ভাইপো শ্রোতা হয়ে গিয়েছিলেন। অনেকক্ষণ পরে মুখ খুললেন মাধবরঞ্জন। 'কী খাবেন বলুন?'

দুদিকে মাথা নাড়িয়ে উত্তর দিল কৌশিক। 'ডাব তো খেলাম, অত বড় ডাব আমি আগে কখনও খাইনি। মিষ্টি জলে পেট ভরে গেছে। তাছাড়া আমি দুপুরের খাবারদাবার খেয়েই এখানে এসেছি। উঠব এবার। ফিরতে হবে অনেক দূরে। ছেলেবেলার জায়গাটা দেখতে পেয়ে খুব ভাল লাগল। আপনাদের সঙ্গে পরিচয় হল—এটাও একটা মস্ত লাভ। ছেলেবেলার কথাটা বেশি করে মনে পড়ছিল চণ্ডীমাতা স্টুডিওর একটা ছবি হাতে আসার পরে।'

'ছবি!'

'হ্যাঁ, এই তো, ছবিটা সঙ্গেও এনেছি।' অ্যাটাচি খুলে প্রসেনজিৎ রায়ের কাছ থেকে পাওয়া ফোটোগ্রাফটা বার করে মাধবরঞ্জনের হাতে তুলে দিল কৌশিক।

ছবি দেখে চমকে উঠে মাধবরঞ্জন বললেন, 'আরে! এ ছবি আপনি কোত্থেকে পেলেন?'

কৌশিক কিছু-একটা উত্তর দেওয়ার আগেই ভাইপোকে প্রশ্ন করলেন কাকা। 'কী ছবি মাধব ?'

'ওই যে মাসদুয়েক আগে এক ভদ্রলোক এসে চণ্ডীমাতা স্টুডিওর পুরনো সব ছবি কিনে নিয়ে গেলেন না—তারই একটা।'

'কই দেখি।'

পুরনো ছবি হাতে নিয়ে পুরনো দিনের মধ্যেই বোধহয় ডুব মেরেছিলেন রাধাগোবিন্দ। চোখেমুখে কেমন যেন মুগ্ধতার ছাপ। একটু বাদে নিজের মনে কথা বলার ভঙ্গিতে বলে উঠলেন, 'আহা! বড় ভাল ছিল সাবিত্রী। বেশি দিন ওর সঙ্গে ঘর করার সুযোগ পাইনি। মেয়েলি রোগে মারা গিয়েছিল।'

চোখে প্রশ্ন নিয়ে ভাইপোর দিকে তাকাতেই মাধবরঞ্জন বললেন, 'সাবিত্রী আমার এক কাকিমার নাম, কিন্তু এ ছবি আপনি পেলেন কোত্থেকে ?'

'কেন, পাওয়া কি অসম্ভব ?'

এই নিয়ে আরও কিছু বলানোর জন্যে পাল্টা প্রশ্ন করল কৌশিক। প্রশ্নের ধাক্কায়, মাধবরঞ্জন গড়গড় করে বলতে শুরু করে দিলেন, 'দু-মাস আগে এক ভদ্রলোক এসেছিলেন এখানে। ভদ্রলোকের শখ পুরনো দিনের ছবি কেনা। কাকা প্রথম বিক্রি করতে চাননি। বললেন, পুরনো স্মৃতি, থাক আমার কাছে। বেশির ভাগ ছবিই তো পোকায় কেটে দিয়েছে। আছে অল্প ক'খানা। ভদ্রলোক বললেন, এ ক'টাকেও পোকায় কাটবে শিগগির। আমাকে দিন, আমি গ্যালারিতে রেখে দেব। ওখানে ছবি কখনও নষ্ট হবে না। অল্প কয়েকটা ছবি। তা ওই ক'টা ছবি নিয়ে উনি অনেক টাকা দিয়েছেন কাকাকে। আপনিও কি পুরনো ছবি কেনার ব্যবসা করেন ?'

'না। এক শিল্পী পুরনো ছবি সারাইয়ের কাজ করে। আমার বিশেষ বন্ধুলোক। ছবিটা ওকে সারাতে দিয়েছে কোনও এক পার্টি। সেদিন ওর স্টুডিওতে গিয়ে ছবিটা আমার চোখে পড়ে। চেনা জায়গায় ছবি তো, আমি দুদিনের জন্যে ধার নিয়েছি। যে আপনাদের কাছ থেকে ছবি কিনেছে তাকেও হয়তো চিনতে পারি। কীরকম দেখতে বলুন তো ভদ্রলোককে ?'

'এই, শহরের বাবুদের যেমন দেখতে হয়।'

'বয়েস কত ?'

'পঞ্চাশ-ষাট। একটু কম-বেশিও হতে পারে।'

'চেনা যেতে পারে, চোখেমুখে এমন কোনও চিহ্নটিহ্ন আছে ?'

'চোখেমুখে কিছু নেই, থুতনিতে একটা বড় আঁচিল আছে।'

ছবি হাতে নিয়ে আরও কয়েক মুহূর্ত অতীতে ডুবে থাকার পরে রাধাগোবিন্দ একটু কেটে-কেটে বললেন, 'ছবিতে সাবিত্রী আছে, হরি আছে। একজন চোখের সামনে স্বর্গে গেল, আর একজন তো থেকেও নেই।'

রাধাগোবিন্দর হাত থেকে ছবিটা আলতো করে তুলে নিয়ে কৌশিক চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল, 'হরি কে ?'

মাধবরঞ্জন দু'দিকে মাথা নাড়িয়ে বললেন, 'হরি কাকার এক ছেলে। একেবারে রাজপুত্তুরের মতো দেখতে ছিল। কাকা ওকে খুব ভালবাসতেন। তবে ওর ছিল মা-অন্ত প্রাণ। মা মারা যাওয়ার পরে ঘর ছেড়ে কোথায় যে চলে গিয়েছে—আজ পর্যন্ত কেউ তার হদিস পায়নি। ছেলেটা খুব ডানপিটে ছিল, আমরা ওকে হাতপা বলে বলে ডাকতাম।'

'হাতপা? অদ্ভুত নাম তো!'

'ছেলেটাকে দেখতে খুব সুন্দর হলে কী হবে, পাদুটো ছিল বিরাট বড়-বড়। আমরা বলতাম হাতির পা, তার থেকে হয়ে গিয়েছিল হাত-পা। দেখুন না, ছবিটা দেখুন না। ওইটুকু ছেলে, কিন্তু—।'

কৌশিকের মেরুদণ্ডে ঠাণ্ডা জলের মতো কী যেন ছুটে গিয়েছিল বারদুয়েক। ছবিটা বেশ খুঁটিয়ে দেখল ও। পা'দুটো আড়ালে রাখার চেষ্টা করেছে হরি, কিন্তু পুরোটা পারেনি। যতটুকু চোখে পড়ে তাতেই বোঝা যায়, বয়েসের তুলনায় অস্বাভাবিক বড় পা ছেলেটার। বয়েস বছর আট-দশ। বছর-কুড়ি আগের তোলা ছবি। তার মানে ছবির এই হরির বয়েস এখন আঠাশ-ত্রিশ।

আচমকা উঠে পড়ে কৌশিক বলল, 'ঠিক আছে, আজ তাহলে চলি। আপনাদের সময় নষ্ট করলাম অনেকটা।'

একটু দূরের গাড়ির দিকে হনহন করে হাঁটতে শুরু করে দিয়েছিল গোয়েন্দা। পেছনে দাঁড়ানো কাকা-ভাইপোর কেউই দেখতে পেল না—প্রশান্ত চেহারার অতিথির মুখ এখন অস্বাভাবিক রকমের গম্ভীর, আর কপালে ভাঁজ পড়েছে অনেকগুলো।

॥ নয় ॥

উল্টোডাঙার এখন দু-রকম চেহারা। একদিকে বহুতল বাড়ি, শপিং কমপ্লেক্স, পার্ক; অন্যদিকে পুরনো কলকাতার বস্তি। টালি আর খোলার চালের বাড়িঘর, মধ্যিখানে আঁকাবাঁকা সরু রাস্তা। কয়লার তোলা উনুন থেকে সকাল-সন্ধেয় কালো ধোঁয়া ওঠে আকাশে। জল-কল নিয়ে হুজ্জতি, পাতি মাতালের আস্ফালন, যৎসামান্য তোলার বিনিময়ে মাস্তান দাদাদের সুরক্ষা চক্র তৈরি করা এ-বস্তির বারোমেসে চেহারা। তার বাইরে আছে গল্প, গুলতানি, প্রেম, প্রতিযোগিতা আর উৎসব। সব মিলিয়ে বস্তিটা বেশ জমজমাট।

এই বস্তিতেই থাকে মধুসূদন পুরকাইত। অতিমাত্রায় বিনয়ী, সজ্জন আর পরোপকারী। মাঝবয়সী এই লোকটি হাওড়ার একটা কারখানায় ওয়েল্ডারের কাজ করে। কারখানার

ইউনিয়নের একজন পাণ্ডাও। তার ফলে নানা ধরনের লোকজন ওর উল্টোডাঙার বস্তির ঘরে নিয়মিত আসে। ইউনিয়নের মাতব্বরের ঘরে গাদা-গাদা অচেনা লোক তো আসবেই। এ তো স্বাভাবিক ঘটনা। স্বাভাবিক ঘটনা নিয়ে বস্তির কারও কোনও মাথাব্যথা নেই। কিন্তু বস্তির বাইরে কেউ-কেউ এই মধুসূদনের অন্য পরিচয়ও জানে। মানুষটি পুলিশের ইনফর্মার।

নানা জায়গা থেকে পাকা খবর নিয়ে আসে। ওই খবরের ওপর নির্ভর করে পুলিশ বেশ কিছু চুরি-ডাকাতি, খুনখারাবির কিনারা করেছে। অপরাধী পাকড়াও করেছে অকাট্য প্রমাণসমেত। পুলিশের বাইরে মাঝেমধ্যে একজন প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর মধুসূদনের কাছে এসে হাজির হয়। ওই গোয়েন্দাটির নাম কৌশিক মিত্র। আজ সাতসকালে কৌশিককে উল্টোডাঙা বস্তিতে মধুসূদনের বাড়ির কাছে দেখা গেল হঠাৎ।

শীতের সকাল। একটু আগে পর্যন্ত চারদিক গাঢ় কুয়াশায় ঢাকা ছিল। এখন কুয়াশা পাতলা হতে শুরু করেছে। কড়া নাড়ার একটু পরে দরজা খুলল মধুসূদন, তারপরেই খুশি-খুশি গলায় বলল, 'আরে আপনি! আসুন আসুন। এবার অনেকদিন পরে দেখা পেলাম আপনার।'

'দেরি হোক আর তাড়াতাড়ি হোক, মধুসূদনদাদার শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া আমাদের গতি নেই!' খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে উত্তর দিল কৌশিক।

অতিমাত্রায় বিনয়ী মধুসূদন একটু বেঁকে গিয়ে হাতজোড় করে লাজুক গলায় বলল, 'কী যে বলেন আপনি! আমি সামান্য ব্যক্তি।'

মধুসূদনের ঘর বলতে একটিই। এই ঘরের মধ্যেই ছোট একটা খাট, আলমারি আর একটা চেয়ার। বউ দেশের বাড়িতে থাকে। মাসদুয়েক অন্তর দেশে যায় মধুসূদন। মাঝেমধ্যে বউকেও নিয়ে আসে এখানে। এখন অবশ্য বউ এখানে নেই।

আগের মতো একটু ঝুঁকেই দাঁড়িয়ে ছিল মধুসূদন। ওই ভাবেই বলল, 'শীতের সকাল। একটু চা নিয়ে আসি।'

'আনুন। তবে শুধু চা। সঙ্গে আর কিছু আনবেন না।'

চায়ের একটা দোকান বোধহয় ধারেকাছেই কোথাও আছে। মধুসূদন গেল আর এল! দুহাতে দুকাপ চা। প্লেটের ধারে দুটো করে থিন অ্যারারুট বিস্কুট। শীতের সকালে ধোঁয়া-ওঠা চায়ের স্বাদই আলাদা।

বেশ মন দিয়ে চা-বিস্কুট খাওয়ার পরে গোয়েন্দা পকেট থেকে একটুকরো কাগজ বার করে মধুসূদনের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'দেখুন তো এই জায়গাটা চেনেন কি না?'

ঠিকানা দেখে একদিকে মাথা কাত করল মধুসূদন। 'চিনি। পোস্টাফিসের সামনের রাস্তা। রাস্তাটা যেখানে বাঁক নিয়েছে সেখানে একটা র‍্যাশনের দোকান আছে না?'

'বাহ্! এলাকটা দেখছি আপনার খুব ভালভাবেই চেনা। কাগজে যে ঠিকানাটা লিখে দিয়েছি—ফোর বাই টু, সেটা হচ্ছে ওই র‍্যাশনের দোকানের উলটোদিকের গলির দু-নম্বর বাড়ি। লাল রঙের বাড়ির ধারে মাধবীলতার একটা ঝাড় আছে। গলিটার কথা মনে পড়ছে?'

'না, ও গলিতে কখনও ঢুকিনি। আপনি যার খবর চান, সে কি ওই বাড়িতেই থাকে?'

'না-না, আমি বিশেষ কারও খবর জানতে চাই না। ব্যাপার হল, ওই বাড়ির একটা মেয়ের নাম সম্ভবত ঝিমলি, কয়েকদিন হল বিয়ে হয়েছে। বর-বউ পরশুদিন রাতের ট্রেনে বাঙ্গালোরে গেছে, বোধহয় হনিমুন করতে। আমি এদের সম্পর্কে একটু খোঁজখবর চাই। যেমন ছেলেটা কোথায় থাকে, কী করে, কী নাম—এইসব। বিয়ে নিজেরা ঠিক করেছে, না বাবা-মা? কবে ফিরবে বাঙ্গালোর থেকে। আমি যা জানতে চাইছি, তার বাইরেও কিছু জানতে পারলে জানাবেন। ওখানে কোনও সোর্স আছে আপনার?'

'আছে। ওই পাড়ায় বন্ধকি কারবার করে এমন একটা লোককে আমি চিনি। যারা বন্ধকি কারবার করে, চড়া সুদে টাকা ধার দেয়—তারা বেশ কিছু বাড়ির অন্দরমহলের নানা খবর রাখে। খবরগুলো কবে চান?'

'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।'

'ঠিক আছে, পেলেই আপনাকে ফোন করব। আপনার অফিস, বাড়ির টেলিফোন নম্বর এর মধ্যে পালটায়নি তো?'

'না। ঠিক আছে। এই কাজটা সারার পরে আর একটা ধরতে হবে।' বলার পরে গোয়েন্দা ঠিকানা-লেখা আর একটা কাগজ মধুসূদনের হাতে ধরাল। ঠিকানায় দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিল মধুসূদন।

'এটা কি আপনার চেনা এলাকার মধ্যে পড়ছে?'

দুদিকে মাথা নাড়াল মধুসূদন। 'না, চেনা নয়, তবে চিনে নেব। কী কাজ করতে হবে বলুন?'

খুক-খুক করে কেশে গলা পরিষ্কার করে গোয়েন্দা বলল, 'ঠিকানার মাথায় যে মানুষটির নাম লেখা আছে—ওই প্রসেনজিৎ রায় সম্পর্কে খোঁজখবর চাই। লোকটা কেমন, আজেবাজে ব্যাপারের সঙ্গে সম্পর্ক আছে কি না—এই খবরটা জানতে হবে সবার আগে। তারপর জানতে হবে ওদের পারিবারিক ব্যবসার কথা। ওর দাদা অরিজিৎ রায়ের কাপড়ের ব্যবসা। বড়বাজারে হোলসেলের একটা দোকান আছে। আর একটা দোকান ধর্মতলা এলাকায়। আপনি বোধহয় জানেন—বুলা নামের একটা মেয়ে বিয়ের রাতেই খুন হয়েছে।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, জানি।'

'ওই বুলা হল অরিজিৎবাবুর একমাত্র মেয়ে। বুলার মনে হয় ভাল রকমের একটা শেয়ার ছিল ব্যবসায়। ও মারা যাওয়ায় ওর শেয়ারটা কে পেল? কোনও একজন? নাকি কয়েকজন? ব্যবসার ব্যাপার তো? নিশ্চয়ই ওদের নির্দিষ্ট কোনও উকিল আছে। আপনি যদি কোনও লোক ধরে কিংবা কিছু খরচাপত্তর করে কোর্ট থেকে পাকা খবরটা বার করে আনতে পারেন—খুব ভাল হয়। আমি কী-কী খবর জানতে চাইছি বুঝতে পারছেন তো?'

বিনীত চেহারার মধুসূদন পুরকাইত মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়ে বলল, 'আপনাদের সঙ্গে তো বেশ কিছুদিন কাজ হয়েছে আমার—আপনি কী-কী জানতে চান। কেন জানতে চান—মনে হয় বুঝতে ভুল করিনি আমি।'

হাসি ফুটল গোয়েন্দার মুখেও। 'সেই জন্যেই তো আপনার কাছে আসা।' ঘর থেকে

বেরুবার আগে মধুসূদনের হাতে একটা খাম ধরিয়ে দিয়ে গোয়েন্দা বলল, ‘এতে পাঁচশো আছে।’

‘আরে! এখনই টাকা দিচ্ছেন কেন?’

‘না-না রাখুন, ওই কাজদুটো হাসিল করতে গেলে কিছু খরচ হবে আপনার। ঠিক আছে, চলি তাহলে এখন।’

কুয়াশা আগের চাইতেও পাতলা হলেও আছে। লম্বা পায়ে হেঁটে দূরের কুয়াশার মধ্যে মিলিয়ে গেল গোয়েন্দা।

কুয়াশা ফিকে হতে হতে উধাও হয়ে গেল একটু বাদেই। আড়ালের হলুদ রোদ এখন ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। কুয়াশা সরতেই হাওয়া বইতে শুরু করেছে। কনকনে হাওয়া। রোদ্দুরে এখনও সূর্যের তাপ ধরেনি।

আর একটু এগোবার পরেই মোটামুটি ফাঁকা একটা মিনিবাস পেয়ে গিয়েছিল গোয়েন্দা। এবার সোজা চেম্বারে। ঘড়ি দেখল ও, আজ একটু তাড়াতাড়িই পৌঁছে যাবে কর্মস্থলে। যাক, ভালই হল, বাড়তি সময়টুকুতে দু-তিনটে চিঠি লিখে ফেলতে হবে। আজ চারদিন ধরে ব্যাগের মধ্যে ইনল্যাণ্ড ঘুরছে, কিন্তু চিঠি লেখার সময় আর বার করা যাচ্ছে না। চিঠি লেখার পরের কাজের কথা ভাবার আগেই রহস্যভেদের জটিল অঙ্ক হঠাৎই মাথার ভেতরে শুরু হয়ে গিয়েছিল গোয়েন্দার।

অঙ্ক শুধু জটিলই নয়, অন্তহীনও। ওই অঙ্ক কষার মধ্যে একটি ঘণ্টা বেশ চটপট ফুরিয়ে গিয়েছিল। অঙ্কের রেশ মাথায় নিয়েই বাস থেকে নামল গোয়েন্দা, তারপর একটু অন্যমনস্ক ভঙ্গিতেই তালা খুলে অফিসে ঢুকল।

অফিসঘর ঝাড়পোঁছের কাজটা মুখার্জিবাবুই করেন। কৌশিক ওসবের মধ্যে গেল না, কিন্তু চেয়ারে বসার পরেই মনে হল—কাল রাত্তিরে মুখার্জিবাবুর একটা ফোন করা উচিত ছিল ওকে।

ব্যাগ থেকে ইনল্যাণ্ড বার করল কৌশিক, কিন্তু কলম খোলার আগেই ওর অফিসের সামনে ঘ্যাঁচ করে একটা জিপ এসে থামল। প্রকাণ্ড শরীর নিয়ে ইন্সপেকটর ঘোষরায় জিপ থেকে লাফিয়ে নামলেন, তারপর দ্রুত পায়ে কৌশিকের কাছে এসে বললেন, ‘যাক, তোমাকে পেয়ে গিয়েছি—খুব ভাল হল। আমার সঙ্গে একটু চলো তো—এক্ষুনি।’

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল কৌশিক, ‘কোথায়?’

‘একটা তদন্তে।’

‘তা, আমি গিয়ে কী করব?’

নিজের কপালে ছোট্ট একটা চড় কষিয়ে বিচলিত ইন্সপেকটর বললেন, ‘আরে বাবা, তোমার যদি ওখানে কিছুই করার না থাকে, শুধু-শুধু ডাকব কেন তোমাকে! সত্যি, আমার মাথা আর কাজ করছে না, পরের পর এসব কী হচ্ছে বলো তো? একেই বলে গ্রহের ফের।’

‘কিন্তু ব্যাপারটা কী বলবেন তো—!’

‘সব বলছি, তোমার অফিসের ঝাঁপ ফেলে জিপে এসে বসো। যেতে যেতে সব বলব। ঝাঁপ ফেলার ব্যাপারে আমি হাত লাগাব কি?’

'না-না, তার আর দরকার হবে না।' কৌশিক চটপট অফিসের দরজায় তালা ঝুলিয়ে জিপে এসে বসতেই জিপ মুখ ঘুরিয়ে ছুট লাগাল পেছন দিকে।

এই শীতের সকালেও কয়েক বিন্দু ঘাম ফুটে উঠেছিল ইন্সপেকটরের কপালে। উনি পকেট থেকে মস্ত একটা রুমাল বার করে মুখ-চোখ-কপাল ভাল করে মুছে নিয়ে বললেন, 'আমার এলাকায় আবার একটা বুলা মার্ডার কেসের মতো ঘটনা ঘটে গেছে!'

'আবার মার্ডার!'

'না-না, এ মেয়েটা খুন হয়নি। তবে আর যা-যা ঘটেছে, সব ওই বুলারই মতো। অপারেশনের ধরন শুনে মনে হচ্ছে, একই দলের কাজ। ওই খুনির হয়তো এখনোও বর সেজে এসেছিল। কী ডেসপারেট র‍্যাকেট বলো তো! এরা তো মালপত্তর হাতিয়ে সরে পড়েছে। এর পরে তোপের মুখে পড়ব আমি। তোপ দাগবে বড় সাহেব থেকে ছোট সাহেব পর্যন্ত সবাই। এই এলাকায় যত অপরাধ হচ্ছে---সে সব সামাল দেওয়া কি একা আমার কাজ? তুমি বলো---।'

কৌশিকের কপালে বেশ কয়েকটা ভাঁজ পড়েছে। ও গম্ভীর গলায় বলল, 'এই কেসটা আমাকে একটু খুলে বলুন তো?'

লম্বা একটা নিঃশ্বাস বাতাসে ভাসিয়ে দিয়ে ইন্সপেকটর বললেন, 'সাতসকালেই ফোন। কী ব্যাপার? না, বাসরঘরে রাত কাটিয়ে ভোরবেলায় নতুন বর নতুন বউয়ের গয়নাগাটি হাতিয়ে নিয়ে হাওয়া। শুনেই ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। আবার মার্ডার নাকি। জিজ্ঞেস করলাম---কনে ঠিক আছে তো, মানে কোনও আঘাত-টাঘাত? বাড়ির লোকই ফোন করেছিল---মেয়ের মামা। বলল---না মেয়ে তখন ঘুমোচ্ছিল। কাজের লোক ভোরবেলায় বরকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে দেখেছে। ও ভেবেছিল, বরের বোধহয় ভোরে বেড়াবার শখ আছে। সকালের দিকে আমার দিদিরই প্রথম নজরে পড়ল---মেয়ের গায়ে একটাও গয়না নেই। বরের কথামতো গয়না খুলে ড্রেসিংটেবিলের মধ্যে রেখেছিল আমার ভাগ্নি—সেগুলোর একটাও নেই। বর বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরে ঘণ্টা তিন-চারেক কেটে গেছে, ব্যাপারটা আমাদের ভাল ঠেকছে না, তাই আপনাদের জানালাম। এই হল মোদ্দা কথা। পার্টিকুলারস নিয়ে নিয়েছি। এখন ছুটছি ইনভেস্টিগেশনে। একটু বাদেই আমার বড় সাহেবরা জাঁতাকলে পিষবে আমাকে। বিচ্ছিরি ধরনের ক্রাইমগুলো একের পর এক আমার এলাকাতেই ঘটে চলেছে। একে আমার গ্রহের ফের ছাড়া আর কী বলবে তুমি?'

প্রশ্নের কোনও উত্তর দিল না কৌশিক।

'কী, কথা বলছ না কেন?'

'ওই বাড়িটা আর কত দূরে?'

'এই তো এসে গেলাম বলে, সামনের মোড়টা ঘুরলেই----।'

মোড় ঘুরতেই বিয়েবাড়ি পাওয়া গেল। উৎসবের সাজে সাজানো। বাড়ির গায়ে ঝোলানো টুনি বাল্বের মালা দেখলে বোঝা যায়, কাল রাতে কী ঝলমলে ছিল বাড়িটা।

বাড়ির সামনে পুলিশের জিপ থামতেই শুকনো মুখ কয়েকজন প্রবীণ মানুষ এগিয়ে এসে ইন্সপেকটরকে বললেন, 'আসুন, ভেতরে আসুন।'

গম্ভীর মুখে জিপ থেকে নামলেন ইন্সপেকটর অবনী ঘোষরায়। ওঁর পেছনে কৌশিক। বিয়েবাড়ির মানুষরা ওদের নিয়ে গিয়ে বসার ঘরে বসালেন।

বসার পরেই মাথার টুপি খুলে কোলের ওপর রেখে ইন্সপেকটর ঘোষরায় জিজ্ঞেস করলেন, 'প্রণবেশ ব্যানার্জি কে ?'

শুকনো মুখের মাঝবয়সী এক ভদ্রলোক মৃদু গলায় জবাব দিলেন, 'আমি।'

'আপনিই মেয়ের বাবা ?'

এবার আর মুখে উত্তর না দিয়ে একপাশে মাথা সামান্য কাত করলেন ভদ্রলোক।

কোলের টুপির ওপর টোকা দিতে দিতে ইন্সপেকটর বললেন, 'আচ্ছা, প্রণবেশবাবু, আমার কাছে টেলিফোন যাওয়ার পরে আর কোনও ডেভলপমেন্ট—মানে, আর কিছু ঘটেছে কি ইতিমধ্যে ?'

দুদিকে মাথা নাড়ালেন ভদ্রলোক। তারপর ভাঙা-ভাঙা গলায় বললেন, 'বরের বাড়ি বলে যেটা আমরা অ্যাদ্দিন জেনে এসেছিলাম, সেটা আসলে একটা গেস্টহাউস। একটু আগেই ফোন করে জানতে পেরেছি। ওই জোচ্চোরগুলো মাসখানেক ওই গেস্টহাউসটা ভাড়া নিয়েছিল। কেয়ারটেকার জানাল, কাল রাতেই ওরা বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছে।'

একটু যেন উত্তেজিত গলায় প্রশ্ন করলেন ইন্সপেকটর, 'গেস্টহাউসটা কি গল্ফ গ্রিনে ?'

'না, সল্টলেকে।'

'সল্টলেক ! আচ্ছা, এটা তো দেখেশুনে বিয়ে—মানে, আপনারাই সব ঠিক করেছেন। তাই তো ?'

হতাশায়, দুঃখে মুখ কালো হয়ে গিয়েছিল মেয়ের বাবার। হ্যাঁ, সব দোষ আমাদের। কিছু-কিছু জানাশোনা জায়গা থেকে মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ আসছিল। ভালই সে-সব, কিন্তু আমরা ভাবলাম—মেয়ের আরও ভাল বিয়ে দেব। সেই ভেবেই বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম কাগজে। বেশ কিছু সম্বন্ধ এসেছিল। তা আমাদের এমনই কপাল যে শেষ পর্যন্ত এই জোচ্চোরটাকেই পাত্র হিসেবে পছন্দ করলাম। বলেছিল, সফ্‌টওয়্যারের ব্যবসা করে। ইনফর্মেশন টেকনোলজি নিয়ে কত যে কথা শুনিয়েছিল—কী বলব। বলেছিল, ওদের যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার গড়ে উঠেছে তা দিয়ে কিছুদিনের মধ্যেই মিলিয়ন ডলারের ব্যবসা করা যাবে। একটা ছোট অফিসও দেখিয়েছে আমাদের ক্যামাক স্ট্রিটে। ব্যবসাপত্তর হয় ইন্টারনেটে। টেকনিক্যাল ব্যাপারস্যাপার আমরা বুঝি না। আমাদের তাই চট করে বোকা বানানো সহজ হয়েছে।'

'আচ্ছা, ওই ক্যামাক স্ট্রিটের অফিসের ঠিকানাটা নেই আপনাদের কাছে ?'

'আছে, কিন্তু এখন বুঝতে পারছি—ওই অফিসটার সঙ্গে ওদের কোনও সম্পর্ক নেই। নিজের বলে অন্য কারও অফিস দেখিয়ে দিয়েছে আমাদের।'

'আমারও তাই মনে হচ্ছে। তবু ওই ঠিকানাটা দিন। সল্টলেকের ওই গেস্টহাউসের ঠিকানাটাও দেবেন।'

প্রণবেশবাবু একজনকে ইঙ্গিত করতেই সে ঠিকানা আনতে চলে গেল বাড়ির ভেতরে।

কোলের ওপর নামিয়ে রাখা টুপির ওপর দ্রুত চালে কয়েকটা টোকা মারার পরে ইন্সপেকটর ঘোষরায় ভারী গলায় প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছা, পাত্রের হয়ে বিয়ের কথা কে চালিয়েছিল? ছেলের দাদা-বৌদি কি?'

'না, ওর কাকা-কাকিমা।'

উত্তরটা শুনে কৌশিকের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে ইন্সপেকটর বললেন, 'জোচ্চোররা এক-এক জায়গায় এক-এক রকমের পার্ট প্লে করে। কোথাও দাদা-বৌদি, কোথাও বা কাকা-কাকিমা। ছেলের নাম কী? মানে, আপনাদের আছে কী নাম বলেছে?'

'অরুণোদয় চ্যাটার্জি।'

'নামের বাহার আছে দেখছি। আর ওই কাকা-কাকিমার নাম?'

'নির্মলেন্দু চ্যাটার্জি। ওর মিসেসের নাম কমলিকা।'

'মহিলা বোধহয় কথাবার্তায় খুব চৌকস?'

'না, বরং একটু বেশিমাত্রায় চুপচাপ। বড়-বড় বোলচাল সব ওই নির্মলেন্দুর।'

কৌশিকের সঙ্গে আর একবার চোখাচোখি করে নিয়ে ইন্সপেকটর বললেন, 'কথা কোথাও বেশি বলে কর্তা, কোথাও বা গিন্নি। এরা অত্যন্ত ধুরন্ধর প্রকৃতির। আচ্ছা, বাসরঘরটা একবার দেখা যাবে?'

তিনটে ঘরের পরে দক্ষিণ-খোলা ঘরটাই বাসরঘর হয়েছিল কাল রাতে। আত্মীয়বন্ধুতে ঠাসা ছিল উৎসব-বাড়ি, কিন্তু এখন সবার মুখেই কে বা কারা যেন কালি ঢেলে দিয়েছে। কারও মুখে কোনও কথা নেই।

বিয়েবাড়ির বোবা মানুষরা দুদিকে সরে গিয়ে পথ করে দিয়েছিল পুলিশ ইন্সপেকটরের।

বাসরঘর যে ঘরে হয়েছিল সেখানে এখন কেউই নেই। ঘরের অর্ধেক জুড়ে আছে মস্ত বড় একটা খাট। নতুন খাটে নতুন বিছানা, তার ওপর ছড়িয়ে আছে বেশ কিছু ফুল। দরজার মাথায়, খাটের ছতরিতেও গোলাপ। ও রজনীগন্ধার মালা আর তোড়া। বাতাসে ফুলের গন্ধ।

এ ঘরের চারদিকে তাকাতে তাকাতে গত সন্ধে-রতের দৃশ্যগুলো অনুমান করতে একটুও অসুবিধে হচ্ছিল না কৌশিকের। আর পাঁচটা বাসরঘরের সঙ্গে কাল রাতের এই বাসরঘরের নিশ্চয়ই কোনও তফাত ছিল না। হাসি-ঠাট্টা-গানে জমজমাট ছিল এই ঘরটা। আর আজ, আজ সকাল থেকেই সবকিছু একেবারে অন্যরকমের হয়ে গেছে।

পকেট থেকে লম্বাটেগোছের ডায়েরিটা বার করে ইন্সপেকটর কী সব যেন নোট করে নিলেন। পাত্রের অফিসের ঠিকানা আর কাকা-কাকিমার বাড়ি বলে চালানো সল্ট লেকের ঠিকানা-লেখা কাগজটা কে একজন বাড়িয়ে দিয়েছিল ইন্সপেকটরের দিকে। উনি ঠিকানায় একবার চোখ বুলিয়ে কাগজটা ভাঁজ করে ডায়েরিতে ঢোকালেন, তারপর ডায়েরি রেখে দিলেন পকেটে।

পাত্রের সম্পত্তি বলতে নতুন একটা স্যুটকেস। তার মধ্যে ধুতি, পাঞ্জাবি, তোয়ালে, রুমাল আর শেভিং-সেট—সবই নতুন। জিনিসগুলো বেশ খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখলেন

ইন্সপেকটর। জামাকাপড়ের নীচে দু-ভাঁজ করা খবরের কাগজের একটা পাতা ছিল, সেটাও উলটেপালটে দেখে নিলেন। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে জিগ্গেস করলেন, 'মেয়ে কোথায়? মেয়ের সঙ্গে একটু কথা বলা যাবে কি?'

প্রশ্ন শুনে মেয়ের বাবার মুখে বিব্রত হওয়ার ছাপ ফুটে উঠেছিল। একটু থেমে থেমে উনি বললেন 'হ্যাঁ, দরকার হলে—। আমরা তো প্রতিকার চাই, তদন্তের জন্যে—। আসলে ও খুব আপসেট হয়ে গিয়েছিল। এই দেখ তো, ও-ঘরে রুমা কী করছে?'

রুমা কনের নাম। একটু বাদে একজন এসে বলল, 'মাসি আপনাদের ও ঘরে যেতে বলছে।'

ওদিকের একটা ঘরে জড়সড় হয়ে বসে আছে সবুজ বেনারসি-পরা একটা ফুটফুটে মেয়ে। সিঁথি, কপাল লেপটে আছে সিঁদুরে। ইন্সপেকটর ঘরে ঢুকেই থমকে গেলেন। তারপর পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখ-চোখ-কপাল ভাল করে মুছে নিয়ে বললেন, 'মা, তুমি আমার মেয়ের মতো। অপরাধীকে ধরতে গেলে তোমার একটু সাহায্য দরকার। আমার কাছে একদম সঙ্কোচ কোরো না। ও যখন তোমার গা থেকে গয়না খুলছিল, তুমি কি একেবারেই টের পাওনি?'

প্রশ্নের উত্তরে পাশে-বসা মাসির কাঁধে মুখ লুকলো রুমা।

মাসির বয়েস বছর-চল্লিশ। পাতলা ঠোঁট, ধাবালো নাকের বেশ তেজি চেহারার মহিলা। উনি বললেন, 'কী হয়েছে, রুমা আমাকে সব বলেছে। আমি বলছি। রুমাকে ওই বদমাইশটা বলেছিল, এত গয়নাগাটি পরে ঘুমনো যায় না। তুমি ওগুলো খুলে ড্রেসিংটেবিলের ড্রয়ারে রেখে দাও, কাল সকালে পরে নিও আবার। রুমা আমাদের খুব ভালমানুষ, ও এক-এক করে সব গয়নাই খুলে ফেলেছিল। তারপর সকালে উঠে দেখে লোকটাও নেই, গয়নাও নেই।'

ইন্সপেকটর ঘোষরায় সমব্যথীর গলায় বললেন, 'এখানে বোধহয় এই ধরনের নতুন একটা ক্রাইম শুরু হয়েছে। বাঁচোয়া, শুধু গয়নার ওপর দিয়ে গিয়েছে।'

ধারালো চেহারার মাসি এবার তিরস্কার করার গলায় বলে উঠলেন, 'কে বলল শুধু গয়নার ওপর দিয়ে গিয়েছে? যা সর্বনাশ হওয়ার তাও হয়ে গিয়েছে আমাদের মেয়ের।'

মাসির কথায় এবার কেমন যেন থরথর করে কেঁপে উঠেছিল সবুজ বেনারসি-পরা মেয়েটি।

।। দশ ।।

ইন্সপেক্টর পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখচোখ আর একবার মুছে নিয়ে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে এখন থাক, মেয়েব সঙ্গে পরে একসময় কথা বলে নেব আমি।'

ঘর থেকে বেরিয়ে লম্বা পা ফেলে বসার ঘরে এসে বসলেন ইন্সপেক্টর। কৌশিকও ওর পাশে এসে বসেছে। ইন্সপেক্টর টুপি খুলে কোলের ওপর রেখে মাথা চুলকোলেন একবার, তারপর মেয়ের বাবার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আরে, আপনি দাঁড়িয়ে কেন? বসুন।'

প্রণবেশবাবু বসলেন। ওঁকে বসতে দেখে এক-এক করে এ-বাড়ির আরও কয়েকজন বসে পড়লেন।

বাড়িতে দুর্যোগ দেখা দিলেও কিছু কিছু মানুষ অতিথিসেবার কথা ভোলেন না। এ-বাড়ির ওইরকম দু-একজন মানুষেব উদ্যোগে ইন্সপেক্টর আর গোয়েন্দার জন্য চা আর মিষ্টি এসে গিয়েছিল।

ইন্সপেক্টর আঙুল তুলে আদেশের গলায় বললেন, 'মিষ্টি নিয়ে যান, চা খাব শুধু।'

উর্দিপরা বিশালা চেহারার ইন্সপেক্টরের আদেশ অগ্রাহ্য করার সাধ্য ছিল না পরিবেশনকারীর। মিষ্টির প্লেটদুটো দ্রুত উধাও হয়ে গেল সেন্টার-টেবিলের ওপর থেকে।

গম্ভীর মুখে চায়ের কাপে পর-পর দু-তিনটে চুমুক মারার পরে ইন্সপেক্টর পকেট থেকে লম্বাটে চেহারার ডায়েরিটা বার করলেন, তারপর মেয়ের বাবার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'প্রণবেশবাবু, আপনার মেয়ের গায়ের যে গয়নাগুলো চুরি গেছে, সেগুলোর এস্টিমেটেড কস্ট কত হবে?'

প্রণবেশবাবু একটু চিন্তা করে বললেন, 'সবই কেনা গয়না। ক্যাশমেমো আছে, সঠিক দাম আমি পরে আপনাকে জানিয়ে দিতে পারব।'

'খুব ভাল। পরে আমাকে হিসেবটা দেবেন। এখন শুধু আন্দাজে বলুন—টাকার অঙ্কে কত গয়না চোট গেছে আপনার মেয়ের?'

প্রণবেশবাবু কপালে ভাঁজ ফেলে ঘরের সিলিংয়ের দিকে তাকালেন, তারপর কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে বললেন, 'তা প্রায় সাড়ে চার লাখ টাকার গয়না হবে।'

ইন্সপেক্টর ঘোষরায় চোখ কপালে তুলে বললেন, 'এইসব ক্রিমিনাল খুব ভাল ভাবে খোঁজখবর নিয়ে এগোয়। কিছু মনে করবেন না প্রণবেশবাবু, আপনি যদি সাধারণ ইনকাম গ্রুপের কেউ হতেন, আপনার দিকে এই বদমাইশগুলোর নজর পড়ত না। একটু পয়সাওয়ালা লোকরাই এদের টার্গেট। আচ্ছা, নগদটগদ—মানে পণবাবদ আপনার কাছ থেকে এরা কিছু হাতিয়েছে কি?'

দুহাতে কপাল চেপে বসেছিলেন মেয়ের বাবা। কয়েক মুহূর্ত বাদে বললেন, "কী করে বুঝব বলুন, এটা ওদের চাল। যা আমাকে শোনানো হয়েছিল, তাতে বুঝেছিলাম—ছেলে পাত্র হিসেবে দারুণ। এমন পাত্র পেলে যে-কোনও বাবা-মাই ভাববে—কপাল করে জন্মেছে মেয়ে। কিন্তু আমাদের দেশে পণপ্রথা এখন তো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে চলে। পাত্রের শিক্ষিত বাবা-মা হয়তো বড় মুখ করে বলবে, ওরা একটা পয়সাও পণ নেবে না, তবে—। এই 'তবে'র ফিরিস্তিটা বিশাল। কালার টিভি, ফ্রিজ থেকে শুরু

করে লেটেস্ট মডেলের কার পর্যন্ত—কী নয়? কিন্তু আমাদের এই পাত্রের কাকা-কাকিমা ওসবের ধারকাছ দিয়ে যায়নি। আমরা ধরে নিয়েছিলাম—ওরা সত্যিই খুব উঁচু মনের মানুষ। ওরা চাল চালল বিয়ের ঠিক সাতদিন আগে।"

'কী রকম?'

'একদিন এসে কথায় কথায় বলল, আপনাদের হবু জামাই তো হিরের টুকরো ছেলে; কিন্তু ওর একটা মারাত্মক দোষ আছে—অসম্ভব মুখচোরা। তা, আমি জিজ্ঞেস করলাম—কী রকম? ছেলের কাকা বলল, ও ইদানীং পছন্দসই একটা ফ্ল্যাট কেনার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছিল। পেয়েও গেছে। উড স্ট্রিটে। বিশ লাখ টাকা দাম। ফ্ল্যাটটা আমাকে দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল অরুণ। খুব সুন্দর ফ্ল্যাট। আমি বলব, দামের তুলনায় বেশ শস্তা। ফ্ল্যাটের ওনার পাঞ্জাবি, এখানকার পাট চুকিয়ে অমৃতসরে ফিরে যেতে চাইছে এবার। আমার মনে হয়, এটা ডিসট্রেস সেল। একটু ধরে রাখলে মালিক ওই ফ্ল্যাটটা অনায়াসে পঁচিশ-ত্রিশ লাখ টাকায় বিক্রি করতে পারত। কিন্তু ওর পক্ষে বোধহয় অপেক্ষা করা সম্ভব নয়। কোনও ব্যাপারে মনে হয়, টাকার খুব টান পড়েছে। এই পর্যন্ত গপ্পো শোনাবার পরে ছেলের কাকা বলল, আমি কিন্তু ফ্ল্যাটটা কিনতে ওকে প্রথমেই বারণ করে দিয়েছিলাম। বুঝতেই পারছেন, আমি মেয়ের বাবা; আমি তো চাইবই মেয়ে বিয়ের পরে সুন্দর একটা ফ্ল্যাটে গিয়ে সংসার পাতুক। তা আমি ওর কাকাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি অরুণকে ফ্ল্যাটটা কিনতে বারণ করছেন কেন?'

'স্বাভাবিক প্রশ্ন, আপনার জায়গায় অন্য কেউ থাকলেও এই প্রশ্নই করত। তা, আপনার কথার উত্তরে ওই জোচ্চোরটা কী বলল?'

'বলল, ফ্ল্যাটের কাগজপত্তর ঠিক আছে কি না কে জানে! এত তাড়াহুড়ো করতে দেখে ওর সন্দেহ হচ্ছে। ছেলে টাকা তুলে দিল হাতে, পরে হয়তো দেখা গেল—ফ্ল্যাটের মালিকানা নিয়েই গোলমাল আছে। ছেলের কাকার ওইসব কথা শুনে আমার তো ওকে বেশ বিবেচক বলে মনে হয়েছিল। বললাম, আপনি তো ঠিক পরামর্শই দিয়েছেন। তখন লোকটা মোক্ষম ওই চালটা চালল।'

'কী চাল?'

'হাসতে হাসতে বলল, আজকের ছেলেরা বাবা-কাকাদের চাইতে ঢের বেশি ম্যাটার-অব-ফ্যাক্ট। অরুণ বলেছে, ও কি আর খোঁজখবর না নিয়ে কিনতে যাচ্ছে! ক্যালকাটা কর্পোরেশনে ওর খুব ভাল সোর্স আছে। ও সেই সোর্সকে অলরেডি নাকি খোঁজ নেওয়ার কথা জানিয়ে দিয়েছে। কালকেই পাকা খবর পেয়ে যাবে। যদি দেখে, কাগজপত্তর সব ঠিকঠাক, তখন? ছেলের এই কথা শুনে ওর কাকা বলেছিল, ঝামেলা না থাকলে তো মিটেই গেল। কিনে ফেল ফ্ল্যাটটা। বিয়ের পরে সংসার পাতো নতুন ফ্ল্যাটে। তবে হ্যাঁ, সব ক্রেডিট দিতে হবে নতুন বউকে। লক্ষ্মী বউ। সংসারে পা দিতে না দিতেই ফ্ল্যাট কেনা হয়ে গেল।'

ইন্সপেক্টর ঘোষরায় শুনতে শুনতে একটু বোধহয় উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন। 'ফ্ল্যাট কেনার গপ্পো শুনিয়ে একটা দাঁও মেরেছে নির্ঘাত?'

হতাশ মানুষের ভঙ্গিতে উত্তর দিলেন প্রণবেশবাবু, 'যাকে বলে বুদ্ধিনাশ, ঠিক তাই হয়েছিল আমার। না হলে লোকটা আমাকে যা বোঝাল আমি ঠিক তাই বুঝে গেলাম।'

'কী বুঝিয়েছিল?'

"বোঝাল, বাড়ি কেনার বিশ লাখের মধ্যে পনেরো লাখ জোগাড় করা হয়ে গেছে। কাকার কাছে নাকি দশ চেয়েছিল, পাঁচ দিয়েছে। পাত্র অবশ্য কাকাকে বারদশেক শুনিয়ে দিয়েছে——সামনের মাসেই টাকা শোধ দিয়ে দেবে। তারপরেই শেষ চাল দিল লোকটা। বলল, 'আমি বলেছি, বাকি পাঁচ জোগাড় করে দেওয়ার চেষ্টা করছি, তবে পারব বলে মনে হয় না। ঠাট্টা করে বলেছিলাম, সামনের মাসে যখন তোমার হাতে বেশ কিছু টাকা এসে যাচ্ছে——হবু শ্বশুরের কাছ থেকে বাকি পাঁচ ধার নিয়ে নাও না। এক মাসের জন্যে ধার নেওয়ার মধ্যে কোনও লজ্জা নেই। শুনে অরুণ আমার ওপর ভীষণ চটে গিয়েছিল। আমি যে ঠাট্টা করছি, সিরিয়াসলি বলিনি, এটা বোঝাতে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল আমাকে।"

এই পর্যন্ত বলার পরে চশমা খুললেন প্রণবেশবাবু, তারপর দুই ভুরুর মাঝখানের অংশটা আঙুল দিয়ে চেপে ধরে বললেন, 'এই ধরনের কথাবার্তা শুনলে যে-কোনও মেয়ের বাবাই তো রিঅ্যাক্ট করবে——তাই না?'

ইন্সপেক্টর ঘোষরায় মাথা নেড়ে জবাব দিলেন, 'অবশ্যই। প্রত্যেক মেয়ের মা-বাবাই চাইবে, মেয়ে-জামাই সুখে থাক। ওই কথার জবাবে কী বলেছিলেন আপনি?'

চশমাটা আবার পরে নিয়ে বিষণ্ণ হাসি হেসে প্রণবেশবাবু বললেন, "আমি সুইগুলারের টোপ গিললাম। জিজ্ঞেস করলাম, তা, এখন কী অবস্থা? অরুণোদয় কি বাকি পাঁচ জোগাড় করতে পেরেছে? কাকা-সাজা লোকটা বলল, না, পারেনি। ওদিকে ওই পাঞ্জাবি মালিক বোধহয় অন্য একটা খদ্দের পেয়ে গেছে। বলেছে, আর একটা দিন অপেক্ষা করবে। কালকের মধ্যে অরুণ পুরো টাকা নিয়ে হাজির হলে ওকেই বেচবে। পরশু থেকে অফার ওপেন। কাকা লোকটা কী ধুরন্ধর দেখুন——তার পরেই বলল, 'ভালই হয়েছে। এই ধরনের কেনাকাটা ফাটকাবাজির মতো। ফাটকাবাজিতে ভাল হয় না কারও। ও যে ব্যবসায় নেমেছে তাতে ওর টাকাপয়সার কোনও অভাব হবে না কখনও। এ তো একটা ফ্ল্যাট, ভবিষ্যতে ওই এলাকাতেই ও মস্ত একটা বাড়ি পর্যন্ত কিনতে পারবে।' শুনে আমি বললাম, অরুণোদয় ভবিষ্যতে বিরাট-কিছু হতে পারলে আমরা সবাই খুব খুশি হব। কিন্তু সে ভবিষ্যৎ তো একটু দূরের ভবিষ্যৎ। নিকট ভবিষ্যতের জন্যে উড স্ট্রিটের ওই ফ্ল্যাটটাই ভাল। পাঁচ লাখ টাকা আমি আপনাকে দিচ্ছি, অরুণোদয়কে আসল ব্যাপারটা বলার দরকার নেই। বলবেন, আপনিই ওদিক-ওদিক থেকে টাকাটা জোগাড় করেছেন। মাসখানেক বাদে অরুণোদয় শোধ করলে টাকাটা আপনি আমাকে ফেরত দিয়ে দেবেন। ব্যস, ঝামেলা মিটে গেল। আসল ব্যাপারটা কিছুকাল ওর না জানলেও কোনও ক্ষতি নেই। লোকটা নিমরাজি ভাব

দেখাল। মেয়ের বিয়ের জন্যে টাকা তোলা হয়েছিল ফিক্সড ডিপোজিট ভেঙে, তার থেকে পাঁচ লাখ টাকা বার করে লোকটার হাতে তুলে দিয়েছিলাম আমি।"

'কী ডেঞ্জারাস! বললাম না, এ একটা পাক্কা র‍্যাকেট। গয়নায় সাড়ে-চার আর নগদে পাঁচ—এখানেই তো সাড়ে ন'লাখ টাকা। অন্যান্য খাতেও বেশ কিছু মেরেছে নিশ্চয়ই। এ তো ভাল ব্যবসা! আপনার জামাই মানে বর সেজে-আসা চিটটাকে কী রকম দেখতে বলুন তো? কোনও আইডেন্টিফিকেশন মার্ক চোখে পড়েছে কি?'

লম্বা একটা নিঃশ্বাস ফেললেন প্রণবেশবাবু। 'সবই কপাল! ছেলেটাকে দেখতে বাজে হলে এই বিয়ের ব্যাপারে আর একটু চিন্তা-ভাবনা করতাম আমরা!'

'ছেলেটাকে দেখতে ভাল নাকি?'

'খুবই সুন্দর। রীতিমত হ্যান্ডসাম। কথাবার্তাও বেশ মার্জিত। ইন ফ্যাক্ট, ও যে ঠগ, জোচ্চোর—এ-কথাটা বিশ্বাস করতে এখনও আমার কষ্ট হচ্ছে।'

ইন্সপেক্টর ঘোষরায়ের চোখমুখ বেশ ধারালো হয়ে উঠেছিল। কৌশিকের সঙ্গে একবার চোখাচোখি করে নিয়ে ভারী গলায় বললেন, 'এই বিয়ের ব্যবসাটা যে একটা দলই চালাচ্ছে—এ-ব্যাপারে আমার কোনও সন্দেহ নেই। সুন্দর দেখতে বর সাজাবার মতো একটা ছেলে আছে এই দলে। দাদা-বৌদি কিংবা কাকা-কাকিমা সাজার জন্যে আছে মাঝবয়সী একজোড়া পুরুষ-মহিলা। এদের টার্গেট হল আপনাদের মতো ফিনানসিয়ালি স্টেবল পরিবারগুলো। আপনাদের টাকাপয়সা আছে। মেয়ের বিয়েতে ঢেলে খরচা করবেন। এটা স্বাভাবিক। রূপবান ছেলে দেখিয়ে, বড় চাকরিবাকরি বা ব্যবসার কথা শুনিয়ে কাজ হাসিল করে ওরা। দেশে শিক্ষিত বেকার আর বদ বুদ্ধিওয়ালা ঘুঘুর তো কোনও অভাব নেই। এই দুয়ে মিলে নতুন ব্যবসা। এই ফ্রন্টটা কিন্তু আগে ছিল না। এসব দেখে কী মনে হয় জানেন?'

'কী?'

'আমাদের ছেলেবেলায় খাতা বগলে বিয়ের ঘটক দেখেছি, তারা কিন্তু এইসব কাগুজে পাত্রপাত্রী কলামের চেয়ে ঢের বেশি নির্ভরযোগ্য ছিল। ঘটকদের মাধ্যমে যে সব বিয়ের সম্বন্ধ আসত, তাদের মধ্যে ভাল-খাবাপ দুই ছিল, কিন্তু ঠগ-জোচ্চোর একটাও ছিল না।'

ইন্সপেক্টরের কথা শুনে কৌশিক একটু হেসে বলল, 'দিনকাল পালটে গেছে, এখন আর ও সব নিয়ম খাটাবার উপায় নেই। আজকাল যে যার মতো থাকে, অনেকে তাদের প্রতিবেশীদেরও চেনে না। বিয়েটিয়ের ব্যাপারে ভাল সম্বন্ধ পেতে গেলে খবরের কাগজের ওপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় নেই। শুনেছি, একটা ভাল পত্রিকার রোববারের সারকুলেশন যদি ছ-লাখ হয়, সেই কাগজ পৌঁছে যায় লাখ-পঞ্চাশ পাঠকের কাছে। একটা ঘটক সেই জায়গায় ক'জনের কাছে পৌঁছতে পারবে? খুব বেশি হল পঞ্চাশ কি ষাট জন।'

'পঞ্চাশ-ষাট কি একশো-দুশো সেটা আমার জানার দরকার নেই, কিন্তু এককালে বিয়ের ঘটকালি তো এরাই করত। সম্বন্ধ পাকা করার জন্যে পাত্রপাত্রী সম্পর্কে একটু বাড়িয়ে-কমিয়ে বলত ঠিকই, কিন্তু পুকুরচুরি তো করত না।'

'পুকুরচুরি মানে?'

'এই খুনি আসামি বা ঠগ-জোচ্চোরকে পাত্র সাজিয়ে আনত না। মাঝখানে ঘটক থাকা মানে চেনাজানা একটা লোক থাকা, যাকে বলে গ্যারান্টার। আর কাগজের সম্বন্ধ দেখে এগনো মানে অন্ধকারে ঝাঁপ-মারা—।'

আপত্তি তোলার গলায় কৌশিক বলল, 'ওভাবে বলবেন না। কাগজের পাত্রপাত্রী কলামের মাধ্যমে অনেক ভাল-ভাল বিয়ে হয়। আমাদের সবার আত্মীয়স্বজনের মধ্যে এইরকম ভাল বিয়ে হয়েছে। তবে হ্যাঁ, সম্বন্ধ এলে অভিভাবকদের পক্ষ থেকে একটু ভালভাবে খোঁজখবর নেওয়া উচিত।'

পুলিশ ইন্সপেক্টর এই মুহূর্তে বোধহয় পেশার কথা ভুলে গিয়ে দায়িত্বশীল একজন অভিবাবক হয়ে উঠেছেন। একটু ধমকে-ওঠার গলায় বললেন, 'ভালভাবে খোঁজ নেওয়ার কোনও মাপকাঠি আছে না কি? সাধ্যমতো সবাই খোঁজখবর নেয়। কিন্তু কতকগুলো ক্ষেত্রে তো আমাদের বেশি দূর পর্যন্ত এগোবার কোনও উপায়ই থাকে না। ছেলে ধরো ক্যালিফোর্নিয়ায় আছে। এখানে বাবা-মা থাকে নতুন-বানানো একটা মাল্টিস্টোরিডে। তুমি কী খবর নেবে বলো? কিংবা ছেলে কানপুরে চাকরি বা ব্যবসা করে, বাবা এলাহাবাদের বাসিন্দা, এক মামা থাকে কলকাতায়—বিয়ের ব্যাপারে তিনিই করেসপন্ডেন্স করছেন—এ ক্ষেত্রে খোঁজখবর নিয়ে তুমি কদ্দূর পর্যন্ত এগোতে পারো? আর একটা কথা বলছি, মিলিয়ে নিও। বিয়ের ব্যাপারে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যোগাযোগের ব্যাপারগুলো সারে বয়স্ক বাবা-মা। তাদের দৌড় হচ্ছে চিঠি লেখা পর্যন্ত। চিঠি-ফোনে কথাবার্তা কিছুটা এগোবার পরে একদিন গিয়ে পাত্র বা পাত্রী দেখে আসে। ব্যস, খোঁজখবর ওই পর্যন্তই। কাছাকাছি হলে কাউকে ধরে ছেলের কর্মস্থলে একটা খোঁজ নেওয়া হয়। খুব ভালভাবে খবর নিতে না পারার অক্ষমতা আমরা ঢাকি ভাগ্যের দোহাই পেড়ে। একটা বাঁধা গত তো আছেই—বিয়ে মানেই কপাল।'

ইন্সপেক্টরের কথায় শুকনো মুখে সায় দিলেন প্রণবেশবাবু। 'আপনি ঠিকই বলেছেন। আমাদের আরও ভালভাবে খোঁজখবর নেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ওরা এমন একটা তাড়া লাগাল যে—। ছেলে নাকি শিগ্‌গিরই বিদেশে চলে যাবে। ওখানে চার-পাঁচ মাস থাকতে হতে পারে। এত তাড়াতাড়ি মেয়ের বিয়ের যোগাড়যন্তর করার অসুবিধে আছে বলার সঙ্গে সঙ্গে ছেলের কাকা বলেছিল—ঠিকই তো, মেয়ের বিয়ে বলে কথা! তা হলে এক কাজ করা যাক, ছেলে বিদেশ থেকে ঘুরে আসুক। ছ-আট মাস বাদেই বিয়ে হবে। কথা তো হয়েই রইল। এ সব শুনলে ভয় হয়। অযথা দেরি করলে সুপাত্র যদি হাতছাড়া হয়ে যায়! বাড়ির লোকজন আমাকে তখন একটু চাপই দিয়েছিল। শুভ কাজে দেরি করা ঠিক নয়, তুমি রাজি হয়ে যাও। বাড়ির লোকদের দোষ দিচ্ছি না। আমার মনও তখন ওই কথাই বলছিল। ব্যস, রাজি হয়ে গেলাম।'

ইন্সপেক্টর ঘোষরায় নিজের উরুর ওপর ছোট্ট একটা চড় কষিয়ে বললেন, 'সব জায়গাতেই ওরা বোধহয় এই খেলাটাই খেলে। আপনাদের একটা চাপের মধ্যে রাখলে আপনারা

অন্য দিকে নজর দেওয়ার খুব একটা সময় পাবেন না। অন্যদিকে মানে পাত্রের খোঁজখবর তনেওয়ার দিকটা—।'

মেয়েব বাবাব চোখমুখ কালো হয়ে গিয়েছিল। কী যেন বলতে গিয়ে কিছুই বলতে পারলেন না। কৌশিক মুখ খুলল, আবার। 'আচ্ছা, বর, মানে বর-সাজা ওই ছেলেটা স্যুটকেস ছাড়া আর কিছু ফেলে গেছে কি?'

উত্তরে দুদিকে মাথা নাড়ালেন মেয়ের বাবা।

'একটু ভালভাবে মনে করে দেখুন তো। এই ধরুন কোনও বই বা পত্রিকা? ছোটখাটো কোনও নোটবই বা কাগজপত্তর? গগল্‌স বা চাবির রিং?'

এ ঘরের কথাবার্তা ওদিকের বারান্দায় আর সামনের সিটিং-কাম-ডাইনিংয়ে দাঁড়ানো আরও অনেক শুনছিল। গোয়েন্দার প্রশ্নের ধাক্কায় বারান্দায় মৃদু একটা গুঞ্জন উঠল। তারপর একজন বলল, চটি ফেলে গেছে।

উত্তেজনায় উঠে দাঁড়িয়েছিল গোয়েন্দা। 'চটি! ও তা হলে খালি পায়ে পালিয়েছে?'

এবারের উত্তরটাও এল বারান্দা থেকে। বরের চটি ঘরে বাইরে ছিল। আমাদের কাজের লোক সেই চটি তুলে নিয়ে রেখে দিয়েছে জুতোর বাক্সে। জুতোব বাক্স থাকে সিঁড়ির ওপর দিকে।

গোয়েন্দা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল, 'চটিটা একবাব নিয়ে আসুন তো।'

একটু বাদেই এসে গেল নতুন বরের চটি। খুব বাহারি দেখতে। চটির একপাটি হাতে তুলে নিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে কেমন যেন অবিশ্বাসীর গলায় গোয়েন্দা জিজ্ঞেস করল, 'এটা বরের চটি?'

দু-একজন সঙ্গে সঙ্গে বেশ জোরের গলায় উত্তর দিল; 'হ্যাঁ, এটাই বরের চটি। আর একজন বলল, 'চটি না পেয়ে ও বোধহয়, হাওয়াই চপ্পল পরে গেছে। বাইরে কয়েক জোড়া হাওয়াই চপ্পল ছিল।'

এবার নিজের মনে কথা বলার ভঙ্গিতে গোয়েন্দা বলল, 'চটির মাপ দেখছি আট! তার মানে বরের পা আর পাঁচটা সাধারণ মাপের পায়ের মতো।'

এ-কথার কোনও উত্তর হয় না। কিন্তু ওদিক থেকে একজন বলল, 'বরের চেহারা কিন্তু বেশ লম্বা-চওড়া।'

কথাটা বোধহয় গোয়েন্দার কানেই ঢুকল না। ও ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে চটিটা আরও কয়েকবার দেখার পরে মেঝেতে নামিয়ে রেখে ওপাশের ওয়াশবেসিন থেকে হাত ধুয়ে এল।

হঠাৎ ইন্সপেক্টর ঘোষরায় সামনের ভিড়ের দিকে তাকিয়ে ভারিক্কি চালে বলে উঠলেন, 'আপনাদের কাজের লোকটাকে একবার ডাকুন তো—ওই যে, ভোরবেলায় যে বরকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে দেখেছিল।'

সঙ্গে দু-তিন জায়গা থেকে আওয়াজ উঠল, 'বীণা, ও বীণা', 'মাস্তব মা, ও মাস্তর মা'। বীণা এবং মাস্তর মা একই মানুষ—এ বাড়ির কাজের লোক।

একটু বাদে ভেতর থেকে একজন বলল, 'বীণা, একটু আগে ওর দিদির বাড়িতে গিয়েছে, কাল ফিরবে।'

সহজ-স্বাভাবিক উত্তরটাকে ভালভাবে নিলেন না পুলিশ ইন্সপেক্টর ঘোষরায়। তীক্ষ্ণ

দৃষ্টিতে প্রণবেশবাবুর শালার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'বীণা নামের ওই কাজের লোকটর এ-বাড়িতে কাজ করছে কদ্দিন ?'

'অনেক দিন। ওর ছোটবেলা থেকেই। তা প্রায় বছর-কুড়ি হবে।'

'আমি কাল আবার আসব, ওকে একটু জিজ্ঞাসাবাদ করা দবকাব। আগে থেকে বলাব কোনও দরকার নেই। তবে ফিরলে ওকে আর বাড়ি থেকে বেরুতে দেবেন না। ঠিক আছে, আজ চলি।'

বাড়ি থেকে বেরিয়ে গম্ভীর মুখে জিপে উঠে বসলেন ইন্সপেক্টর। সঙ্গে গোয়েন্দা। জিপ একটুখানি ছোটার পরে ইন্সপেক্টর বেশ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বললেন, 'বুলাব মার্ডাব আর এই ক্রাইমটা একই দলের। ওখানে ওই মাঝবয়সী দম্পত্তি দাদা-বৌদি সেজেছিল, এখানে কাকা-কাকিমা। বর দুটো জায়গাতেই এক লোক। তুমি নিশ্চয়ই এ ব্যাপাবে আমার সঙ্গে একমত ?'

'অবনীদা, আমি সামনের নার্সিংহোমটার সামনে নেমে যাব।'

'কেন ?'

'একটু কাজ আছে।'

নার্সিংহোমের সামনে জিপটাকে দাঁড় করিয়ে দিল ড্রাইভার। কিন্তু নামার মুখে ইন্সপেক্টব খপ্ করে গোয়েন্দার হাত ধরে বললেন, 'কী কৌশিক, তুমি আমার প্রশ্নের জবাব দিলে না তো ? ও ব্যাপারে তুমি নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে একমত ?'

'কী করে বলব বলুন ? তবে দুটো বব যে এক নয়, এটা শুধু বুঝতে পেরেছি।'

উত্তর শুনেই বোধহয় ইন্সপেক্টরের হাত আলগা হয়ে গিয়েছিল, সেই ফাঁকে জিপ থেকে টুক করে নেমে পড়ল গোয়েন্দা।

।। এগারো ।।

কয়েকদিন ধরে বেশ কনকনে শীত পড়েছিল, কিন্তু সেই শীতটা এখন আর নেই। আর একবার ঠিক জাঁকিয়ে শীত পড়বে, কিন্তু সেটা কবে, কখন—কে জানে!

রাত এখন পৌনে এগারোটা। চারদিক চুপচাপ হয়ে আছে। কৌশিক ডায়েরির পাতায় সাঙ্কেতিক ভাষায় বেশ কিছু লেখালেখি শুরু করেছে। এই সব সাঙ্কেতিক লেখালেখির মধ্যে জটিল অঙ্ক লুকিয়ে আছে। এ অঙ্কের হদিস পাওয়া বাইরের লোকের কম্ম নয়। তবে ডায়েরির পাতাগুলো কেউ যদি খুঁটিয়ে দেখে—বুঝতে পারবে এই মানুষটি সহজ পথ ধরে এগোতে পারছে না। সাঙ্কেতিক ভাষা অঙ্কের চেহারা ধরে কিছুটা এগোবার পরে গোয়েন্দা কলমের নির্মম টানে সেটা খারিজ করে দিয়েছে অথচ ডায়েরির আগের পাতাগুলোর

অঙ্কের বেশ একটা সহজ, স্বাভাবিক চেহারা আছে। অঙ্কের ওই স্বাভাবিক চেহারা হঠাৎই বিচ্ছিরি ভাবে জট পাকিয়ে গেছে আজ থেকে।

এগারোটা নাগাদ টেলিফোন বাজতেই কৌশিক প্রায় লাফ মেরে গিয়ে রিসিভারটা তুলল। ওপাশে মুখার্জিবাবু। প্রায় নালিশ জানাবার ভঙ্গিতে মুখার্জিবাবু বললেন, 'দুদিন ধরে আপনাকে টেলিফোনে ধরার কী চেষ্টাটাই যে করছি, কী বলব! যতবারই ফোন করি ততবারই বাঁধা বুলি—অল লাইনস আর এনগেজ্‌ড, প্লিজ ডায়াল আফটার সাম টাইম। এ এক অদ্ভুত ব্যাপার! রেকর্ডেড টেপ চালিয়ে দিয়ে বসে আছে।'

সান্ত্বনা দেওয়ার গলায় কৌশিক বলল, 'ব্যাঙ্গালোর এখন খুব ব্যস্ত শহর। কলকাতাও ব্যস্ত, লাইন এনগেজড থাকা অস্বাভাবিক নয়। যাকগে, আপনার শরীর কেমন আছে বলুন?'

'ভাল।'

'ট্রেন জার্নিতে কোনও অসুবিধা হয়নি তো?'

'না।'

'এবার আপনার সহযাত্রীদের কথা বলুন? দেখেশুনে রেখেছেন তো?'

'তা তো রেখেছিলাম, কিন্তু এখন ওদের আর কোনও পাত্তা নেই।'

'মানে?'

'আপনি যে ভাবে বলেছিলেন সেই ভাবেই চোখে চোখে রেখেছিলাম। চেন্নাইয়ে গাড়ি বদল। এক কম্পার্টমেন্টেই উঠেছিলাম। ব্যাঙ্গালোরে নেমে ওরা অটো নিয়েছিল, আমিও একটা অটো নিয়ে ওদের পিছু নিলাম। ওরা এখানকার একটা থ্রি-স্টার হোটেল ব্লু মুনে উঠল। ওদের ঘর বুক করা ছিল আগে থেকে। আমিও ওই হোটেলে একটা ঘর নিয়ে নিলাম। একই ফ্লোর—সেকেন্ড ফ্লোরে।'

'ভেরি গুড। তারপর?'

'দুপুর বেলায় পৌঁছেছিলাম। ওরা রুম-সার্ভিস নিল, আমি ডাইনিং হলে গিয়ে খেলাম। খাওয়ার পরে আমি আর ঘরে যাইনি। বারান্দায় এক ধারে একটা বসার জায়গা আছে, সেখানে গিয়ে বসেছিলাম। ওখান থেকে ওদের ঘরটা দেখা যাচ্ছিল পরিষ্কার। বেলা তিনটে সাড়ে-তিনটে নাগাদ ওদের ঘরে মাঝবয়সী এক ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলা ঢুকলেন।'

'তারপর?'

'আধঘন্টা বাদে দেখি ওদের সঙ্গে ওই নতুন বউ, মানে মিসেস সামন্ত বেরিয়ে গেল।'

'আর ওর বর, ওই ছেলেটা?'

'ছেলেটা ঘরেই থেকে গিয়েছিল। আধঘন্টা বাদে স্যুটকেসসমেত বেরিয়ে এল ঘর থেকে। হোটেলের বিলপত্তর মেটাল।'

'ছেড়ে দিল হোটেল?'

'হ্যাঁ বেরিয়ে গিয়ে একটা ট্যাক্সি ধরল। আমি ধরলাম। পিছু নিয়ে একসময় পৌঁছে গেলাম এয়ারপোর্টে।'

'এয়ারপোর্টে?'

'হ্যাঁ। ছেলেটার সঙ্গে এয়ার-টিকেট ছিল। ভেতরে ঢুকে গেল। খবর নিয়ে জানলাম,

ওই সময় কলকাতার একটা ফ্লাইট আছে, ডিলেড ফ্লাইট। তিন ঘন্টা বসেছিলাম এয়ারপোর্টের লাউঞ্জে। ছেলেটা আর ফেরেনি। আমার মনে হয়, কলকাতাতেই ফিরে গেছে।'

চাপা গলায় কৌশিক বলল, 'আমি এইরকমই একটা আশঙ্কা করেছিলাম!'

'অ্যাঁ! কী বললেন?'

'না, কিছু না। ওই অপূর্ববাবুর খোঁজ পেয়েছেন?'

'পেয়েছি। ওর বাড়ির সামনেই একটা গেস্টহাউসে উঠেছি। লোকটা খুব বাজে ধরনের। ওয়াইনিং আর ওম্যানাইজিং নিয়ে মেতে আছে—।'

'আর কিছু, মানে ওর ক্রিমিনাল অ্যাকটিভিটিজ কিছু চোখে পড়েছে?'

'না, এখনও পড়েনি। তবে মনে হয়, এ লোকের পক্ষে সবরকম অপরাধ করাই সম্ভব।'

'নজরে রাখবেন। যাদের সঙ্গে ওঠাবসা করে, যদ্দুর সম্ভব তাদের খোঁজখবরও নেবেন। বড় কোনও ঘটনা না ঘটলে দিনতিনেক বাদে ফিরে আসুন কলকাতায়। সাবধানে থাকবেন। ছাড়ছি তাহলে।'

টেলিফোনের রিসিভার নামিয়ে রাখল কৌশিক। সহকারী মুখার্জিবাবুর কথাগুলো ওর মাথার মধ্যে নতুন একটা চিন্তাতরঙ্গ তৈরি করেছিল। সেই ধাক্কাতেই বুঝি ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে শুরু করে দিয়েছিল কৌশিক। কিছুক্ষণ বাদে ডায়েরির পাতায় সাঙ্কেতিক ভাষায় আবার কিছু লেখালেখি করল। লেখার ধরন সিঁড়িভাঙা অঙ্কের মতো। একটু পরে লেখা পাতাটা একটানে ছিঁড়ে গোল্লা পাকিয়ে ঘরের কোণের দিকে ছুড়ে ফেলল। দেয়াল-ঘড়ির কাঁটা ইতিমধ্যে নিঃশব্দে বেশ কিছুটা ঘুরে গেছে। ঘড়িতে এখন বারোটা পঁচিশ।

এবার শুয়ে পড়া দরকার। কিন্তু গোয়েন্দা পরিষ্কার বুঝতে পারছিল, শুলেও এখন ওর ঘুম আসবে না। স্নায়ু উত্তেজিত। শরীরের মধ্যে অদ্ভুত এক ছটফটানি ভাব।

বইয়ের আলমারি থেকে গম্ভীর চেহারার একটা বই টেনে নিয়ে শুয়ে পড়ল কৌশিক। বইয়ের মধ্যে জীবন কী, মৃত্যু কী, সুখ কী, অসুখ কী ইত্যাদি গুরুতর বিষয় নিয়ে আলোচনা আছে। কৌশিক লক্ষ করে দেখেছে, মনোযোগ দিয়ে এইসব বিষয় নিয়ে কিছুক্ষণ পড়াশুনো করলে চারপাশের সবকিছুকেই তুচ্ছ এবং অসার বলে মনে হয়। এই চারপাশের মধ্যে ও নিজেও আছে। অন্তহীন কালপ্রবাহে ওর অস্তিত্ব সামান্য একটি ধূলিকণার চাইতে বেশি নয়। নিজেকে এই ভাবে দেখতে পেলে চট করে এক বৈরাগ্যের জন্ম হয়। সেই বৈরাগ্য দেখা দিলেই স্নায়ুর যাবতীয় উত্তেজনা থিতিয়ে যায়।

বইটা পড়তে পড়তে শরীর-মন শান্ত হতেই হাত বাড়িয়ে ঘরের আলোটা নিবিয়ে দিয়েছিল গোয়েন্দা।

কৌশিক যত রাতেই ঘুমোক না কেন, ভোরবেলায় ওর ঘুম ভেঙে যায়। তারপর ঘন্টাখানেক শরীরচর্চা। ব্রেকফাস্ট সারার আগে ও এক কাপ চা আর একটা বিস্কুট খায়। তারপর অ্যাপয়েন্টমেন্টের খাতাটা টেনে নিয়ে দিনের কর্মসূচিতে চোখ বুলোয়। আজ সকাল ন'টায় অধ্যাপক মৃদুল ভট্টাচার্যের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট। দুপুরে ছুটতে হবে তিনটে অফিসে। বিকেল চারটের মধ্যে ফিরতে হবে নিজের চেম্বারে। বিকেল সাড়ে-চারটে থেকে পাঁচটার মধ্যে প্রমিতা আসবে কী-একটা থিয়েটারের টিকিট কেটে।

কলকাতার মধ্যে একটু দূরে কোথাও অ্যাপয়েন্টমেন্ট থাকলে হাতে কিছুটা সময় নিয়ে

বেরুনো দরকার। সেই হিসেবে বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তার দু-তিনটে জ্যাম পেরিয়ে মোটামুটি ঠিক সময়েই অধ্যাপক ভট্টাচার্যের বাড়ির কাছে পৌঁছে গিয়েছিল কৌশিক। এখানে ওর ভূমিকা সাংবাদিকের। একটি পত্রিকার জন্যে সাক্ষাৎকার নিতে এসেছে। নতুন ভূমিকার জন্যে মোটামুটি একটা প্রস্তুতি নিয়ে এসেছিল গোয়েন্দা।

ডোরবেল বাজাবার পরে আজকেও দরজা খুলেছিলেন অধ্যাপক ভট্টাচার্য। কৌশিককে দেখে উনি চিনতে পেরেছিলেন, অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়ার কথাও মনে আছে নিশ্চয়ই; কিন্তু প্রেসের লোক দেখে খুব যে একটা খুশি হননি—সেটা ওঁর চোখমুখ দেখেই ধরতে পেরেছিল কৌশিক। বিব্রত মুখে ও বলল, 'বেশিক্ষণ আপনার সময় নষ্ট করব না, সামান্য কয়েকটা প্রশ্ন শুধু—।'

'কিন্তু আমার কথা আপনার পত্রিকার পাঠকদের জানিয়ে কী লাভ?'

'আজকের পাঠকরা অনেক-কিছু জানতে চায়। আপনার কথা, আপনার কাজের কথা জানতে পারলে ওরা খুব খুশি হবে।'

'সেটা তো আপনার পত্রিকার পাঠকদের লাভ। আমার কী লাভ হবে?'

'আপনার লাভ! মানে?'

প্রশ্নের উত্তরে গম্ভীর গলায় অধ্যাপক ভট্টাচার্য বললেন, 'আপনার পাঠকদের অকারণ কৌতূহল মেটাতে গিয়ে আমার বেশ কিছুটা কাজের সময় নষ্ট হবে। আপনাদের লাভ মানে আমার ক্ষতি।'

কৌশিক খুব ভাল ভাবে জানে, পণ্ডিতদের সঙ্গে কক্ষনো তর্ক করতে নেই। পণ্ডিতরা পাণ্ডিত্যের অভিমানে ঘা লাগাও একেবারে পছন্দ করেন না। ওঁদের সব কথায় সায় দিয়ে এক-আধটা অনুরোধ রাখলে কাজ বরং হলেও হতে পারে।

কৌশিকের চোখেমুখে কুণ্ঠার ছাপ ফুটে উঠেছিল ভীষণভাবে। ও ঢোক গিলে মিনমিনে গলায় বলল, 'সত্যি, আপনার সময় নষ্ট করার জন্যে আমি খুব লজ্জিত। আসলে আপনাদের মতো মানুষের সঙ্গে একটু-আধটু কথা বলতে পারার লোভ তো আমাদের পক্ষে সামলানো কঠিন—।'

কথাটায় কাজ হল। অধ্যাপকের কঠিন মুখে খুশির ছাপ ফুটে উঠেছিল এক লহমার জন্যে। উনি বললেন, 'আপনি আসুন, এদিকে এসে বসুন। চা খাবেন তো?'

কৌশিকের এখন একেবারেই চা খেতে ইচ্ছে করছিল না, কিন্তু চায়ের প্রস্তাবে ও সঙ্গে সঙ্গে মাথা কাত করেছিল একপাশে। 'হ্যাঁ' বলার কারণটা ওর নিজের কাছে খুব পরিষ্কার। কেউ চা খাওয়াতে চাইলে সেই চা ঘরে আসা এবং অতিথির না-খাওয়া পর্যন্ত সময়টা বাঁধা থাকে। অর্থাৎ চা শেষ হওয়ার আগে অতিথিকে বিদেয় করা চলবে না।

অধ্যাপক ভট্টাচার্যের টেবিলের ওপর একগাদা বই ছড়ানো। উনি টেবিলের সামনের চেয়ারটা টেনে নিয়ে একটু ঘুরে বসলেন। কৌশিক বলল, 'আচ্ছা, আপনি সেদিন নীলগিরি পাহাড়ের টোডাদের কথা বলছিলেন। টোডা মেয়েকে দ্রৌপদী বলা হয়, কারণ—একটা টোডা মেয়ের অনেকগুলো স্বামী; পাঁচ-ছ ভাইয়ের একটিমাত্র বউ। অন্য কোনও জাতের মধ্যে কি এই নিয়ম নেই?'

প্রিয় বিষয় পেয়ে অধ্যাপকের চোখমুখ জ্বলজ্বল করে উঠেছিল। উনি কৌশিকের মুখের

কথা প্রায় কেড়ে নিয়ে বললেন, 'ছিল। বেশ কয়েকটি জাতের মধ্যে ছিল। ত্রিবাঙ্কুরের মুডুবন, মল-পুলায়ন ও মল-আরয়নদের মধ্যে একসময় এই ধরনের বিয়ের খুব চল ছিল। এক স্ত্রীর অনেক স্বামী। আসল ব্যাপারটা কী জানেন, যে কোনও নিয়মেরই সৃষ্টি হয় অভাব ও প্রয়োজন থেকে। আর্যরা যখন এদেশে আসে তখন তারা সঙ্গে করে অল্প কিছু মেয়েছেলে নিয়ে এসেছিল। পুরুষের সংখ্যা বেশি, মেয়ের সংখ্যা কম। এদেশের মানুষদের আর্যরা ঘৃণার চোখে দেখত। রক্তের বিশুদ্ধতা বজায় রাখার জন্যে তারা এখানকার মেয়ে বিয়ে করত না। ওদিকে নিজেদের সমাজের মেয়ে তো নামমাত্র। একদিকে অভাব, অন্যদিকে প্রয়োজন—এই দুই থেকে একটা নিয়ম বানাল আর্যরা। একটি মেয়েকে কয়েক ভাই একসঙ্গে বিয়ে করবে। তবে অস্বাভাবিক এই উপায়ে রক্তের শুদ্ধতা তারা বেশিদিন বজায় রাখতে পারেনি। বাঁধন একটু আলগা হতেই এ-দেশের মেয়েদের বিয়ে করে ঘর-সংসার পাততে শুরু করে দিয়েছিল আর্যরা। আগে ছিল এক স্ত্রীর বহু স্বামী, এবার এক স্বামীর বহু স্ত্রী।'

'আমাদের দেশে পুরুষদের বহুবিবাহের চলটাই বোধহয় বেশি। না?'

অধ্যাপক ভট্টাচার্য চশমা খুলে কাচ মুছলেন, তারপর চশমাটা আবার পরে নিয়ে বললেন, 'সেটাই তো স্বাভাবিক। পুরুষরা ছিল শাসনকর্তা। গায়ের জোর বেশি। মেয়েরা তখন বেশির ভাগ জায়গাতেই পণ্যের মতো। সুতরাং পুরুষরা তো বহুবিবাহের দিকে যাবেই। পরবর্তিকালে ওরা মেয়েদের সম্মান দিয়েছে, কিন্তু বহুবিবাহটা আর ছাড়েনি। মহাভারতের দিকে তাকান না।'

নড়েচড়ে বসে কৌশিক বলল, 'হ্যাঁ, এই যেমন ধৃতরাষ্ট্র।'

একটু হেসে উঠে অধ্যাপক ভট্টাচার্য বললেন, 'শুধু ধৃতরাষ্ট্র নয়, সেই রাষ্ট্রের বেশির ভাগ পুরুষের একাধিক বউ ছিল। যযাতি বিয়ে করেছিল শর্মিষ্ঠা ও দেবযানীকে, শান্তনু বিয়ে করেছিল সত্যবতী ও গঙ্গাকে, বিচিত্রবীর্যের দুই বউ—অম্বিকা ও অম্বালিকা। রাজা সোমকের ছিল একশো বউ। দ্রৌপদীকে এক্সেপশন বলা যায়—এক কন্যার পাঁচ স্বামী। তবে সব স্বামী কিন্তু দ্রৌপদীকে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকেনি। ভীম বিয়ে করেছিল হিড়িম্বাকে আর অর্জুন বিয়ে করেছিল উলুপী, চিত্রাঙ্গদা ও সুভদ্রাকে।

অধ্যাপককে হাসতে দেখে কৌশিকও হাসল। 'সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলছে। আমাদের দেশে ষাট-সত্তর বছর আগে কুলীনদের দাপট কি কম ছিল?'

অধ্যাপকও হাসলেন আবার। 'অত পিছোবার দরকার নেই। এই সেদিনও বাংলার কুলীন ব্রাহ্মণরা গাদা গাদা বিয়ে করত। বিয়ের খাতা থাকত। কেউ-কেউ দুশো-তিনশো পর্যন্ত বিয়ে করত। লুকিয়ে-লুকিয়ে বিয়ে করা নয়, রীতিমত আইনসম্মত বিয়ে। ১৯৫৫ সালের হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্ট হওয়ার পর থেকে এদের সুদিন গেছে। নতুন আইনে এক স্ত্রী জীবিত থাকলে আর একজনকে বিয়ে করা অপরাধ। স্ত্রী বেঁচে থাকতে থাকতে দ্বিতীয় বিয়ের শখ চাপলে ডিভোর্স করতে হবে আগে। তবে ডিভোর্স পাওয়ার অনেক হ্যাপা, বিশেষ করে ছেলেদের ক্ষেত্রে। তারপর আবার খোরপোষ দেওয়ার দায় আছে।'

একটু-একটু করে আলোচনার মধ্যে জড়িয়ে গিয়েছিল কৌশিক। সামান্য আবেগের সঙ্গে ও বলে ফেলল, 'ডিভোর্স পাওয়া নিয়ে ছেলেদের একটু অসুবিধে থাকতে পারে,

কিন্তু একবার পেয়ে গেলে আর কোনও ঝামেলা নেই। তবে এ-দেশে ডিভোর্সি মেয়েদের পদে পদে ঝামেলা, অসম্মান।'

অধ্যাপক হাত তুলে কৌকিশকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'দেশ বলতে আপনি যদি গোটা ভারতবর্ষের কথা বলে থাকেন, আমি অন্য কথা বলব।'

'কীরকম?'

'ভারতবর্ষ বড় বিচিত্র দেশ। এদেশে কোথাও-কোথাও বিবাহ-বিচ্ছেদের ফলে স্ত্রীদের পদমর্যাদা বেড়ে যায়। দক্ষিণ ভারতের কুরুবদের মধ্যে যে স্ত্রী সাতবার স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে সেই স্ত্রীর পদমর্যাদা আচার-অনুষ্ঠানের ব্যাপারে অনেক উঁচুতে। আবার—।'

কথার মাঝখানে এক কাপ চা আর একটা প্লেটে কিছু বিস্কুট নিয়ে কাজের লোক ঘরে ঢুকল। ওকে দেখেই উঠে দাঁড়ালেন অধ্যাপক, তারপর কৌশিকের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনি চা খান। আমি এখন উঠছি। আমাকে বেরুতে হবে একটু বাদেই।'

কথার জবাব শোনার জন্যে অপেক্ষা না করেই দ্রুত পায়ে বাড়ির ভেতরদিকে চলে গেলেন অধ্যাপক ভট্টাচার্য। কৌশিক মনে মনে নোট করল, চা শেষ না হওয়া পর্যন্ত অতিথির সামনে গৃহস্বামীর বসে থাকার থিয়োরিটা সব জায়গায় খাটে না।

অধ্যাপক ভট্টাচার্যের কিছু-কিছু কথা দ্রুত হাতে নোট করেছিল কৌশিক। পত্রিকার জন্যে সাক্ষাৎকার নিতে এসেছে একজন সাংবাদিক, সুতরাং কিছু নোট তো তাকে নিতেই হবে। তবে অধ্যাপক মানুষটি প্রকৃত অর্থেই প্রচারবিমুখ। কোন্ কাগজ, কবে বেরুবে ইত্যাদি নিয়ে একটি প্রশ্নও করেননি। এই ব্যাপারে সম্ভাব্য প্রশ্নের উত্তর ভেবে এসেছিল কৌশিক, কিন্তু প্রশ্ন না আসায় মিথ্যে উত্তরগুলো আর আওড়াতে হয়নি।

আধকাপ চা খাওয়ার পরে কাপটা সরিয়ে রাখল ও। এবার? অধ্যাপক তো বেরুবার জন্যে তৈরি হচ্ছেন। তৈরি হলেই বেরিয়ে পড়বেন। এখানে আর বসে থাকার কোনও মানে হয় না। কিন্তু যাওয়ার আগে কোনও একজনকে বলে যেতে পারলে ভাল হত।

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে ওদিক-ওদিক তাকাবার পরেও কাউকে দেখতে পেল না কৌশিক। বুঝতে পারল, এ বাড়িটা কাজের লোক অধ্যুষিত। বেরিয়ে গেল ঘরের দরজা বন্ধ করার জন্যে একজন হাজির হয়ে যাবে ঠিক। তাই হল, বেরিয়ে যাওয়ার একটু পরেই পেছন থেকে দরজা বন্ধ করার শব্দ ভেসে এল।

কৌশিকের দুপুরের কাজগুলো দরকারি, কিন্তু একটু ক্লান্তিকর। তিনটে অফিস ঘুরে নিজের ছোট্ট চেম্বারে যখন ফিরে এল তখন বিকেল চারটে। চারটে পঁচিশ নাগাদ্ প্রমিতা এসে বলল, 'কী ফ্রি তো? না কি এক্ষুনি চোর ধরতে বেরুবে?'

কৌশিক হাসতে হাসতে জবাব দিল, 'চোর তো পুলিশে ধরে। গোয়েন্দারা ধরে খুনি, ডাকাত—এইসব। আমার মতো প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটররা আবার মারাত্মক অপরাধী ছাড়া ছোঁয় না।'

প্রমিতাও হাসল। 'এত খুশি-খুশি দেখাচ্ছে। অপরাধী ধরা পড়েছে নাকি?'

'পাগল! অপরাধী কোথায় আছে জানি না, তবে আমি আছি ঠিক সাত হাত জলের তলায়। যাকগে, আমার দুঃখকষ্টের কথা বাদ দাও; তোমার প্ল্যান কী বলো?'

'এখান থেকে মোড়ের মাথায় যাব। ওখানে গিয়ে দু-টাকার চিনেবাদাম কিনব। বাদাম খেতে খেতে আমরা পশ্চিমদিকে হাঁটব। আমাদের বাদাম শেষ হবে টিউবস্টেশনের মুখে। পাতালরেলে রবীন্দ্র সদন। ওখান থেকে বেরিয়ে শিশির মঞ্চের ক্যান্টিনে এক কাপ চা। তারপর একটুখানি হাঁটা। অ্যাকাডেমিতে সন্ধের শোয়ে একটা থিয়েটার দেখব আমরা। তারপর—।'

'ব্যস ব্যস, তারপর কী করা যায়, আমি ঠিক করব।' কৌশিকের কথায় ঝলমল করে হেসে উঠেছিল প্রমিতা। মোড়ের মাথায় আজ বাদামওয়ালাকে পাওয়া গেল না। বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে স্টেশনারি দোকান থেকে পটাটো চিপ্স কেনা হল। মুচমুচে দুটো চিপ্স মুখের মধ্যে ফেলে প্রমিতা বলল, 'জানো, আজ একটা বিচ্ছিরি ব্যাপার হয়ে গেছে।'

'বিচ্ছিরি ব্যাপার! কী ?

'সুনেত্রাদি আর ওঁর বরের মধ্যে খুব কথা কাটাকাটি হয়ে গেছে। সুনেত্রাদি খুব কাঁদছিলেন আমার কাছে। উনি তেমন কিছুই বলেননি, কিন্তু প্রফেসর ভট্চাজ যা তা শুনিয়ে দিয়েছেন ওঁকে।'

'কী নিয়ে ?'

'ওঁর দাদা, অপুদাকে নিয়ে। সুনেত্রাদি বলেছিলেন, তুমি একবার বাঙ্গালোরে গিয়ে দাদার খোঁজটা নাও। ব্যস, ওই একটা কথা শুনে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠেছিলেন প্রফেসর। চেঁচিয়েমেচিয়ে বলেছেন—তোমার দাদা একটা লোফার, স্কাউন্ড্রেল, ক্রিমিনাল। ওর বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়ার কোনও দরকার নেই। যা কানে এসেছে, তার এক ভাগও যদি সত্যি হয়, তোমার দাদা একটা জঘন্য চরিত্রের লোক। ওর সঙ্গে তুমি আর কোনও সম্পর্ক রাখবে না। যদি রাখো, তোমার সঙ্গে আমার সব সম্পর্ক শেষ। বলতে বলতে সুনেত্রাদি কাঁদছিলেন। ওই ভাবে কাউকে কাঁদতে দেখলে না কেঁদে পারা যায় নাকি! আমিও কাঁদলাম। সুনেত্রাদি কাঁদতে কাঁদতে জিজ্ঞেস করলেন, সেই ডিটেকটিভ এজেন্সি কি দাদার সম্পর্কে কোনও খবর জোগাড় করতে পেরেছে? ওইরকম দুঃখের সময় আমি আর মিথ্যে কথা বলতে পারলাম না।'

একমুঠো চিপস্ মুখে ফেলতে যাচ্ছিল কৌশিক, থমকে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী মিথ্যে কথা বলতে পারলে না ?'

'ওই সময় মিথ্যে বলা যায় না। তোমার কথা বললাম। বললাম, ও একটা ডিটেকটিভ এজেন্সি চালায়। ঠিক খবর তোমাকে এনে দেবে শিগ্গিরই।'

'ইশ্শ্! ও বাড়িতে তো আমার পরিচয়—আমি একজন সাংবাদিক।'

প্রমিতা এবার কৌশিককে আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে বলল, 'আমি বলেছি ও সাংবাদিকতাই বেশি করে, গোয়েন্দাগিরি কম।'

কৌশিক আশ্বস্ত হয়েছে কি না, বোঝা গেল না। ও ফুটপাথের ওপর দাঁড়িয়ে পড়েছিল হঠাৎ। ওর মুঠোভর্তি চিপ্স মুখের কাছ থেকে অনেক দূরে।

কৌশিক ওর বিস্ময় কাটিয়ে উঠতে পারছিল না। ফুটপাথে পা-দুটো যেন গেঁথে গেছে।

মুঠোভর্তি পটাটো-চিপ্‌স মুখ থেকে অনেক দূরে। আর একবার ঢোক গিলে বলল, 'তুমি তোমার সুনেত্রাদিকে বলে দিয়েছ আমি একটা ডিটেকটিভ এজেন্সি চলাই।'

প্রমিতার চোখেমুখে একটু অপ্রস্তুত হওয়ার ভাব ফুটে উঠেছিল, কিন্তু ওটাকে ও জোর করে কাটিয়ে ফেলার চেষ্টা করে বলল, 'আরে বাবা, আমি ও ভাবে বলেছি নাকি! আমি বলেছি ও পেশায় সাংবাদিক। ঝঞ্ঝাটের কাজ, ওই কাজেই ও জড়িয়ে থাকে সব সময়; যখন একটু আধটু সময় পায়, তখনই শুধু—।'

'তখনই শুধু ডিটেকটিভগিরি করি।'

'তুমি অকারণে দুশ্চিন্তা করছ। সুনেত্রাদি কী ভালমানুষ তুমি জানো না। তুমি কী করো আর না করো তাই নিয়ে উনি কি আর পাঁচজনকে ডেকে গল্প করতে যাচ্ছেন!'

'গল্প করার বিষয় এটা নয়, তবে কিছু-কিছু তুচ্ছ কথার সূত্রেও বিপদে পড়ে যায় কেউ-কেউ।'

'বিপদ! এর মধ্যে আবার বিপদের গন্ধ পেলে কোথায়?'

'পাইনি। হয়তো পাব না। তবে আমাদের পেশাটা তো বড় অদ্ভুত পেশা। এখানে শুধু হারজিতের খেলাই চলে। হয় আমি জিতি, নয় অপরাধী জেতে। অপরাধী জেতার আনন্দে আমার ওপর একটা-দুটো গুলিও খরচ করে দিতে পারে।'

কথাটায় একটু বুঝি শিউরে উঠল প্রমিতা। 'কী যা-তা বলছ!'

কৌশিক এবার হাসল। 'যা-তা নয়, ঠিক কথা। তবে ওটা শেষ কথা। মুখ ফসকে-যাওয়া দু-একটা তুচ্ছ কথার জন্যে আমাদের অনেক পাকা ঘুঁটি কেচে যায়। যাকগে যা বলেছ বলেছ, ও নিয়ে আর কখনও কিছু বলতে যেও না। ও ব্যাপারে আবার যদি কোনও কথা ওঠে—বলে দিও, আমার সঙ্গে তোমার আর দেখাই হয় না। দেখা হওয়ায় কথাও নয়, যৎসামান্য আলাপ। তাই তো?'

প্রমিতার মুখেও একচিলতে হাসি ফুটে উঠেছিল। অন্য ধরনের হাসি। কেমন যেন টেনে টেনে ও বলল, 'ঠিকই তো। যৎসামান্য আলাপ। এতই সামান্য যে কী না কী বলার জন্যে দশটা কথা শুনিয়ে দেয় আমাকে।'

খোলা গলায় হেসে উঠল কৌশিক। 'তুমি দেখছি তোমার সুনেত্রাদির মতো অভিমানী হয়ে উঠেছ। ওঁর মতো আবার কেঁদে ফেল না প্লিজ। খুব বড়লোকদের মেয়ে-বউদের তো সত্যিকারের কাজকর্ম বলে কিছু থাকে না, তাই তারা কথায় কথায় শুধু কাঁদে আর অভিমান করে।'

কথাটায় রীতিমত আহত বোধ করল প্রমিতা। 'তুমি সুনেত্রাদিকে চেনো না, তাই এ ধরনের কথা বলছ! ওরা যে কী বড়লোক কী বলব! কিন্তু কোনও ব্যাপারে কখনও অহংকার করতে দেখিনি। আর কী নরম মন! দাদাঅন্ত প্রাণ তো—। দাদার ভালর কথা ভেবেই বরের সঙ্গে একটু তর্ক করেছিল গোড়ার দিকে, তারপর একদম চুপ। প্রফেসর ভট্টাচার্য স্কলার মানুষ, দেশবিদেশে কত নাম, দিনরাত্তির বই মুখে নিয়ে বসে থাকে; কিন্তু ওঁর কথার কী ঝাঁজ! আমি তো ছিলাম পাশের ঘরে। বাব্বা! কী বিষঢালা কথা! না শুনলে বোধহয় কখনই বিশ্বাস করতে পারতাম না যে, অত বড় মাপের মানুষের মুখ দিয়ে অমন নোংরা কথাবার্তা বার হয়!'

কৌশিক প্রমিতার কনুইয়ে ছোট্ট একটা টান মেরে হাঁটতে শুরু করল সামনের দিকে। ওর হাতের পটাটো-চিপ্‌স এখন মুখের মধ্যে। আলুভাজা মুখের মধ্যে একটুখানি কাদাকাদা হওয়ার পরে আবার মুখ খুলল ও। 'নোংরা কথাবার্তা মানে ওই যেগুলো তুমি শোনালে?'

'আরে বাবা, একই কথা, কিন্তু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কত ভাবে যে বলল—কী বলব! তোমার দাদা লোফার, স্কাউন্ড্রেল, ক্রিমিনাল—কত কী! ঠিক আছে, তর্কের খাতিরে ধরে নিলাম অপুদা মানুষটা একেবারে বখে গেছে। কিন্তু এমন তো ছিল না। কুসঙ্গে পড়ে একটা ভাল লোকও তো খারাপ হয়ে যেতে পারে। পারে না?'

প্রমিতা কথার মধ্যে এমন একটা স্রোত তৈরি করেছিল যে, বোধহয় সেই ধাক্কাতেই কৌশিক বলে উঠল, 'পারে।'

'তুমি যা বলছ যে কোনও কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন লোকই তাই বলবে। কিন্তু অত বড় একজন পণ্ডিতের রকমসকম একেবারে উলটো ধরনের ছিল। অসভ্যের মতো গলার স্বর তুলে ওইসব আজেবাজে কথা বলে যাওয়া—। পাশের ঘরটাই বাচ্চাদের ক্লাসঘর। তখন টিফিনের ছুটি। ওই বাড়ির ভেতরদিকে মস্ত একটা উঠোন আছে, ওখানে বাচ্চারা খেলছিল। ক্লাসে বসে হোমকওয়ার্কগুলো দেখছিলাম আমি। তখনই ঝগড়া বেধেছিল। ঝগড়া নয়, যা বলার ওই প্রফেসরই বলে যাচ্ছিল একটানা। সুনেত্রাদি কতবার বলল—আস্তে আস্তে, পাশের ঘর থেকে শোনা যাচ্ছে। কী বলল তখন জানো?'

'কী?'

'বলল—শুনুক। যা সত্যি কথা, সবারই তা শোনা দরকার। অথচ ওই অপুদাই দু-বছর আগে দিদির বিয়ের জন্যে কী ছোটাছুটিই না করেছে! পাত্র ঠিক করার সব দায়িত্ব অপুদাই নিয়েছিল। বিরাট বড়লোকের একমাত্র মেয়ে সুনেত্রাদি। একটু খুঁত আছে, একটু বয়েস হয়েছে, কিন্তু তাতে কী—সব অভাব ঢেকে দিয়েছে ওদের টাকাপয়সা। ওই খুঁতটা না ধরলে সুনেত্রাদি তো দেখতে বেশ সুন্দরীই। তার ওপর লেখাপড়া জানা মেয়ে।'

'কত বয়েস এখন তোমার সুনেত্রাদির?'

'কত হবে—আটত্রিশ, চল্লিশ।'

'আর প্রফেসর মৃদুল ভট্টাচার্যের?'

'দেখে তো মনে হয় পঞ্চাশ-বাহান্ন। তুমি তো দেখেছো, তোমার কত মনে হয়?'

হেসে উঠে কৌশিক জবাব দিল, 'এই বয়েসের ব্যাপারটা আমি কিছুতেই ধরতে পারি না। প্রফেসরের ফ্রেঞ্চকাট দাড়ির কিছুটা পেকেছে, কিন্তু মাথার চুল তো কালোই। বেশ সৌম্য চেহারা কিন্তু ভদ্রলোকের।'

'অপুদা ওর দিদির বর হিসেবে ভদ্রলোককে বাছাই করার পেছনে ওটা একটা কারণ ছিল।'

'বাকি কারণগুলো?'

'এক নম্বর কারণ—ভদ্রলোক মস্ত বড় স্কলার। দু-নম্বর কারণ—একা মানুষ। বাবা-মা

মারা গেছেন অনেক দিন আগে। এক ভাই বিদেশে সেটেল্‌ড, দেশে আর ফেরার ইচ্ছে নেই। প্রফেসর চাকরি ছেড়ে লেখালেখির কাজ ধরেছেন, সুতরাং পাত্রীর বাড়িতেই থাকতে পারবেন। দিদিও পড়াশুনো ভালবাসে। দুজনের মধ্যে এটা একটা মস্ত মিল। তবে বিয়ের আগের অমায়িক মানুষটা যে এ রকম দুর্মুখ—এটা অপুদারা নিশ্চয়ই কল্পনা ও করতে পারেনি।'

এবার একটু প্রতিবাদ করার গলায় কৌশিক বলল, 'দুর্মুখ বোলো না। এমনিতেই উনি যথেষ্ট অমায়িক, ভদ্র। তবে চটে যাওয়ার কারণ ঘটলে যে কেউ চটে যাবে। ভদ্রলোক ওর শালার ওই লাইফস্টাইল একেবারেই মেনে নিতে পারছেন না। পারা সত্যিই কঠিন।'

'প্রফেসর মনে হয় একটু বেশিমাত্রায় নীতিবাগীশ।'

'সন্দেহবাতিকও আছে আবার।'

'সন্দেহবাতিক! কীরকম?'

পথ চলার রাস্তায় অচেনা মানুষের কথা শোনার কোনও আগ্রহ থাকে না কারও, তবু দ্রুত চোখে চারদিক একবার দেখে নিয়ে গলার স্বর একটু খাদে নামিয়ে প্রমিতা বলল, 'তোমাকে সুনেত্রাদির এক বন্ধু রিমিদির কথা বলছিলাম না সেদিন। স্কুলের বন্ধু, দুজনে একসঙ্গে ছায়ার মতো থাকত সব সময়। রিমিদির বর রেলের ডাক্তার, ওরা মাস-ছয়েক হল জব্বলপুরে বদলি হয়ে গেছে।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ মনে পড়ছে। জব্বলপুরের কোয়ার্টার্সে এখনও টেলিফোন আসেনি বলে দুই বন্ধুর মধ্যে সপ্তাহে-সপ্তাহে চিঠিপত্র চালাচালি হয়—তাই তো?'

'হ্যাঁ। প্রাণের বন্ধু বলতে যা বোঝায়, ওরা ঠিক তাই। রিমিদি তো একটা সময় প্রায়ই বলত: সুনেত্রার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে বলে আমি বিয়েই করব না। এইরকম ছিল ওদের বন্ধুত্ব। যাই হোক, রিমিদি বিয়ে করল শেষ পর্যন্ত। শ্বশুরবাড়ি সুনেত্রাদির বাড়ির কাছাকাছি ছিল বলেই হয়তো রাজি হয়েছিল। দুই বন্ধুর মেলামেশা যেমন ছিল তেমনই থেকে গেল। রিমিদির বর খুব হই-হুল্লোড়ে, সময় গেলে উনিও আড্ডা মারতেন সুনেত্রাদিদের সঙ্গে। প্রফেসর ভট্‌চাজ আভাসে ইঙ্গিতে জানিয়েছিলেন, ওই রকম আড্ডা উনি পছন্দ করেন না। শেষের দিকে একদিন সুনেত্রাদিকে বলেই বসলেন; তোমার সঙ্গে রিমির বরের একটা অ্যাফেয়ার আছে বোধহয়। কী বিচ্ছিরি কথা বলো তো! আমি তো জানি, সুনেত্রাদি কেমন মেয়ে। ওকে নিয়ে এমন বদনাম ওর শত্রুও বোধহয় দিতে পারবে না।'

'কিন্তু তুমি এ সব কথা জানলে কী করে?'

'সুনেত্রাদি বলছিল। কাঁদতে কাঁদতে বলছিল। সত্যি, ওর বলার জায়গা বলতে তো আমি ছাড়া আর কেউ নেই এখন। অথচ ওর মনটা কী নরম দেখ। কাঁদতে কাঁদতে বলছিল, রাগ করে মানুষটা বেরিয়ে গেল! এই সময় বাড়িতে থেকে ওর সেমিনারের পেপার্স তৈরির কথা। আজ রাত্তিরে খড়্গপুরে যাবে। কাল ওখানে একটা সেমিনার আছে। পরশু সকালে ফিরবে। ফেরার দু-চার দিনের মধ্যেই মাদ্রাজে যাবে। ওখানে একটা কনফারেন্স আছে।'

'রাগ করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে প্রফেসর এখন গেছে কোথায়? খড়্গপুরে?'

'না-না, খড়্গাপুরে তো বাত্রে যাবে। সুনেত্রাদি বলছিল, রাগ করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে বোধহয় লাইব্রেরিতে গেছে। পেপার্স তৈরির কাজটা বোধহয় ওখানে বসেই সারবে।'

একটু হেসে উঠে কৌশিক বলল, 'পণ্ডিতদের এ রকম রাগ করা উচিত নয়। রাগ মানেই মাথার মধ্যে তালগোল পাকিয়ে যাওয়া। আর তালগোল পাকানো মাথা মানেই কাজের ক্ষতি।'

প্রমিতা হাসল। 'সুনেত্রাদি বলছিল, প্রফেসরের রাগ কিন্তু বেশিক্ষণ থাকে না।'

একমুঠো আলুভাজা মুখের মধ্যে ফেলে দিয়ে কেমন যেন খচমচ করে কৌশিক বলল, 'তা হলে তো মিটেই গেল। যে সংসারে একটা লোক রাগের কথা চটপট ভুলে যায়, সেই সংসারে অশান্তি কখনই বড় হয়ে উঠতে পারে না। তুমি আর তোমার দিদিকে নিয়ে শুধু শুধু দুশ্চিন্তা কোরো না তো।'

আলুভাজার প্যাকেট শেষ হওয়ায় ঠিক পরেই ওরা পাতাল রেলের স্টেশনে পৌঁছে গিয়েছিল। এক্ষুনি একটা ট্রেন ছাড়বে। চটপট টিকিট কেটে প্ল্যাটফর্মের দিকে ছুটল ওরা। প্ল্যাটফর্মে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গেই ট্রেন। লম্বা পা চালিয়ে ওরা ট্রেনে উঠে পড়েছিল।

পাতালরেলে বহুদিন উঠেছে প্রমিতা, কিন্তু এখনও এই ট্রেন নিয়ে ওর প্রথমদিকের বিস্ময়বোধটা রয়েই গেছে। মাটির ওপরে যেখানে দু-পা চলতে দশ মিনিট, গলদঘর্ম করে, কখন পৌঁছনো যাবে—কেউ জানে না ; সেখানে এই মাটির নীচে কত দূরে পৌঁছে যাওয়া যায় হুশ্ করে।

ট্রেনে বিশেষ ভিড় ছিল না। ট্রেন ছাড়ার একটু পরে প্রমিতা বলল, 'সুনেত্রাদির বাড়ি থেকে আমি বেরুবার মুখে এক ভদ্রলোক এসে হাজির হলেন। কে জানো ? তোমাদের ওই প্রসেনজিৎ।'

'কোন প্রসেনজিৎ ?'

'আরে বাবা তোমাদের ওই বুলা মার্ডার কেসের প্রসেনজিৎ, প্রসেনজিৎ রায়।'

কথাটা শুনেই কৌশিকের চৌকো চোয়াল কেমন যেন কঠিন হয়ে উঠেছিল। 'প্রসেনজিৎ ! ওখানে কেন ?'

'কথা শুনে বুঝলাম, সুনেত্রাদি ডেকে পাঠিয়েছে।'

'কেন ?'

'আরে সে-কথা কি আমার সামনে বলবে ! আমাকে ওর স্কুলের টিচার বলে আলাপ করিয়ে দিলে সুনেত্রাদি। ভদ্রলোকের পরিচয় হিসেবে বলল ওর দাদা অপুদার বন্ধু। আমি তখনই বুঝে গেলাম, এ প্রসেনজিৎ কোন প্রসেনজিৎ।'

'তারপর ?'

'কী আশ্চর্য, তারপর আবার কী ! ওদের মধ্যে দরকারি কথাবার্তা আছে, সেটা জানার পরেও আমি বোকার মতো দাঁড়িয়ে থাকব ! পরিচয় হওয়ার পরেই আমি কেটে পড়লাম ওখান থেকে।'

এই প্রসঙ্গটা ওঠার আগে পর্যন্ত কৌশিক বেশ হাসিখুশি ছিল, এখন ওর চোখেমুখে একটু যেন থমথমে ভাব।

যে ভাবে ওরা সন্ধেটা কাটাবে ভেবেছিল, ঠিক সেই ভাবেই কাটল। শিশির মঞ্চের ক্যান্টিনে চা খাওয়া, অ্যাকাডেমিতে থিয়েটার দেখা; কিন্তু গল্পের ফাঁকে ফাঁকে কৌশিক কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল।

ট্যাক্সি করে প্রমিতাকে ওর বাড়ির সামনে নামিয়ে দিয়ে কৌশিক যখন নিজের ফ্ল্যাটে ফিরে এল তখন ওর দেয়াল-ঘড়িতে দশটা বাজতে দশ। কাজের ছেলে নিমোর বয়েস আঠারো-উনিশ। ও টিভিতে একটা রুদ্ধশ্বাস অ্যাকশন ছবি দেখছিল। ক্যারাটে জানা ছবির নায়ক একের পর এক দশটা খুনেকে শায়েস্তা করতেই এক কোণে শিঁটিয়ে থাকা নায়িকা ভুবনভোলানো হাসি হেসে অভ্যর্থনা জানাল প্রেমিককে। ওই হাসিতে আশস্ত হয়ে নিমো বলল, 'দাদা, টেবিলে খাবার সাজিয়ে রেখেছি।' এ-কথার অর্থ; এখন টিভি ছেড়ে উঠতে পারব না।

কাজের লোক বলতে যা বোঝায়, এ বাড়িতে নিমোর পরিচয় তা নয় আদপেই। বরং মাঝেমধ্যে ও গোয়েন্দার অভিভাবকও হয়ে ওঠে। জোর খাটায়। কিন্তু একটা নিয়ম ওকে মেনে চলতে হয় খুব সতর্কতার সঙ্গে। তা হল—গোয়েন্দার গতিবিধি নিয়ে প্রশ্ন না করা। নিমো খুব ভাল ভাবেই জানে, রহস্য সমাধানের পথে কিছুটা এগোবার পরে গোয়েন্দার রকমসকম পালটে যায় অনেকখানি। এখন বোধহয় সেটা শুরু হয়েছে সবে। নিমোর ওই কথাটার উত্তর না দিয়ে নিজের ঘরে চলে গেল গোয়েন্দা।

ঘরে গিয়ে ও জামাকাপড় না ছেড়ে বেতের চেয়ারে গা ছড়িয়ে বসল। চোখ দেয়ালের ওপর দিকে, কিন্তু মনে মনে ও বোধহয় বহু দূরে কোথাও চলে গিয়েছিল।

এই এলাকাটা বেশ নিরিবিলি। এখানে রাত বোধহয় একটু তাড়াতাড়ি নামে। সিটিং-কাম-ডাইনিং হল থেকে টিভির ছবির হালকা শব্দ ভেসে আসছিল। আর কোথাও কোনও শব্দ নেই। হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠল। এ সময় প্রায় প্রতিদিনই দু-চারটে ফোন আসে। উঠে গিয়ে টেলিফোন ধরল গোয়েন্দা।

ও পাশে মহিলার সুরেলা গলা। 'কৌশিক মিত্র আছেন?'

গলাটা চিনতে পারল না গোয়েন্দা। 'বলছি।'

ও দিকে এক মুহূর্তের নীরবতা। অচেনা গলার মহিলা নিজেকে বোধহয় একটু গুছিয়ে নিয়ে বললেন, 'অসময়ে ফোন করার জন্য লজ্জিত—।'

'না-না বলুন, এটা আমার অসময় নয়।'

'আপনার একটু সাহায্য চাই আমি।'

'কী সাহায্য?'

'এ ভাবে টেলিফোনে বলার অসুবিধে আছে, আপনি আমাকে যদি একটু সময় দেন—।'

'বেশ, একদিন আমার অফিসে চলে আসুন দুপুরের দিকে।'

'অফিসে না গিয়ে আমি যদি আপনার বাড়িতে যাই।'

'বাড়িতে কী করে আসবেন? আমি বেরিয়ে যাই সকালে, ফিরতে ফিরতে বেশির ভাগ দিনই রাত হয়ে যায়।'

'সকালে কটায় বেরোন?'

'নটা নাগাদ।'

'আমি যদি আটটায় আসি, আপনার কি খুব অসুবিধে হবে?'

'কেন, বাড়িতে আসতে চাইছেন কেন?'

'আপনার বাড়িটা আমি যেখানে আছি, তার থেকে খুব কাছে। তাছাড়া আমার কথাগুলো খুব গোপনীয়। আমি বেশিক্ষণ আপনার সময় নেব না।'

'বেশ আসুন। তবে আমার হাতে খুব জরুরি একটা কাজ আছে। ওই কাজটা শেষ হওয়ার আগে কিন্তু আপনার কাজ ধরতে পারব না!'

'কিন্তু এমনওতো হতে পারে—।'

'কী?'

'না, ঠিক আছে; গিয়েই কথা বলব আপনার সঙ্গে। আমি কাল তা হলে সকাল আটটার সময় আপনার বাড়িতে যাচ্ছি।'

'কাল! বেশ আসুন। আপনার নামটা কী?'

'পিয়ালি, পিয়ালি সেন। ছাড়ি তা হলে, শুভরাত্রি।'

টেলিফোনের রিসিভার নামিয়ে রেখে গোয়েন্দা আবার বেতের চেয়ারে এসে বসল। কিন্তু এবার আর হাত-পা ছড়িয়ে নয়, কেমন যেন টান-টান হয়ে—। একটু বাদেই উঠে পড়ে পায়চারি শুরু করে দিল ঘরের মধ্যে।

কিছুক্ষণ বাদে ঘড়ির দিকে চোখ পড়তেই গোয়েন্দার মধ্যে শুরু হয়ে গেল অন্য এক ধরনের তৎপরতা। হাতমুখ ধুয়ে খাবার-টেবিলে গিয়ে বসল, কিন্তু বিশেষ কিছু খেল না। একটু পরে উঠে গিয়ে ডায়েরি আর কলম নিল। সাঙ্কেতিক ভাষায় সিঁড়িভাঙা অঙ্কের মতো লেখালেখি চলল আধ ঘণ্টাটাক।

মারদাঙ্গাভর্তি টিভির সিনেমা শেষ। টিভি বন্ধ করে উঠে পড়েছে নিমো। গোয়েন্দা মাঝেমধ্যে ওর ঘরের দরজার সামনে হালকা পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছিল। আর একবার ওই শব্দটা কানে যেতেই গোয়েন্দা অন্যদিকে তাকিয়ে চাপা গলায় বলল, 'নিমো তুই শুয়ে পড়। আজ রাতে আমি একটু বেরুব, সকাল হওয়ার আগেই ফিরে আসব। বাইরে থেকে দরজা লক করে যাব, তুই আর ভেতর থেকে খিলটিল দিস না।'

নিমো কথার কোনও উত্তর দিল না, কিন্তু ওর পায়ের শব্দ শুনে গোয়েন্দা বুঝতে পারল—ছেলেটা ওর নিজের ঘরেই ফিরে গেছে।

রাত একটার সময় গোয়েন্দা ওর পথে বেরুবার পোশাক পরল। কালো রঙয়ের একটা জিন্‌সের প্যান্ট আর একটা কালচে-সবুজ জ্যাকেট। জ্যাকেটের ভেতরের পকেটে সরু

অথচ মজবুত একটা দড়ির বান্ডিল, একটা ভাঁজ করা ছুরি আর একটা মাস্টার-কি। প্যান্টের পকেটে ছোট মাপের একটা পিস্তল। পায়ে দৌড়বার জুতো। অবিকল বেড়ালের ভঙ্গিতে ঘর থেকে বেরিয়ে দরজা লক্ করে দিল গোয়েন্দা। ওপর থেকে নীচে নামতে বেশিক্ষণ সময় লাগল না ওর। একতলায় গাড়ির গ্যারাজ। গ্যারাজ থেকে মারুতি বার করল গোয়েন্দা, তারপর সেটা নিয়ে ছুট লাগাল মধ্য কলকাতার দিকে।

রাতের অভিযান শেষ করে গোয়েন্দা ফিরে এল ভোররাতে। গিয়েছিল খালি হাতে, ফিরল যখন ওর হাতে ব্রাউন রঙয়ের মাঝারি মাপের একটা প্যাকেট।

হাতের প্যাকেটটা ও আলমারির মধ্যে ঢুকিয়ে রেখে বিছানার ওপর আছড়ে পড়ল। এতক্ষণ বিস্তর ধকল গেছে, সেই সঙ্গে কিছুটা উদ্বেগ আর উত্তেজনা। বিছানায় পড়ামাত্তর ঘুমে কাদা হয়ে গিয়েছিল গোয়েন্দা।

চট করে ওই ঘুম ভাঙানো কঠিন। ঘুম ভাঙাতে গিয়ে নিমোকে বেশ কসরতই করতে হয়েছিল। ঘুমজড়ানো গলায় গোয়েন্দা জিজ্ঞেস করল, 'কী রে, ডাকছিস কেন ?'

'এক দিদিমণি এসেছে।'

'কোন্ দিদিমণি ?'

'চিনি না, আগে দেখিনি কখনও। দিদিমণি বলল, ওর এখানে আসার কথা বাবু জানে।'

'কটা বাজে রে ?'

'আটটা বাজতে পাঁচ।'

কথাটা কানে যেতেই লাফ দিয়ে উঠে বসেছিল গোয়েন্দা।

।। বারো ।।

সকাল ঠিক আটটার সময় প্রণবেশ ব্যানার্জির বাড়ির সামনে পুলিশ ইন্সপেক্টর অবনী ঘোষরায়ের জিপ এসে দাঁড়াল ঘ্যাঁচ করে। প্রণবেশবাবু দরজার কাছেই ছিলেন, জিপের শব্দ শুনে বেরিয়ে এলেন।

ড্রাইভারের পাশের সিটে বসেছিলেন ইন্সপেক্টর, উনি প্রণবেশবাবুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী, এসেছে ?'

'হ্যাঁ, আজ ভোরেই।'

উত্তর শুনেই জিপ থেকে নেমে পড়লেন ইন্সপেক্টর। বিশাল চেহারার মানুষটির চোখেমুখে একটু যেন ক্লান্তির ছাপ পড়েছে। কোমরের বেল্টটাকে একটুখানি ওপর দিকে টেনে তুলে লম্বা পায়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেলেন।

বসার ঘরে সোফার ওপরে ইনসপেক্টর বসার পরে প্রণবেশবাবু বললেন, 'একটু চা বলি।'

'না, চা খেয়েই তো এলাম। আপনি আপনাদের কাজের মেয়েটাকে ডাকুন।'

উত্তরে প্রণবেশবাবু এ দিকের দরজা দিয়ে বাড়ির ভেতরের দিকে তাকালেন।

একটু বাদেই এ বাড়ির কাজের মেয়ে জড়সড় ভঙ্গিতে ঘরে এসে ঢুকল। মেয়েটির বয়েস কুড়ি-পঁচিশ। মাথায় একটুখানি ঘোমটা তোলা। বোঝাই যায়, বাড়ির কাজ করছিল। মেয়েটি দরজার পাল্লায় পিঠ লাগিয়ে একটু ঝুঁকে পড়ে জলহাত মুছছিল শাড়ির আঁচলে।

অন্যান্য দিন এই রকম জায়গায় বসে মাথার টুপি খুলে কোলের ওপর রাখেন ইন্সপেক্টর ঘোষরায়। আজ উনি আর টুপি খোলেননি। আসলে নতুন কাউকে জেরা করার সময় উনি মাথার টুপি, গায়ের পুলিশি পোশাক, প্রকাণ্ড শরীর আর বাজখাঁই গলাকে পুরোমাত্রায় কাজে লাগান।

কাজের মেয়েটার পা থেকে মাথা পর্যন্ত কয়েকবার দেখে নেওয়ার পরে ইন্সপেক্টরের গলায় মেঘ ডাকল। 'কী নাম তোমার?'

মিনমিনে গলায় উত্তর এল, 'বীণা।'

এবার আরও জোরে মেঘ ডাকল। 'এ দু-দিন কোথায় ছিলে?'

ওই গর্জনের ধাক্কায় বোধহয় বীণার গলার স্বর আরও মিহি হয়ে গিয়েছিল। 'দিদির বাড়িতে।'

'দিদির বাড়িতে কেন?'

'দিদির নাতির মুখে ভাত ছিল।'

'তোমার দিদির নাতির মুখে ভাত! কত বয়েস তোমার দিদির?'

'আমার চেয়ে বিশ বছরের বড়।'

ইন্সপেক্টর ওঁর ভারী-ভারী আঙুলগুলো দিয়ে সোফার হাতলে টোকা মারলেন কয়েকটা, তারপর কেমন যেন কেটে কেটে জিজ্ঞেস করলেন, 'বিয়ের পরদিন ভোরবেলায় নতুন বরকে তুমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে দেখেছিলে?

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'সদর দরজা কে খুলেছিল? তুমি না নতুন বর?'

'নতুন বরই খুলছিল। তো, ওই সময় আমি ওখান দিয়ে যাচ্ছিলাম। আমাকে দেখে উনি বললেন, 'দরজাটা খুলে দাও তো। আমি দিলাম।'

ইন্সপেক্টর প্রণবেশবাবুর চোখের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'দরজাটা যে তুমি খুলে দিয়েছ, সে কথা কি এ বাড়ির কেউ জানে?'

প্রশ্নের কোনও জবাব দিল না বীণা। ওর মাথা নীচের দিকে একটুখানি ঝুঁকে পড়েছিল শুধু।

জেরায় সুফল ফলার জন্যেই বোধহয় আর একবার মেঘ ডাকল ইন্সপেক্টরের গলায়। 'দরজা খুলে দিলে যখন, তখন ক'টা বাজে?'

'সবে ভোর হয়েছে।'

'রাত ফুরোলে তো ভোরই হয়। কিন্তু ঘড়িতে তখন ক'টা বাজে? তিনটে? চারটে? না পাঁচটা?'

বীণার মাথা বোধহয় নীচের দিকে আর একটু ঝুঁকে পড়েছিল। 'আমি ঘড়ি দেখিনি।'

'বেশ। দাদাবাবুকে জিজ্ঞেস করোনি, অত ভোরে কোথায় যাচ্ছেন?'

'না।'

'কেন জিজ্ঞেস করোনি? বিয়ের পরদিন ভোরবেলায় নতুন বর একা-একা কোথায় যাচ্ছে, জানতে ইচ্ছে করেনি তোমার?'

এ বার একপাশে আলতো করে মাথা কাত করল বীণা।

'জানতে ইচ্ছে করেছিল, অথচ জিজ্ঞেস করোনি! কেন?'

'লজ্জা করছিল।'

এই ধরনের একটা উত্তর শোনার জন্যে বোধহয় একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন না দোর্দণ্ডপ্রতাপ ইন্সপেক্টর। আঙুল দিয়ে সোফার হাতলে আবার কয়েকটা টোকা মারার পরে জিজ্ঞেস করলেন, 'বরকে তুমি কোন দিকে যেতে দেখেছিলে?'

'পার্কের দিকে।'

'পার্কে ঢুকতে দেখেছিলে?'

'না।'

'আচ্ছা, পার্কের সামনে কি কোনও গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল? মনে করে বলো?'

মনে করার চেষ্টা করতে গিয়ে একটু ওপর দিকে মুখ তুলল বীণা, তারপর বলল, 'হ্যাঁ, গাড়ি তো ছিল। একটা সাদা রংয়ের গাড়ি।'

'বর কি ওই গাড়িতে গিয়ে উঠেছিল?'

'না, গাড়ির পাশ দিয়ে তো চলে যেতে দেখলাম।'

'তুমি তারপর কী করলে?'

'ঘরের কাজ সারতে গেলাম।'

ইন্সপেক্টরের কপালে বেশ কয়েকটা ভাঁজ পড়েছিল। 'তুমি কি রোজ খুব ভোরবেলায় ওঠো?'

'না, কখনও-কখনও একটু বেলা হয়ে যায়।'

'বেশ এখন তুমি যাও।'

বীণা চলে যাওয়ার পরে গলার স্বর একটু নীচে নামিয়ে ইন্সপেক্টর মেয়ের বাবাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা প্রণবেশবাবু, ওই জোচ্চোরগুলোর সঙ্গে যোগসাজশ আছে— চেনাজানার মধ্যে এমন কোনও লোককে কি আপনি সন্দেহ করেন?'

ম্লানমুখে দু'দিকে মাথা নাড়লেন মেয়ের বাবা।

'ইতিমধ্যে কি ওদের সম্পর্কে আর কোনও খবর জানতে পেরেছেন?'

'না।'

'পেলে জানাবেন, তা সে যত ছোট ইনফর্মেশনই হোক না কেন। আমরা কিন্তু বসে নেই। তদন্তের কাজ পুরোদমে চলছে। ঠিক আছে, আজ তাহলে চলি। নমস্কার।'

ইন্সপেক্টর জিপে উঠতেই জিপ ছুট লাগাল চৌরাস্তার দিকে।

একই রহস্য, কিন্তু সেই রহস্য সমাধানের চেষ্টা চলছে দু'দিক থেকে। একদিকে পুলিশ ইন্সপেক্টর ঘোষরায়, অন্যদিকে প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর কৌশিক মিত্র। দু'জনের পথ এই মুহূর্তে দু'দিকে। একটি দক্ষিণের চৌরাস্তায়, অন্যটি উত্তরের ডিটেকটিভ এজেন্সিতে।

বেলা এগারোটার সময় ছোট্টখাট্ট চেহারার অফিসটা খুলে ভেতরে ঢুকল কৌশিক। একটা ফাইল টেনে দরকারি কাগজপত্তর দেখার মুখেই ওখানে এসে হাজির হল উল্টোডাঙার বাসিন্দা এবং পুলিশের বিখ্যাত ইনফর্মার মধুসূদন পুরকাইত।

মধুসূদনকে দেখে বেশ খুশি হয়ে উঠেছিল গোয়েন্দা। 'আরে! আসুন আসুন। বসুন।'

মধুসূদন মানুষটি অতিমাত্রায় বিনম্রী। অভ্যর্থনার উত্তরে লাজুক ভঙ্গিতে হেসে বলল, 'আপনার অফিসে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে বারতিনেক ফোন করেছি। ফোন বেজে যাচ্ছে, কেউ ধরছে না। ভাবলাম, হয় আপনারা কেউ আসেননি, নয় লাইন খারাপ।'

'না-না, টেলিফোনের লাইন ঠিক আছে। অফিস বন্ধ ছিল। আমি তো একটু আগেই এলাম—। আসলে আজ সকালে একজন অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে আটটার সময় বাড়িতে এসেছিলেন। আমার ধারণা ছিল, মিনিট দশ-পনেরোর মধ্যে কথাবার্তা শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু সেই কথাবার্তা শেষ হতে হতে পাক্কা দু-ঘণ্টা লেগে গেল। যাকগে, আপনার কথা বলুন। ওই দুটো ব্যাপারে খোঁজখবর পেয়ে গিয়েছেন সব?'

মধুসূদনবাবু সসঙ্কোচে সামনের চেয়ারে বসার পরে বললেন, 'যতটা যা জেনেছি, জানিয়ে যাচ্ছি। পরে আরও কিছু জানতে পারলে জানিয়ে দেব।'

সামনের ফাইলটা একপাশে সরিয়ে রেখে কৌশিক বেশ আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞেস করল, 'বলুন, কী জেনেছেন?'

'ওই যে বুলা নামে যে মেয়েটা খুন হয়েছে বিয়ের রাতে— ওর কাকা প্রসেনজিৎ রায় লোকটা মোটেই সুবিধের নয়। নানারকম দোষ আছে ওর। এক নম্বরের জুয়াড়ি। সাট্টা থেকে ঘোড়া— সব ব্যাপারেই আছে। বুঝতেই পারছেন একটা জুয়াড়ি লোকের সবচেয়ে বেশি দরকার টাকার। সেই টাকার যোগানটা ওর ভাল পথ থেকে আসে না।'

'কিরকম?'

'আবগারিতে কাজ করে। প্রচণ্ড ঘুষখোর। একবার সাসপেন্ডেড হয়েছিল। কিন্তু স্বভাব একটুও শোধরায়নি। খবর পেয়েছি আর একবার চার্জশিট খাওয়ার আগেই চাকরি ছেড়ে দেবে।'

'চাকরি ছেড়ে করবে কি?'

'ব্যবসা।'

'ব্যবসা! কিসের ব্যবসা?'

'কাপড়ের।'

'দাদার ব্যবসায় ঢুকবে ?'

রহস্যপূর্ণ একটা হাসি ফুটে উঠল এবার অতিমাত্রায় বিনীত ইনফর্মার মধুসূদনের মুখে। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে বলল, 'দাদার কারবারে আর ঢোকার দরকার হবে না, এই ব্যবসাটা ওর নিজেরই। ওদের পরিবারের কাজকম্ম করে যে উকিল, তার মুহুরিকে ধরেছিলাম। কিছু টাকা-পয়সা খাইয়েছি, তা ওই সব খবর বার করে দিয়েছে।'

'কী খবর ?'

'ওদের ব্যবসার ডিড্ উকিলবাবুরই করা। ডিডে আছে— ওদের ধর্মতলার দোকানের মালিকানা বুলার। তবে বিয়ের আগে ওর মৃত্যু হলে মালিকানা চলে যাবে ওর কাকা প্রসেনজিতের কাছে। আসলে প্রসেনজিতের দাদা অরিজিৎ, অত্যন্ত সৎ প্রকৃতির মানুষ, ভাইকে ব্যবসার একটা অংশ দিতে চেয়েছিল ; কিন্তু ভাই নিতে রাজি হয়নি। তখন ডিড ওই ভাবে তৈরি হয়। বুলার বিয়ে হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু ও বিয়ে তো আর বিয়ে নয়। তার ফলে এখন ধর্মতলার ওই কাপড়ের দোকানের মালিক হল প্রসেনজিৎ রায়।'

মধুসূদনের সব কথা শুনতে শুনতে গোয়েন্দার দৃষ্টি ধারালো আর চোয়াল কঠিন হয়ে উঠেছিল। একটু বাদেই জিজ্ঞেস করল, 'ঝির্মলি নামের ওই মেয়েটার কোনও খবর পেয়েছেন ?'

শান্ত মুখে উত্তর দিল মধুসূদন, 'আজ্ঞে কিছুটা পেয়েছি। আরও কিছু খবর মনে হয় আজকালের মধ্যেই পেয়ে যাব।'

'মেয়েটার কি সবে বিয়ে হয়েছে ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি যেটুকু যা জেনেছেন, ঠিকই জেনেছেন। বিয়ের পর নতুন বর-বউ হনিমুন করতে গেছে বাঙ্গালোরে। বাঙ্গালোর থেকে উটিতে যাবে। দিন দশ-বারোর বেড়ানো। মেয়েরা বিরাট বড়লোক। মেয়ের বাপের প্লাইউডের ব্যবসা আছে। তবে ঢের বেশি বড়লোক হল বরপক্ষ। বিদেশে হায়দ্রাবাদি মুক্তোর এজেন্ট। কিন্তু খুব বনেদি পরিবার বলে ওদের মধ্যে কোনও বড়লোকি চাল নেই। মেয়ের বাবা শুনলাম পরশুদিন প্লেনে চেপে বাঙ্গালোর গেছে।'

গোয়েন্দার দৃষ্টি ধারালো হয়ে উঠেছিল আবার। 'বাঙ্গালোরে কেন ?'

'হয়তো ব্যবসার কাজে।'

'এটা তো আপনার অনুমান। আপনি আসল কারণটা জানার চেষ্টা করুন তো।'

'আমি লোক ফিট করে রেখেছি। মনে হয় আজকালের মধ্যে আপনাকে আরও কিছু খবর দিতে পারব। একটু বেশি রাতের দিকে বাড়িতে ফোন করলে অসুবিধে হবে না তো ?'

'না-না, যখন খুশি আপনি ফোন করতে পারেন। শুনুন আর একটা কাজ করতে হবে—।' এই পর্যন্ত বলার পরে ফোলিও ব্যাগ খুলে একটা ছবি বার করল গোয়েন্দা, তারপর সেটা মধুসূদনের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'খুব খুঁটিয়ে দেখে নিন ছবির মানুষটাকে।'

মধুসূদন ছবিটা দেখা শুরু করতেই রাইটিং প্যাড টেনে নিয়ে গোয়েন্দা খসখস করে

একটা ঠিকানা লিখল। একটু পরে ঠিকানাটা মধুসূদনের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'যার ফোটোগ্রাফ দেখলেন, এটা হচ্ছে তার ঠিকানা। এর সম্পর্কে যতটা পারেন খোঁজখবর জোগাড় করে দেবেন।'

'কবে চাই ?'

'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।'

মধুসূদন বিনীতভাবে মাথা কাত করে উত্তর দিল, 'ঠিক আছে।'

গোয়েন্দা ফোলিও ব্যাগ হাতড়ে খুদে-খুদে হরফে বেশ কয়েকটা ঠিকানা-লেখা একটা কাগজ বার করে মধুসূদনের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'এখানে সাত-আটটা ঠিকানা আছে—যার বিষয়ে আপনাকে খোঁজখবর নিতে বলেছি, তার বোধহয় এই সব ঠিকানায় যাতায়াত আছে। কেন যায়, ওইসব মানুষের সঙ্গে লোকটার কী সম্পর্ক--- এ সম্পর্কেও কিছুটা খোঁজখবর নিতে হবে আপনাকে।'

ঠিকানা-লেখা কাগজটাব দিকে তাকাতেই একটু যেন আলো খেলে গেল মধুসূদনের মুখে। 'আপনি যার বিষয়ে খোঁজখবর নিতে বলছেন, সেই লোকটা কি সুদের কারবার করে ?'

'এ কথা আপনার মনে হচ্ছে কেন ?'

'তিনজন সুদের কারবারিকে আমি জানি। ওদের খাতায় ঠিকানা লেখার শেষে এই ধরনের টান দেখেছি। ঠিকানাব পাশে বিভিন্ন সংখ্যা লেখা থাকে, ওইগুলো হচ্ছে কিস্তির হিসেব।'

গোয়েন্দার চোখ ঝলমল করে উঠল। 'বাহ্! আপনি তো দেখছি খুব ভাল অবজারভ্যান্ট। আপনার দেখার চোখ আছে। সুদের কারবার লোকটা করে বলে শুনিনি। তবে এটা তো বেআইনি কারবার, লুকিয়ে-লুকিয়ে করলেও করতে পারে।'

মধুসূদন ওই ছবিটা টেবিলের ওপর রেখে দিয়েছিল, ছবিটা তুলে নিয়ে গোয়েন্দা বলল, 'যদি দরকার হয়, এই ছবির একটা কপি আপনাকে করিয়ে দিতে পারি। লাগবে ?'

দু'দিকে মাথা নাড়াতে নাড়াতে মৃদু গলায় জবাব দিল মধুসূদন, 'বেকার খরচাপাতি করে কী লাভ। যা দেখার তা আমি দেখে নিয়েছি, ওই মুখ চট করে আর ভুলছি না। ঠিক আছে, আজ তাহলে আসি। এক জায়গায় ছুটতে হবে এখন।'

'আসুন। আমার খবরগুলো কিন্তু খুব জরুরি। কিছু জানতে পারলেই জানাবেন। অসুবিধে থাকলে, ফোন করে।'

আর একবার 'ঠিক আছে' বলে বিদায় নিল ইনফর্মার।

রাস্তার বাঁকে মধুসূদন পুরকাইত মিলিয়ে যেতেই গোয়েন্দা টেলিফোন টেনে নিয়ে ডায়াল করল। ওপাশ থেকে 'হ্যালো' ভেসে আসতেই কৌশিক বলল, 'আমি কি অভিনেতা সব্যসাচী সরকারের সঙ্গে কথা বলতে পারি ?'

সঙ্গে সঙ্গে ওপাশের মানুষটি বলে উঠল, 'আমি কি শৌখিন গোয়েন্দা কৌশিক মিত্রের সঙ্গে কথা বলছি ?'

হা-হা করে হেসে উঠে কৌশিক বলল, 'কদ্দিন বাদে ফোন করলাম, অথচ গলা শুনেই তুমি আমাকে চিনতে পারলে!'

সব্যসাচীও হাসল। 'একজন অভিনেতার কাছে কণ্ঠস্বর সব চাইতে বড় ব্যাপার। শ্রেফ গলার স্বর দিয়েই যে মানুষটা দুঃখকষ্ট, প্রেম-ভালবাসা, রাগবিরক্তি, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, আশা-হতাশা সব বোঝাতে পারে— সেই হচ্ছে সত্যিকারের বড অভিনেতা। এক্সপ্রেশন-টেক্সপ্রেশন পরের ব্যাপার। সুতরাং কণ্ঠস্বরের ওপর আমাদের সব সময় বাড়তি মনোযোগ দিতেই হয়। তা বলো, কী জন্যে হঠাৎ মনে পড়ল আমাকে?'

'অভিনেতাকে দিয়ে অভিনয় করানোর জন্যেই স্মরণ করেছি।'

'কোথায়? অফিস-রিক্রিয়েশন ক্লাবে? শোনো বাবা, ওসবের মধ্যে আমি আর নেই।'

'তুমি এখন অনেক বড় মাপের অভিনেতা। অফিস বা পাড়ার ক্লাবে খেপ মারা তুমি যে ছেড়ে দিয়েছ— সেটা আমি খুব ভালভাবেই জানি। অন্য জায়গায় অভিনয় করানোর জন্যেই ফোন করেছি।'

'কোথায়? টিভি সিরিয়াল, না ফিচার ফিল্ম?'

'ওসব তো ছোটখাটো ব্যাপার, তোমাকে আর রিয়েল লাইফ অ্যাকটিংয়ে চাই।'

'মানে?'

'মানে বোঝাবার জন্যে সকাল সাড়ে-সাতটা নাগাদ তোমার বাড়িতে যাচ্ছি, থাকবে তো?'

'আছি, নো প্রবলেম। আমার অফিসটা একেবারে মামার বাড়ির মতো। দেরিতে যাই, কিন্তু তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ি।'

'ভেরি গুড। কাল আসছি।'

টেলিফোন নামিয়ে রেখে পকেট থেকে ছোট্ট ডায়েরিটা বার করে পাতা ওলটাতে শুরু করে দিল গোয়েন্দা। এখন আর একটি কাজ বাকি।

কাজ মেটাবার জন্যে অফিস বন্ধ করল গোয়েন্দা, তারপর একটা ট্যাক্সিতে চেপে সোজা ধর্মতলা।

ধর্মতলার চেনা রাস্তায় কিছুটা হাঁটতেই পৌঁছে গেল সান্ধ্য দৈনিক 'সিটি হেরাল্ড'-এর অফিসে। পত্রিকার মালিক-কাম সম্পাদক অরবিন্দ সেন কৌশিককে দেখে হইহই করে অভ্যর্থনা জানালেন। উত্তরে গোয়েন্দা লাজুক মুখে হাসল।

প্রবীণ সম্পাদক কী যেন বলতে গিয়ে হাতঘড়ির দিকে তাকালেন, তারপরেই রীতিমত মিইয়ে গিয়ে বললেন, 'এই রে! আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম—!'

'কী ভুলেছেন! কোথাও কি যাওয়ার কথা ছিল?'

'ছিল নয়, আছে। আমার এক নাতনির জন্মদিন। আমি যাওয়ার পরে জন্মদিনের কেক কাটা হবে। বড্ড ছেলেমানুষ, আমি না গেলে হয়তো কান্নাকাটিই শুরু করে দেবে।'

'তাহলে তো আপনার এখনই বেরিয়ে পড়া দরকার।'

'কিন্তু তুমি এলে, আর আমি—।'

'তাতে কী হয়েছে, পরে একদিন আসব।'

'সে তো আসতেই পারো, কিন্তু আজ নিশ্চয়ই কোনও কাজে এসেছিলে?'

'কাজ মানে আপনার লাইব্রেরিটা একটু ব্যবহার করতাম—।'

'তাহলে এক কাজ করো। তুমি তোমার মতো কাজ করো লাইব্রেরিতে, কাজ হয়ে গেছে দরজায় ওই তালাটা লাগিয়ে চাবি দিয়ে যেও দারোয়ানের কাছে। দারোয়ানের ঘর এর ঠিক নীচেই।'

'আমি চিনি ওর ঘরটা।'

'ব্যস, তাহলে আর কোনও সমস্যা থাকছে না। মনের আনন্দে যতক্ষণ খুশি কাজ করো, আমি দারোয়ানকে বলে যাচ্ছি। তুমি কিন্তু শিগ্‌গিরই একদিন এসো।'

অরবিন্দবাবু চলে যেতেই সান্ধ্য দৈনিকের বিচিত্র এক অফিসটা চারদিক থেকে কেমন যেন চেপে ধরল কৌশিককে। এ দিকের ঘরটা পুরনো দিনের পত্র-পত্রিকায় ঠাসা। পুরনো দিনের বিবর্ণ কাগজ আর ওই কাগজে জমে-থাকো ধুলোর গন্ধ নাকে এসে লাগছিল। বিপদের কোনও গন্ধ থাকে কি না কে জানে! কিন্তু গোয়েন্দার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় হঠাৎই বলে উঠল— একটা বিপদ ঘনিয়ে আসছে ধীরে ধীরে!

।। তেরো ।।

হাজরার মোড়ে এসে যখন দাঁড়াল কৌশিক, তখন ওর ঘড়িতে ঠিক নটা দশ। হালকা শীতের বাতাস বইছে। আকাশে চকচকে রোদ। দু'দিন বেশ মেঘলা ছিল, ঝিরঝির করে বৃষ্টিও পড়েছে। স্যাঁতসেতে আবহাওয়া কেটে যাওয়ার পরে রোদ উঠলে খুব ভাল লাগে। ফুটপাথের এক ধারে রোদের মধ্যে কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকার পরে পকেট থেকে ওর ছোট্ট ডায়েরিটা বার করল গোয়েন্দা। আজকের কাজের তালিকার মাথায় অভিনেতা সব্যসাচী সরকারের নাম লেখা। অ্যাপয়েন্টমেন্টের সময় সকাল সাড়ে-সাতটা। ডটপেন দিয়ে নামটা কেটে দিল কৌশিক। দিনের প্রথম কাজ শেষ।

এক ঘন্টা ধরে কথা হয়েছে সব্যসাচীর সঙ্গে। অভিনেতা ওর প্রস্তাবে রাজি। হাসতে হাসতে বলেছে: তুমি ডিরেক্টর, আমি অভিনেতা। যে ভাবে চলতে বলবে, সেই ভাবেই চলব। কতটা কী পেরে উঠব জানি না, তবে আমার তরফে চেষ্টার কোনও ত্রুটি হবে না।

সব্যসাচী বয়েসে কয়েক বছরের বড় কৌশিকের চাইতে, কিন্তু বয়েসটা ওদের বন্ধুতায় কখনও বাধা হয়ে ওঠেনি। দারুণ আড্ডাবাজ সব্যসাচী। চট করে যে-কারও গলা নকল

করতে পারে। অধিকাংশ মানুষেরই কিছু-না-কিছু মুদ্রাদোষ থাকে, সেগুলো ওর দৃষ্টি এড়ায় না কখনও। সব্যসাচীর মজাদার কথার কিছু টুকরো থেকে থেকেই গোয়েন্দার কানে বাজছিল।

আজকের কাজের তালিকায় দ্বিতীয় নাম—শশাঙ্ক সেন। ঘড়ির দিকে আর একবার তাকিয়েই একটু চঞ্চল হয়ে উঠল গোয়েন্দা। একটু বাদেই অফিসের ভিড় শুরু হয়ে যাবে। লম্বা পায়ে কিছুটা হেঁটে গিয়ে একটা ট্যাক্সিতে উঠে পড়ল ও। ট্যাক্সিওয়ালা ঘাড় ঘোরাতেই বলল, 'হেদো।'

রাস্তায় যানবাহনের ভিড় এখনও শুরু হয়নি। ট্যাক্সি বেশ জোরেই ছুটে চলেছিল। মাস্টার ক্রিমিনোলজিস্ট শশাঙ্ক সেনেব বাড়িতে কৌশিকের পৌঁছনোর কথা দশটা নাগাদ। আর একবার ঘড়ির দিকে তাকাল ও। রাস্তায় অস্বাভাবিক জ্যাম না থাকলে ঠিক সময়েই পৌঁছে যাবে। ট্যাক্সির সিটে হেলান দিয়ে চোখ বুজল গোয়েন্দা। মাথার মধ্যে কত রকমের অঙ্ক। গোয়েন্দার প্রথম কাজ হল অপরাধের সূত্র ধরে ঠিক পথে এগোনো। পথ ঠিক হলে একটা সূত্র আর একটা সূত্রের জোগান দেয়। পথ আর হিসেব ঠিক থাকলে অপরাধী ধরা সম্ভব, না হলে কিছুতেই নয়। মনে মনে রহস্য সন্ধানের পথটা দেখতে দেখতে দশটার একটু আগেই হেদোয় পৌঁছে গিয়েছিল কৌশিক।

ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে, ট্রাম রাস্তা পেরিয়ে শশাঙ্কবাবুর বাড়ির দিকে এগোতে লাগল গোয়েন্দা। পুরনো পাড়ার পুরনো চেহারা। চল্লিশ-পঞ্চাশটা বছর পেরিয়ে যাওয়ার ছাপ ধরেছে বাড়িব গায়ে, কিন্তু বোধহয় আর কোনও রকমের পবিবর্তন ঘটেনি।

ডানদিকের একটা গলিতে ঢুকে দ্বিতীয় বাড়ির দরজার কড়া নাড়তেই দরজা খুললেন বিখ্যাত ক্রিমিনোলজিস্ট শশাঙ্ক সেন। গায়ে অ্যাপ্রন, মাথায় টাক, মাঝবয়সী রাশভারী এই মানুষটিকে হঠাৎ দেখলে অনেকেই ডাক্তার বলে ধরে নেবে। কৌশিকের সঙ্গে শশাঙ্কবাবুর অনেক দিনের পরিচয়। ও একটু হেসে বলল, 'আপনি দেখছি সাতসকালেই ল্যাবরেটরিতে ঢুকে পড়েছেন।'

হালকা একটা হাসির রেখা ফুটল শশাঙ্কবাবুর মুখে। অ্যাপ্রনের হাতা একটু গুটিয়ে নিয়ে বললেন, 'যার যা পেশা। কাজের চাপ থাকলে ল্যাবে না ঢুকে উপায় কী? এসো, ঘরে এসো।'

দ্বিতীয় ঘরটা শশাঙ্ক সেনের বসার ঘর। ছোট্ট এই ঘরটার পাশেই ওর বড়সড় ল্যাবরেটরি।

শশাঙ্কবাবু কৌশিককে সোফায় বসার ইঙ্গিত করে বললেন, 'বলো, এ বার তোমার কী সেবা করতে পারি আমি?'

লাজুক মুখে উত্তর দিল কৌশিক, 'আমার সব সেবা জনসেবা শশাঙ্কদা।'

'ঠিক আছে, এখনকার জনসেবাটা কী?'

গোয়েন্দা হাতের ব্যাগ থেকে চারটে চিঠি বার করল। গোটা-গোটা হরফের বাংলা চিঠি। ওগুলো ক্রিমিনোলজিস্টের দিকে এগিয়ে দিয়ে গোয়েন্দা বলল, 'শশাঙ্কদা, আমার মনে হয়, এই চিঠি-চারটের মধ্যে কিছু জালিয়াতি আছে। এগুলো ল্যাবে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে হবে আপনাকে।'

চিঠিগুলো হাতে নিয়ে শশাঙ্কবাবু বললেন, 'বেশ, আর কী হুকুম?'

'আমি আবার আপনাকে কী হুকুম দেব। আমি তো আপনাদের হুকুম তামিল করার ন্যে রেডি হয়ে আছি সব সময়। আচ্ছা শশাঙ্কদা, ওই বুলা নামের মেয়েটার পোস্ট-মর্টেম রপোর্টটা তো কমপ্লিট। না?'

'হ্যাঁ, বলেছি তো তোমাকে—। ইট্‌স আ কেস অব স্ট্র্যাঙ্গুলেশন। আমার যেটুকু যা রীক্ষা করাব, তাও হয়ে গেছে।'

'আপনার ফাইন্ডিংস কী?'

'মেয়েটাকে গলা টিপে মারা হয়েছে। ওই খুনির ফিঙ্গারপ্রিন্টও পেয়ে গিয়েছি পরিষ্কার।'

'আর কিছু?'

'আরও কিছু-কিছু ফাইন্ডিংস আছে, রিপোর্টটা উপস্থিত আমার কাছে নেই। পরে দেখে য়ে জানাব। এই চিঠিগুলোর রিপোর্টটা কবে দরকার তোমার?'

'কবে দিতে পারবেন?'

'হাতে কয়েকটা কাজ আছে। দিন-তিনেকের আগে তোমার কাজ ধরতে পারব বলে নে হয় না। দিন-চারেক বাদের ফোন কোরো একবার।'

'আপনার কি এখন জরুরি কাজ চলছে?'

'খুবই জরুরি। এতটাই জরুরি যে তোমার সঙ্গে বসে একটু গল্প করব—তার উপায়ও নই।'

বিব্রত মুখে কৌশিক বলল, 'না-না, আপনি কাজ করুন এখন। আমি ফোন করব রে।'

মৃদু হাসলেন গোয়েন্দার শশাঙ্কদা। 'ঠিক আছে, আজকের আড্ডাটা ডিউ থাকল। পরে ষিয়ে নিতে হবে একদিন।'

পার্কের পাশ দিয়ে কিছুটা হাঁটার পরে একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেল কৌশিক। কোথায় যতে হবে ট্যাক্সিওয়ালাকে বলে দেওয়ার পরে ট্যাক্সির সিটে বেশ লম্বা করে হেলান য়ে বসল। ওর চোখের সামনে কেমন যেন আলো-আঁধারি ছক। আলোর চাইতে অবশ্য ন্ধকারই বেশি।

এই সময় রাস্তা এত ফাঁকা থাকার কথা নয়। ট্যাক্সিওয়ালা আবার কোথাও-কোথাও লিঘুঁজি দিয়ে শর্টকাট মারছিল। তার ফলে লম্বা পথ ফুরিয়ে গেল চট করে। সামনে ার একটা মোটে বাঁক, ওই বাঁকটা পেরুলেই গোয়েন্দার অফিস্।

বাঁকের কাছে আসতেই পকেটে হাত ঢুকিয়ে অফিসের চাবি বার করে নিয়েছিল কৌশিক। ন্তু এ কী! অফিস খোলা কেন?

ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দু-পা এগোতেই মুখার্জিবাবুকে দেখা গেল। গোয়েন্দার প্রবীণ হকারী মুখার্জিবাবু মুখের সবক'টি দাঁত বার করে হাসছিলেন।

লম্বা পায়ে আরও কিছুটা এগিয়ে এসে গোয়েন্দা বলল, 'আপনি! কবে ফিরেছেন াপনি?'

'আজ সকালে, হাওড়া মেলে। ট্রেনে ওঠার আগে আপনাকে টেলিফোনে ধরবার চেষ্টা রেছিলাম বেশ কয়েকবার। পারিনি। আবার সেই ক্যাসেট—অল লাইন্‌স আর বিজি—।

আমার ওখানে আর কিছু করার ছিল না। ট্রেনে বার্থ রিজার্ভেশনও পেয়ে গেলাম, চলে এলাম তাই।'

হাসিখুশি মানুষটিকে দেখে গোয়েন্দাও বেশ খুশি হয়েছিল। 'ঠিক করেছেন। কাজ মিটে গেলে শুধু শুধু আর ওখানে বসে থেকে কী করবেন! তা, কী কাজ মিটল, শুনি?'

'একটু কফি খাবেন তো? নিয়ে আসব?'

দরাজ গলায় জবাব দিলেন গোয়েন্দা, 'আনুন।'

বড়সড় কাহিনী গুছিয়ে বলার আগে একটু কফি-তেষ্টা পেয়ে থাকে সহকারীটির—এই তথ্য গোয়েন্দার জানা আছে।

কফি-শপ এই অফিসের খুব কাছেই। চটপট দু-কাপ কফি নিয়ে এলেন মুখার্জিবাবু। এক কাপ গোয়েন্দার হাতে ধরিয়ে আর এক কাপ নিজে নিয়ে বেশ আয়েশ করে বসলেন সামনের চেয়ারে। কফির কাপে শব্দ করে দুটো চুমুক মারার পরে পরিতৃপ্তির আওয়াজ বার হল মুখার্জিবাবুর মুখ থেকে, তারপর গলায় একটু জোর এনে বললেন, 'দক্ষিণকে কফির দেশ বলা হয়ে থাকে, কিন্তু যাই বলুন আর তাই বলুন, আমাদের কফির কাছে ওদের কফি দাঁড়াতে পারে না।'

মুচকি হাসল গোয়েন্দা। 'কিন্তু আপনি এখন যে কফিটা খাচ্ছেন সেটাও তো দক্ষিণ ভারতের।'

'তাই! না-না, তা কী করে হয়। ওখানকার কফি আমার একেবারেই সুবিধের ঠেকত না। কিন্তু এখানকার কফি—আহ্!' কফিতে আর একটা চুমুক দিয়ে কেমন যেন প্রমাণ দাখিলের ভঙ্গিতে প্রগাঢ় তৃপ্তির একটা শব্দ বার করলেন মুখার্জিবাবু। তারপর গলার স্বর আর একটু তুলে বললেন, 'ওখানকার খাবারদাবারও আমাদের জিভে রোচে না। ইডলি, সম্বর, রসম, টক দই— খাবার বলতে এই সবই।'

'কেন, ওখানে এখন তো উত্তর ভারতের খাবারদাবারও পাওয়া যায়।'

'যায়, তবে খুব বেশি দোকান নেই। সব দোকানে আবার সমান টেস্টও আনতে পারে না। ওহ্! একদিন বাঙ্গালোরে সেই বিখ্যাত আর বিতর্কিত কেন্টাকি ফ্রায়েড চিকেন খেলাম। টেরিফিক! দারুণ খেতে। কে এফ সি-র দোকান এ দেশে বাঙ্গালোর ছাড়া আর কোথাও বোধহয় খুলতে দেওয়া হয়নি।'

গোয়েন্দা হেসে বলল, 'শিগ্‌গিরই মনে হয় আমাদের ফাস্ট ফুট সেন্টারগুলোয় কেন্টাকির চিকেন, জার্মানির হ্যামবার্গার ছড়িয়ে পড়বে। ওগুলো খাওয়ার পরে একটা পেপসি বা কোক। ব্যস, বিলিতি ধাঁচে কাজের দিনের ফাস্‌ক্লাস একটা লাঞ্চ হয়ে যাবে। খাবারদাবার, পানীয়, পোশাকআশাক সব বিদেশেব, শুধু দিল্ হ্যায় হিন্দুস্থানি।'

মুখার্জিবাবু একটু যেন তেতে উঠে বললেন, 'জিনিস ভাল হলে কেন খাব না বলুন তো? দরজা বন্ধ করে দিয়ে কি কোনও দেশ উন্নতি করতে পেরেছে? দরজা খুলে দাও: সবাই কম্পিটিশনের মধ্যে আসুক। আমরা খদ্দের, যেখানে ভাল জিনিস পাব সেখানেই ছুটব। আপনিই বলুন না, প্রতিযোগিতা ছাড়া কি কোনও দেশের উন্নতি সম্ভব?'

গোয়েন্দার হাসি এবার বেশ চওড়া হল। 'আপনি যে প্রসঙ্গ তুলেছেন তাই নিয়ে সাতদিনের কনফারেন্স বসতে পারে। যে কাজে বাঙ্গালোর গিয়েছিলেন সেটার কথা বলুন এবার।'

তর্ক করার ভাবটা মিইয়ে গেল সহকারীর। কফিতে আর একটা চুমুক দিয়ে মুখার্জিবাবু বললেন, 'ওই অপূর্ব চক্কোত্তি লোকটা একেবারে বখে গেছে। দিনরাত্তির নেশাভাঙ। ওর বাড়ির ঠিক উল্টোদিকের গেস্ট হাউসটায় ছিলাম তো লাস্ট দুটো দিন। খুব ভাল করে নজর করেছি। কখনও সোজা হয়ে হাঁটতে পর্যন্ত দেখেনি। নেশায় চুর হয়ে আছে। চেহারা আগে কেমন ছিল জানি না, তবে এখন তো রোগাপটকা। চোখ ভাল করে খুলতেই পারে না। সকাল থেকেই বোধহয় বোতল খুলে বসে।'

সহকারীর কথা শুনতে শুনতে গোয়েন্দার চোখমুখ কেমন যেন কঠিন হয়ে উঠেছিল। মুখার্জিবাবু থামতেই মৃদু গলায় বলল, 'নেশাটা বোতলের নাও হতে পারে।'

'তবে কিসের ?'

প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে গোয়েন্দা জিজ্ঞেস করল, 'আপনি যে অপূর্বর ওম্যানাইজিংয়ের কথা বলছিলেন—।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, গুণের অভাব নেই লোকটার। আমি দুদিনে পাঁচটা মেয়েকে ঢুকতে দেখেছি ওর বাড়িতে।'

'পাঁচটা মেয়ে! একসঙ্গে ঢুকেছিল ?'

'না-না, আলাদা-আলাদা। প্রথমে দুজনে একসঙ্গে, তারপর আবার দুজন, শেষদিন একটা মেয়ে।'

গোয়েন্দার কপালে ভাঁজ পড়েছিল কয়েকটা। 'ওরা যে বাজে মেয়ে, কী করে বুঝলেন ?'

'বোঝা খুব সহজ। প্রতিবারই সেই এক দৃশ্য। অপূর্বর বাড়ির সামনে ছোট্ট একটা কম্পাউন্ড, বাইরে বড় গেট। সেই গেটের ভেতর দিয়ে গাড়ি ঢুকে বাড়ির দরজার সামনে দাঁড়াচ্ছে। গাড়ি থেকে নামছে দুটো মেয়ে সঙ্গে একটা আধবুড়ো এসকর্ট। ওই লোকটা মেয়েদুটোকে পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসছে। গাড়িতে ড্রাইভারের পাশে গুণ্ডাগোছের একটা লোক। একটামাত্র মেয়েকে পৌঁছবার দিনেও ওই একই দৃশ্য।'

'প্রতিবারই কি এক গাড়িতে চেপে ওরা এসেছিল ?'

'না। তিনটে আলাদা-আলাদা গাড়ি। মারুতি, অ্যামবাসাডর আর ওপেল অ্যাস্ট্রা।'

'গাড়ির নম্বরগুলো নিয়েছেন ?'

'নিয়েছি।'

'মেয়েগুলো কতক্ষণ ছিল বাড়ির ভেতরে ?'

প্রশ্ন শুনে রীতিমত অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন মুখার্জিবাবু। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে বললেন, 'এইরে, সেটা তো খেয়াল করিনি।'

'মেয়েগুলোকে পৌঁছে দিয়ে গাড়ি-তিনটে কি ওখানেই কোথাও পার্ক করেছিল ?'

'না-না, কোনও গাড়িই দাঁড়িয়ে থাকেনি ওখানে। ওই তো মেয়েদের সঙ্গে দালালগোছের

লোকটা নামল। তারপর বাড়ির ভেতরে ওদের ছেড়ে এসে গাড়িতে উঠল। তারপরেই গাড়ি চলে গিয়েছিল।'

'মেয়েগুলোকে ফেরত নেওয়ার জন্যে গাড়ি আর ফিরে আসেনি?'

'না তো।'

'ওরা বেরুল কখন? মানে, ওই বাড়িতে ঢোকার কতক্ষণ পরে?'

প্রশ্নের ধাক্কায় আর একবার বিব্রত হলেন মুখার্জিবাবু। একটু মাথা চুলকে বললেন, 'সেটা তো খেয়াল করিনি।'

'আপনি কি টানা নজর রেখেছিলেন?'

'হ্যাঁ, একটানা বহুক্ষণ। নজরদারি করার ব্যাপারে আমার কোনও অসুবিধেও ছিল না। আমার গেস্ট হাউসটা ছিল অপূর্বর বাড়ির ঠিক উল্টোদিকে। দোতলার ঘর পেয়েছিলাম। কাচের জানলা। জানলায় পর্দা। পর্দার ফাঁক দিয়ে ওই বাড়ির ওপর নজর রাখায় কোনও কষ্ট নেই। আমার ডিউটিতে কোনও ফাঁকি ছিল না।'

'না-না, আমি সে-কথা বলছি না। আচ্ছা, অপূর্বর বাড়ির পেছনদিকে কি কোনও গেটটেট আছে?'

'নেই। সেটা আমি আগেই দেখে নিয়েছিলাম। মস্ত বড় বাড়িটা একমানুষ উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা।'

'কোনও একটা অছিলায় কিংবা লুকিয়েচুরিয়ে ওই বাড়ির ভেতরে একবার ঢুকতে পারলেন না?'

'চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু পারিনি। বাড়িতে একটামাত্র লোক থাকে, কিন্তু কি সিকিউরিটি! চারদিকে পাহারাদার। আসলে প্রচুর টাকার মালিক হলে আর স্বভাবচরিত্তির খারাপ হলে যা হয়, তাই হয়েছে। নেশাভাঙ আর ফস্টিনস্টি গোপন করার জন্যে একগাদা পাহারাদার বসিয়ে দিয়েছে বাড়িতে।'

'একটা মেয়েকেও তা হলে ও বাড়ি থেকে বেরুতে দেখেননি?'

শুকনো মুখে দু'দিকে মাথা নাড়ালেন মুখার্জিবাবু।

গোয়েন্দার কপালে বেশ কয়েকটা ভাঁজ পড়েছিল। সামনের রাইটিং প্যাডের ওপর ডটপেন দিয়ে এলোমেলো ভাবে দাগ কাটতে কাটতে একটু বাদে জিজ্ঞেস করল, 'ঝিমলি নামের মেয়েটাকে আর তো দেখতে পাননি?'

'না। মাঝবয়সী ওই ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলা মেয়েটিকে হোটেল থেকে নিয়ে গিয়েছিলেন। মনে হয় আত্মীয়। তবে ওর বরটাকে একেবারেই সুবিধের ঠেকেনি।'

'কেন, সুবিধের নয় বলে মনে হচ্ছে কেন?' গোয়েন্দার প্রবীণ সহকারীর মুখে এবার একটা সবজান্তার ভাব ফুটে উঠল। 'আজকালকার ছেলেছোকরাকে আমার খুব ভালমতন চেনা আছে। কেরিয়ার ছাড়া ওরা আর কিছু বোঝে না। ওই ছেলেটা চাকরি না ব্যবসা কী করে জানি না— তবে খোঁজ নিয়ে দেখবেন, ও ওই সব ব্যাপারেই ফায়দা তোলার

জন্যে বউকে আত্মীয়ের হাতে ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় দৌড়েছে। কাজ মিটে গেলে ফিরবে। মধুচন্দ্রিমাটন্দ্রিমাকে ওরা খুব একটা পাত্তা দেয় না। আপনার কী মনে হয়? আমার ধারণা কি ভুল?'

শুকনো হাসি হেসে গোয়েন্দা বলল, 'ঠিক হতে পারে, আবার—।

'আবার কী?'

'ভুলও হতে পারে।'

বিচিত্র এই উত্তরটা শুনে মিইয়ে গেলেন মুখার্জিবাবু। 'কিন্তু এটা তো আমার অনুমান—।'

'আমিও তো সেই কথাই বলছি। শুনুন, এর মধ্যে একটা ঝক্কি চেপেছে আমার ঘাড়ে। এ-ভাবে বলাটা অবশ্য ঠিক নয়, আমার এক বন্ধু ওড়িশার ভদ্রকে থাকে, আজ-কালের মধ্যেই এসে যাবে কলকাতায়। ওকে একটু সাহায্য করতে হবে আপনাকে।'

'কী ধরনের সাহায্য?'

'বিয়ের ব্যাপারে। ওর এক আত্মীয়ার বিয়ের জন্য বিজ্ঞাপন দিয়েছে কাগজে, তো, যোগাযোগের জন্য একটা টেলিফোন নম্বর চাইছিল। আমি আপনারটা দিয়ে দিয়েছি।'

'আমার টেলিফোন কোথায়! ও তো বাড়িওয়ালার।'

'আপনার বাড়িওয়ালা তো এখন কনস্ট্রাকশনের কাজে মাসের মধ্যে বিশদিন কলকাতার বাইরে থাকছেন। ওঁর সঙ্গে তো আপনার সম্পর্ক খুব ভাল।'

'তা ভাল, তবে—।'

'চিন্তার কোনও কারণ নেই। ওই ফোন থেকে ফোন করা হবে না। ফোন কল রিসিভ করা হবে শুধু, তাও মাত্র একটা দিনের জন্য। আমি ধরে নিয়েছিলাম, এর মধ্যে আপনি বাঙ্গালোর থেকে ফিরে আসবেন। সেটা ভেবেই আপনার ফোন নাম্বার দেওয়া। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন বেরুবে সামনের রোববার। একটা দিনের কাজ শুধু। বিজ্ঞাপনের জবাবে ফোন আসবে বেশ কিছু। আপনার কাজ হবে পাত্রপক্ষের নামধাম আর ফোন নম্বরটা টুকে নেওয়া। আমার বন্ধু অবশ্য সকালবেলাতেই আপনার বাড়িতে পৌঁছে যাবে। পৌঁছবার পরে ফোন রিসিভ করার কাজটা ওই করবে। ওকে দেখতে বেশ হ্যান্ডসাম। লম্বা, গালভর্তি দাড়ি। আপনার চেহারার বর্ণনাও দিয়ে দিয়েছি ওকে। দুজনে দুজনকে দেখামাত্র চিনে ফেলবেন।'

'চেনানোর কী দরকার! আপনি আপনার বন্ধুকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবেন।'

'আরে, আমি ওই সময় কলকাতায় থাকলে আপনাকে কি আর ঝক্কির মধ্যে ফেলতাম! রোববার থেকে দিন চার-পাঁচ কলকাতার বাইরে থাকতে হবে। আমার কাজের ছেলেটাকেও ছুটি দিয়ে দিচ্ছি। ওই সময় কটা দিন দেশ থেকে ঘুরে আসুক।'

'কোথায় যাচ্ছেন আপনি?'

'প্রথমে যাব শান্ত একটা পল্লীগ্রামে। তারপর ওখান থেকে আর দু-একটা জায়গায়। দরকারি কয়েকটি কাজ আছে, ওগুলো সেরেই ফিরে আসব।'

মুখার্জিবাবু জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলেন—কী কাজ ? অতি কষ্টে সামলে নিলেন নিজেকে। এ সব জায়গায় গোয়েন্দাকে প্রশ্ন করা অর্থহীন। ও উত্তরের ধারকাছ দিয়েও যাবে না। কিংবা প্রসঙ্গ এড়াবার জন্যে অন্য কথা পাড়বে।

দুজনের এই নীরবতার মাঝখানে হঠাৎই ঝনঝন করে টেলিফোন বেজে উঠল। রিসিভার ওঠাতেই পুলিশ ইন্সপেক্টর অবনী ঘোষরায়ের গাঁক-গাঁক করা গলা ভেসে এল। শুধু কৌশিক নয়, মুখার্জিবাবুর কানেও পৌঁছে গেল কথাগুলো। 'এ কীসব পরের পর ঘটে চলেছে কৌশিক। এবার আমি নির্ঘাত বিছানায় পড়ে যাব!'

উদ্বিগ্ন হয়ে কৌশিক জিজ্ঞেস করল, 'কেন, কী হয়েছে অবনীদা ?'

'যা হবার নয়, তাই। মনে হচ্ছে, আমার বিরুদ্ধে মস্ত এক ষড়যন্ত্র শুরু হয়ে গেছে।'

'ষড়যন্ত্র !'

'অনেকটা সেইরকমই। কী দুর্ভোগ বলো তো! তুমি এখন একবার আসতে পারবে ?'

'কোথায় ?'

'আমার কোয়ার্টার্সে। এইমাত্র থানা থেকে ফিরলাম।'

'আসছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঠিক পৌঁছে যাব।'

রিসিভার নামিয়ে একটু থমথমে মুখে উঠে দাঁড়িয়েছিল কৌশিক।

।। চোদ্দো ।।

ইন্সপেক্টর অবনী ঘোষরায়কে কালো পাথরের তৈরি একটা মূর্তির মতো দেখাচ্ছিল। উনি মস্ত একটা চেয়ারে কাত হয়ে পড়ে আছেন। ওঁর সঙ্গে কৌশিকের একবার চোখাচোখি হল, কিন্তু পাথুরে মূর্তির কোনও ভাবান্তর হল না।

ইন্সপেক্টরের কোয়ার্টার্সে কৌশিক খুব চেনা মানুষ, ওর গতিবিধি অবাধ সর্বত্র। দুটো ঘর পেরিয়ে অবনীদার ঘরে ও চলে এসেছে সোজা। এ বাড়িতে ঢোকার সময়ই কৌশিক জেনে গিছে, ইন্সপেক্টর মিনিট-পনেরো হল থানা থেকে ফিরেছেন। কিন্তু ওঁকে দেখেই গোয়েন্দা বুঝতে পেরেছিল, এই পনেরটা মিনিট মানুষটার এই চেয়ারে আধ-শোওয়া অবস্থাতেই কেটে গেছে। পাশের টেবিলে আধখাওয়া কালো কফির কাপ।

মূর্তির চোখে আর একবার চোখ পড়তেই গোয়েন্দা বলল, 'কী অবনীদা, শরীর খারাপ ?'

সহানুভূতিমাখানো ছোট্ট প্রশ্নটা শুনে সাড় ফিরে এসেছিল বিশাল মূর্তির দেহে। দমকা বাতাসের মতো নিঃশ্বাস ফেলে ইন্সপেক্টর বললেন, 'শরীর ভাল কি খারাপ, এই বোধটাই বোধহয় নষ্ট হয়ে গেছে আমার!'

'কেন, আবার কি নতুন কোনও ঝামেলার মধ্যে পড়েছেন?'

বড়সড় শরীরটা টেনে তুলে পালটা প্রশ্ন করলেন ইন্সপেক্টর, 'আচ্ছা, কী ব্যাপার বলো তো? পুলিশের চাকরি করছি টানা তিরিশ বছর, কিন্তু আর কখনও তো এই ধরনের বেয়াড়া সমস্যার মধ্যে পড়িনি। সব বদমাইশের মাথায় এখন কি শুধু একটাই মতলব?'

ওদিকের চেয়ারটা এদিকে এনে ইন্সপেক্টরের মুখোমুখি বসল কৌশিক, তারপর বলল, 'একটাই মতলব! কোন্ মতলবের কথা বলছেন আপনি?'

'ওই যে, বিয়ের নামে ক্রাইম করা—।'

'কেন, এই ধরনের আর কোনও ঘটনা ঘটেছে নাকি?'

'না ঘটলে আর বলছি কেন? প্লাইউডের বড় ব্যবসায়ী, নর্থ-ইস্টার্ন রিজিয়নে ধরতে গেলে একচেটিয়া কারবার। পয়সা আছে, বুদ্ধি আছে, শিক্ষা আছে—কিন্তু থেকেই বা কী লাভ হল! তুই তোর বোকামির জন্যে গাড্ডায় পড়লি। তুইও ডুবলি, আমাকেও ডোবালি। চাকরিজীবনের শেষে এসে একের পর এক এই ধরনের প্যাঁচের মধ্যে পড়তে হবে কে জানত!'

কৌশিকের গলার স্বর এবার একটু কঠিন হল। 'অবনীদা, আপনি ডেকেছেন, আমি সঙ্গে সঙ্গে চলে এসেছি। কিন্তু এখনও পর্যন্ত জানতে পারলাম না আপনার সমস্যাটা কী!'

পুরনো আমলের বাড়ি এটা। খুব উঁচু সিলিং। বিশাল-বিশাল জানলা, দরজা। একটা জানলার আধভেজানো খড়খড়ি দিয়ে আলো-আঁধারের বিচিত্র এক নকশা এসে পড়েছিল ইন্সপেক্টরের মুখে। কেমন যেন রহস্যজড়ানো গলায় উনি বললেন, 'স্টোনম্যানের কথা মনে আছে তোমার? সেই যে রাতের অন্ধকারে একটা লোক পাথর দিয়ে কলকাতার ফুটপাথে শুয়ে-থাকা লোকদের মাথা থেঁতলে মারত। একটা-দুটো নয়, পরের পর একই ধরনের ঘটনা ঘটে গিয়েছিল অনেকগুলো; কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও আসল খুনিকে ধরা যায়নি। অপরাধী ভেবে বেশ কিছু বাউন্ডুলে আর পাগলকে ছেঁকে তোলা হয়েছিল মাঝরাত্তিরে। সব বেকার। খুনি বরাবরই ছাঁকনিব আড়ালে থেকে গিয়েছিল। মনে পড়ছে?'

'পড়ছে।'

'আমার মনে হয় বিয়ের নামে একের পর এক ক্রাইম-করা এই লোকগুলোও স্টোনম্যানের কায়দায় ছাঁকনির বাইরে থেকে যাবে।'

একটু হেসে কৌশিক বলল, 'অপরাধীরা তো আর যেচে এসে ধরা দেবে না। আমরা যদি ওদের ধরতে না পারি, ছাঁকনির বাইরেই থেকে যাবে ওরা। বুঝত পারছি ওই ধরনের আর একটা ঘটনা ঘটে গেছে। এ মেয়েটা কি ওই প্লাইউড ব্যবসায়ীর মেয়ে?'

শুকনো মুখে একদিকে মাথা কাত করলেন ইন্সপেক্টর।

নিঃশব্দ উত্তরে গোয়েন্দার চোয়াল একটু কঠিন হল। 'ব্যাপারটা একটু খুলে বলুন তো অবনীদা।'

চেয়ারের হাতলে রাখা তোয়ালে দিয়ে ভাল করে চোখমুখ মুছে নিয়ে ইন্সপেক্টর বললেন, 'সেই এক গপ্পো। অপারেশনের স্টাইলও মোটামুটি এক।'

'মেয়ের বিজ্ঞাপনের জবাবে পাত্রপক্ষ এসে হাজির হল। পাত্র অত্যন্ত যোগ্য আর দেখতেও সুন্দর। তাই তো?'

'ঠিক তাই। অমন সুপাত্র, সুতরাং বিয়ে ঠিক হয়ে গেল চটপট। বিয়ে করে গয়নাগাটি, টাকাপয়সাসমেত বউকে নিয়ে হনিমুন করতে গেল বর। তারপর উধাও। মালপত্তরও নেই, বউও নেই।'

'কোথায় গিয়েছিল ওরা হানিমুন করতে?'

'ব্যাঙ্গালোরে।'

উত্তরটা শুনে একটু বুঝি চমকে উঠল কৌশিক। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'মেয়ের নাম কী? মনে আছে আপনার?'

'ওই যে তিন অক্ষরের—, বেশ তালের নাম। কী যেন—বিমল, বিমলা, বিমলি—নানা, ঝিমলি।'

কৌশিকের চোয়াল কঠিন হতে হতে একটু বুঝি ঠেলে বেরিয়ে এসেছিল। 'মেয়ে-জামাইয়ের খবরাখবর না পেয়ে মেয়ের বাবা কি বাঙ্গালোরে ছুটেছিলেন?'

'ঠিক তাই। কিন্তু তুমি কী করে জানলে?'

'এর আবার জানাজানির কী আছে। ব্যাঙ্গালোরে পৌঁছেই মেয়ে-জামাইয়ের ফোন করার কথা ছিল নির্ঘাত। করেনি। বাবাও এখানে-সেখানে ফোন করে খবর জোগাড় করার চেষ্টা করেছিলেন, পাননি। অগত্যা ছুটতে হয়েছে! ওখানে গিয়েও কোনও খবরাখবর জোগাড় করতে পারেননি। পারলে আপনার কাছে আসতেন না।'

'ঠিক।'

'আপনি ভদ্রলোকের বাড়িতে ইনকুয়ারি করতে যাবেন না?'

'হ্যাঁ, যেতে তো হবে। আসলে ওই ঘটনাটা শোনার পরেই শরীরটা হঠাৎ কেমন যেন করে উঠেছিল! করবে নাই বা কেন? একের পর এক অপরাধ, তার মধ্যে বেশ কয়েকটা আবার একই ধরনের, অথচ একটারও সমাধান নেই।'

'পাত্রপক্ষ কিছু ফেলেটেলে গেছে কি? জিজ্ঞেস করেছিলেন?'

'না, পাকা কাজ। কিচ্ছু ফেলে যায়নি।'

'বিয়ের আসরে ছবিটবি উঠেছে, নাকি এখানেও—।'

'হ্যাঁ, এখানেও ওই একই কায়দা। বরের ছোটমামা তার এক দিদির বিয়েতে ছবি তোলার সময় ন্যাড়া ছাত থেকে পড়ে গিয়ে মারা যান। সেই থেকে এই বাড়ির বিয়েতে ছবি তোলা নিষিদ্ধ। নিষেধ অমান্য করে ছবি তুলতে গিয়ে আবার একটা দুর্ঘটনা ঘটেছিল। তারপর থেকেই এটা একটা সংস্কারে দাঁড়িয়ে গেছে—। এই গপ্পো শোনালে কোন্ পাত্রীপক্ষ ছবি তোলানোর জন্যে জোর করবে বলো? বিশেষ করে পাত্র যখন সবদিক থেকে আকাশের চাঁদমার্কা, তার ওপর দাবিদাওয়া বলে কিচ্ছু নেই। ছবিটবি না থাকলে গা ঢাকা দেওয়ার সুবিধে। একই গপ্পো তিন জায়গায় সামান্য ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলা হয়েছে, অথচ তুমি বলছ এরা এক পার্টি নয়।'

'এ-কথা আমি আবার কখন বললাম?'

'বলোনি! আগের বিয়েদুটোর বর এক নয়— এ কথা তুমি নিজের মুখে বলেছ। বলোনি?'

মৃদু গলায় উত্তর দিল, কৌশিক, 'হ্যাঁ, তা বলেছি।'

বাচ্চারা কাউকে হারিয়ে দিলে যে ধরনের গলায় কথা বলে, ঠিক সেই ধরনের গলায় ইন্সপেক্টর বলে উঠলেন, 'তবে!'

কৌশিকের গলার স্বর এবার আরও খাদে নামল, কিন্তু কণ্ঠস্বরে কোনওরকম জড়তা নেই। 'দুটো বর সত্যিই এক নয়।'

'মানে?'

ইন্সপেক্টরের বিস্ময়মেশানো প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে না গিয়ে কৌশিক বলল, 'এই কেসটার একটু তদন্ত করা দরকার। চলুন ওই প্লাইউড ব্যবসায়ীর বাড়ি থেকে ঘুবে আসি একবার।'

'কেন, এখনই যেতে চাইছ কেন?'

'প্রথম কারণ হল আমি কয়েক দিন কলকাতায় থাকব না।'

'সে কী, কোথায় যাবে?'

'গ্রামগঞ্জের দিকে যাব প্রথমে—।'

'তোমার এই গ্রাম আর জঙ্গলের ব্যাপারটা এখন বাদ দাও তো কৌশিক, প্লিজ—। দুর্ভাবনা, দুশ্চিন্তায় আমি রত্তিরে ঘুমোতে পর্যন্ত পারছি না। উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তা থেকে কত রকম রোগ হয় জানো? বিশেষ করে আমাদের এই বয়েসে। ব্লাড শ্যুগার আমার এখন মাত্রা ছাড়িয়ে কোথায় উঠেছে কে জানে! পেটের মধ্যে ইদানীং একটু ব্যথা-ব্যথা করে— গ্যাসট্রিকে ধরল কি না কে জানে। এর ওপর মাঝেমধ্যে বাঁদিকের বুকে একটু চিনচিনে ব্যথাও হয়—।'

এবার একটু ধমকে ওঠার গলায় কৌশিক বলল, 'কী যা-তা বলে চলেছেন। আপনার মতো সাহসী, কর্তব্যপরায়ণ, সৎ অফিসার খুব কমই আছে। ঝুঁকি নিয়ে কাজ করতে গেলে একটু অনিয়ম হয়, তার থেকে শরীরে—ও কিছু না।'

"ওসব কথা বাদ দাও। প্রশ্ন তো একটাই—অপরাধী ধরা পড়েছে কি? উত্তর 'হ্যাঁ' হলে ভাল, 'না' হলে খারাপ। এ ঠিক পরীক্ষায় পাশ-ফেলের মতো। ফেল করার কোনও অজুহাত নেই। একটা দুঃখের কথা কী জানো? আমাকে ধাতানো বড় সাহেব, মেজো সাহেব এখন তাদের রুটিনের মধ্যে ফেলে দিয়েছে।"

'ধমকানো, কৈফিয়ত তলব করা সব চাইতে সোজা। আপনার কাজ রীতিমত্ কঠিন। ভয়ঙ্কর কোনও অপরাধী ধরা কি চাট্টিখানি কথা! সেদিনের কথা মনে করুন তো একবার। একটা সময় লোকে বলত—আপনার নামে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খায়—।'

'হ্যাঁ খেত, আমি খাওয়াতাম, কারণ আমার হাতে তখন থার্ড ডিগ্রি মেথড ছিল। আমাদের শাস্তরে বলে লাঠির চেয়ে বড় ওষুধ আর নেই। পাকা বদমাইশগুলোকে তো আর বাছা-বাছা বলে গায়ে-মাথায় হাত বোলালে মুখ খুলবে না। লক-আপে ঢুকিয়ে আচ্ছা করে কম্বলধোলাই

দাও। বাইরে থেকে কিছু বোঝার উপায় থাকবে না, কিন্তু ভেতরে ভেতরে হাড় গুঁড়ো হয়ে যাবে। ভেতরে জখম হলে সত্যি কথা বেরিয়ে আসবে বাপ-বাপ বলে। এখন হিউম্যান রাইট্স কমিশনওয়ালারা আমাদের হাত থেকে থার্ড ডিগ্রি কেড়ে নিয়েছে। অপরাধীদের গায়ে আর হাত তোলা যাবে না। তার ফলে যা হওয়ার তাই হয়েছে। ওরা কলার তুলে থানায় ঢোকে, তারপর কলার তুলেই বেরিয়ে যায়। স্বীকারোক্তি আদায়-টাদায়ের পাট চুকে গেছে কবে। এই কেসের একটা সাসপেক্ট আমার হাত থেকে পালিয়েছে, ওটা না পালালে অ্যাদ্দিনে আমি বদমাইশগুলোকে জেলে পুরে হাত ধুয়ে বসে থাকতাম।'

'কার কথা বলছেন আপনি?'

'ওই যে সেই ব্লু ফিল্মের নায়িকা, সন্ধ্যা না কী যেন নাম। ও সব জানত। হোম থেকে না পালালে ওর মুখ থেকেই আমি সব ক'টার পাত্তা আদায় করে ছাড়তাম। তবে ও পালালে কী হবে, একটা এখনও আমার হাতের নাগালের মধ্যে রয়ে গেছে।'

'তা ধরুন ওটাকে।'

'হাতে থার্ড ডিগ্রির অস্ত্র থাকলে এক্ষুনি ওটাকে তুলে আনতাম। নজরে রেখেছি, সময় হলেই তুলব।'

একটু বাহবা দেওয়ার গলায় কৌশিক বলল, 'বাহ্! আপনি তো তাহলে অনেকটাই এগিয়ে গেছেন।'

ম্লান একটা হাসি ফুটে উঠেছিল ইন্সপেক্টরের মুখে। 'আমার চেষ্টার খামতি নেই। কখনওই আমি চুপ করে বসে থাকি না। তবে এটাও সত্যি—না আঁচালে বিশ্বাস নেই।'

কৌশিক হাতঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বলল, 'প্লাইউডের ব্যবসায়ী ভদ্রলোককে বুঝতে পারছি আপনার ভালভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়নি। তো, যাবেন নাকি একবার?'

আচমকা ঘুম-ভেঙে-যাওয়া মানুষেব গলায় ইন্সপেক্টর বললেন, 'যাবে? ঠিক আছে চলো।'

'আপনার খাওয়া-দাওয়ার?'

'যা খাওয়ার, খেয়ে নিয়েছি।'

'ওই কফিটা?'

না, আর খাব না। চলো যাওয়া যাক। আমার বলাই আছে, আজ-কালের মধ্যে যে-কোনও সময় ওদের বাড়িতে যাব।'

জিপের ড্রাইভার রাস্তার উলটোদিকের পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে দেশোয়ালি ভাইদের সঙ্গে গল্প করছিল সাহাবকে দেখেই ছুটে এল।

কোথায় যেতে হবে বলতেই দৌড় লাগাল জিপ। বাতাসে একটু গরমের ভাব। আর দু-চারদিন হয়তো শীতের হাওয়া বইবে, তার পরেই এসে যাবে বসন্তকাল।

ড্রাইভারের পাশের সিটে ইন্সপেক্টর। পেছনে বসে ওঁর মাথার দুলুনি দেখে কৌশিক বুঝতে পারল, চোখ বন্ধ করে বিশ্রাম নিচ্ছেন ক্লান্ত মানুষটি।

মিনিট-কুড়ির মধ্যে জিপ পৌঁছে গেল প্লাইউড মার্চেন্ট প্রিয়ব্রত সিন্হার বাড়িতে। পুরনো

আমলের মস্ত বাড়ি। বাড়ির সামনে পুলিশের জিপ দাঁড়ালে সে-খবর বোধহয় বাতাসে উড়ে বাড়ির ভেতরে চলে যায়। একটু বাদেই বেরিয়ে এলেন প্রিয়ব্রতবাবু। পরনে বাইরে বেরুবার পোশাক। বললেন, 'আসুন-আসুন, আমি তো আর একটু হলেই বেরিয়ে পড়তাম।'

কথাটার কোনও উত্তর দিলেন না ইন্সপেক্টর।

পুরনো আমলের এইসব বাড়ির মধ্যিখানে বেশ বড় একটা উঠোন থাকে। উঠোনের পাশ দিয়ে সামান্য খাড়াই সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায়। সিঁড়ির পাশের ঘরটাই বসার ঘব। পুরনো দিনের কারুকার্য-করা আসবাবপত্র। দেয়ালে মস্ত এক অয়েলপেন্টিং, বোধহয় গৃহস্বামীর প্রপিতামহের।

ঘরে ঢোকার পরে মাথার টুপি খুলে হাতে নিয়ে সোফায় বসলেন ইন্সপেক্টর, তারপর প্রিয়ব্রতর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'থানায় আপনার সব কথা শোনা হয়নি, একটু খুলে বলুন তো ঠিক কী হয়েছিল?'

ঘরের ভেতর দিকের দরজার পর্দা ঠেলে মাঝবয়সী এক মহিলা ঘরে ঢুকে বললেন, 'আমি বলছি কী হয়েছে।'

প্রিয়ব্রত পরিচয় করিয়ে দেওয়ার ভঙ্গিতে বললেন, 'আমাব স্ত্রী, তমালিকা।'

ইন্সপেক্টর টুপিসমেত হাতটা মাথার দিকে একটুখানি তুললেন। কৌশিক দুহাত তুলে নমস্কার করে বলল, 'আপনি বসুন।'

তমালিকা উল্টোদিকের সোফায় বসলেন। বসার পরে ওব ঠোঁট কাঁপল দু-চারবার, তবে কিছু বলতে পারলেন না।

ভদ্রমহিলার বয়েস পঞ্চাশের আশেপাশে। সুন্দরী, ফর্সা। কেন্তু চোখেমুখে কে যেন কালি ঢেলে দিয়েছে। আঁচলের খুঁট দিয়ে চোখের কোনা মুছে নিলেন একবার।

ইন্সপেক্টর প্রিয়ব্রতর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আর কোনও খবরটবর পেলেন?'

দুদিকে মাথা নাড়তে নাড়াতে জবাব দিলেন প্রিয়ব্রত, 'না, কোনও হদিস নেই।'

ক্লান্ত, বিপর্যস্ত ইন্সপেক্টর ঘোষরায়ের ধৈর্যচ্যুতি ঘটল হঠাৎ। গলার স্বর কয়েক পর্দা ওপরে তুলে বললেন, 'কিছু মনে করবেন না মিস্টাব সিন্‌হা, আপনারা শিক্ষিত, বুদ্ধিমান, বড় ব্যবসা করেন—মেয়ের বিয়ে দেওয়ার আগে পাত্রের খবর একবার ভালভাবে নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করলেন না?'

সরাসরি আক্রমণে কেমন যেন গুটিয়ে গিয়েছিলেন সুদর্শন চেহারার মানুষটি। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে বললেন, 'নিইনি তা নয়। ওই সময়ের মধ্যে যতটা খবর নেওয়া সম্ভব, ততটাই নিয়েছি। তবে ছেলের বাবার ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত ছিল।'

'ছেলের বাবা! কে?

'মানে ছেলের বাবা বলে ওরা যে ভদ্রলোকের পরিচয় দিয়েছিল।'

'কে সে?'

'হায়দ্রাবাদের একজন নামকরা মুক্তো ব্যবসায়ী। হায়দ্রাবাদে মস্ত একটা দোকান আছে, আবার দুবাইতে হায়দ্রাবাদি পার্লের এজেন্ট।'

'কী নাম?'

'শিবশঙ্কর সামন্ত।'

'কী আশ্চর্য! নাম ঠিকানা পেলেন, অথচ খোঁজ নিলেন না একবার?'

'নিয়েছি। নাম ঠিকানা, ব্যবসার নাম—সব জেনুইন। খোঁজখবর নেওয়ার সময় ভদ্রলোক ছিলেন দুবাইয়ে। উনি বিপত্নীক। ছেলের নামও ঠিক। এখন বুঝতে পারছি, ঠগ্-জোচ্চাররা খুব ভালভাবে খোঁজখবর নিয়ে এগিয়েছে।'

ইন্সপেক্টরের চোখমুখ এখনও বেশ ধারালো। ধারালো গলাতেই প্রশ্ন করলেন, 'আপনারা দুবাইতে ফোন করেননি।'

'করেছি, কিন্তু শুনলাম ভদ্রলোক দুবাইয়ের ঠিকানা পালটেছেন।'

'ইচ্ছে করেই জোচ্চোররা আপনাকে পুরনো ঠিকানা দিয়েছিল। আপনি যে ওকে ওখানে পাননি, সে-কথা পাত্রের কাকা-সাজা লোকটাকে জানাননি?'

'জানিয়েছিলাম। তার উত্তরে লোকটা হেসে বলেছিল—গাল্ফ কান্ট্রিজে দাদার অনেকগুলো ব্যবসার সেন্টার, আমি আপনাকে আরও দু-চারটে নম্বর দিতে পারি, কোথাও না কোথাও ঠিক পেয়ে যাবেন। তবে এখন তো ওঁর ব্যবসার সিজন, খুব বেশিক্ষণ কথা বলতে পারবেন না। সামনের সপ্তাহে তিন দিনের জন্যে ফিরছেন হায়দ্রাবাদে, তখন আমিই আপনাকে নিয়ে যাব দাদার কাছে। মেয়ের বিয়ে দিচ্ছেন, পাত্রের বাড়িঘর নিজের চোখে না দেখে এগনো ঠিক নয়।'

এ বার কথা বলল কৌশিক। 'প্রতারকরা লোকের মন বুঝে কথা বলতে পারে। পারে বলেই অচেনা মানুষরা চট করে বিশ্বাস করে ফেলে ওদের। তাছাড়া লোকের আস্থা অর্জনের জন্যে ওরা বেশ কিছু চালাকিও করে থাকে গোড়ার দিকে।'

মিসেস সিন্‌হা বললেন, 'ঠিক বলেছেন, আমাদের তো গোড়ার দিকে বেশ সন্দেহই হচ্ছিল, কিন্তু ছেলের কাকা এমন একটা কাণ্ড করে বসল যে—।'

কৌতূহলী হয়ে একটু ঘুরে বসলেন ইন্সপেক্টর। 'কী কাণ্ড বলুন তো?'

ভদ্রমহিলা প্রথম দিকের সেই অস্বস্তি এখন কাটিয়ে ফেলেছেন অনেকখানি। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে তাকার পরে বললেন, 'ঝিমলির বিয়ের বিজ্ঞাপন আমরা খবরের কাগজে বেশ বড় করেই দিয়েছিলাম। বিজ্ঞাপনের সঙ্গে আমাদের বাড়ির ফোন নম্বর ছিল। সকাল থেকেই ফোন আসতে শুরু করেছিল। ওই পাজি লোকটা, মানে পাত্রের কাকা, ফোন করেছিল বেলা এগারোটা নাগাদ। কী সুন্দর কথাবার্তা—কী বলব! আর ছেলের কথা যা বলল তা তো এক কথায় অবিশ্বাস্য। ছেলে স্কুল থেকে ইউনিভার্সিটি লেভেল পর্যন্ত সব পরীক্ষায় প্রথম হয়েছে। অথচ বইয়ের পোকা নয়। আদর্শবাদী। বিশাল বড়লোক। অনেক কষ্ট করে বিয়ের ব্যাপারে ছেলের মত করিয়েছে ওর কাকা। তবে ছেলের প্রথম

শর্ত; বিয়েতে কোনওরকম যৌতুক নেওয়া চলবে না। টাকাপয়সা তো নয়ই, কোনওরকম জিনিসপত্তরও নয়। আর, ছেলেকে দেখতে নাকি দারুণ সুন্দর। আচ্ছা, আপনারাই বলুন—এসব শুনলে মেয়ের বাবা-মায়েরা কি একটু দুর্বল হয়ে পড়বে না?'

ভদ্রমহিলার কথা বলার ভঙ্গিটা খুব সহজ আর স্বাভাবিক। এমনভাবে বলছিলেন যেন সামনে বুঝি পুলিশ নয়—সহানুভূতিশীল আত্মীয়-বন্ধুরা বসে আছেন।

ইন্সপেক্টর ঘোষরায়ের চোখমুখের কঠোর ভাবটা মিলিয়ে গেছে এখন। একটু যেন সায় দেওয়ার গলায় বললেন, 'ঠিকই, বাবা-মা যখন মেয়ের বিয়ের চেষ্টা করছেন তখন সুপাত্রের খোঁজ পেলে আগ্রহ তো বাড়বেই। তবে আগ্রহ বাড়া মানে কিন্তু অন্ধকারে ঝাঁপ দেওয়া নয়।'

'আপনি ঠিকই বলেছেন, ওরা ব্যাপারটাকে এমন ভাবে সাজিয়েছিল যে—সত্যি কথা বলতে কি আমাদের, বিশেষ করে আমার, বেশ একটু মাথা ঘুরে গিয়েছিল। প্রথমদিকে আমি তো প্রতিটি ব্যাপারই বাজিয়ে নিচ্ছিলাম, কিন্তু ছেলেকে যখন দেখলাম—মনে হল, এ ছেলের দ্বারা কোনও অন্যায় কাজ করা সম্ভব নয়।'

'ছেলেকে কি খুব সুন্দর দেখতে?'

'খুবই। এখনও আমার কাছে ধাঁধা থেকে যাচ্ছে, ওই ছেলে এমন কাণ্ড করল কী করে। শুধু যে সুন্দর তা নয়, গুণের দিকটা নাকি আরও বড়। আর যে ব্যাপারটা আমাদের মুগ্ধ করেছিল তা হল ওর ব্যবহার। কী শিষ্ট, কী মার্জিত—কী বলব আপনাকে! ওই যে বলে না—ব্যবহারই মানুষের আসল পরিচয়। তা, ওর ব্যবহার দেখে আমরা আড়ালে বলাবলি করতাম—ছেলেটা সত্যিই বড় ঘরের ছেলে। তখন কে জানত যে আমাদের সর্বনাশ হওয়ার আর বাকি নেই!'

কৌশিক বুঝতে পেরেছিল, এখন দু-একটা সহানুভূতিসূচক কথা বললেই ভদ্রমহিলার চোখ ফেটে জল পড়বে। সুতরাং প্রসঙ্গটাকে চটপট অন্যদিকে ঠেলে দেওয়ার জন্যে প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা, আপনি তখন কী যেন বলছিলেন—কী একটা কায়দা দেখিয়ে ছেলের কাকা আপনাদের কাছে হঠাৎই খুব বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিল। কায়দাটা কী?'

পুরনো বিস্ময়বোধ এখনও বোধহয় কিছুটা রয়ে গেছে ভদ্রমহিলার মধ্যে। বললেন, 'ওহ্! সে এক নাটক!'

ধনী ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের কাজের লোকদের পোশাক পুরনো দিনে ছিল খাটো ধুতি আর ফতুয়া। কারও-কারও কাঁধে আবার পাট-পাট করে ভাঁজ করা থাকত গামছা। বনেদি পরিবারে সেই চল্ এখনও রয়ে গেছে অল্পবিস্তর। তবে ওই ফতুয়ার জায়গায় এসেছে হাতাওয়ালা গেঞ্জি। হাতাওয়ালা গেঞ্জি আর খাটো ধুতি পরা দু'জন কাজের লোক ঢুকল বসার ঘরে। দু'জনের হাতে দুটো ট্রে। একটা ট্রেতে টি-পট, দুধ, চিনি আর কাপ-প্লেট। অন্য ট্রেতে বিস্কুট আর মিষ্টি।

তমালিকা সামান্য ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'আপনারা একটু চা খেয়ে নিন।'

ইন্সপেক্টর ভারী গলায় জবাব দিলেন, 'শুধু চা। চিনিছাড়া।'

কাজের লোকরা উর্দিপরা বিশাল চেহারার পুলিশ সাহেবের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল সবার আগে। তারপর কৌশিক। সবশেষে বাড়ির কর্তাগিন্নি। প্রত্যেকেই সামান্য আগে-পরে চায়ের কাপ তুলে নিয়েছিল হাতে।

কৌশিক আগের কথার ধরতাই দিল তমালিকাকে। 'হ্যাঁ, ছেলের কাকার নাটুকে কোন্ চালটার কথা বলছিলেন যেন আপনি—।'

হাতের চায়ের কাপটা নামিয়ে রেখে তমালিকা জবাব দিলেন, "সত্যিই নাটক। টেলিফোনে নিজেদের ঘরবাড়ি আর ছেলের সম্পর্কে বিস্তর বড়-বড় কথা শোনাবার পরে বলল— আজ যদি বেলা তিনটে নাগাদ আপনাদের বাড়িতে যাই, আপনাদের কি অসুবিধে হবে? এ ভাবে বললে তো আর মুখের ওপর 'না' করা যায় না। তা ছাড়া ওইরকম পাত্র। জিজ্ঞেস করলাম— আপনারা কি আজকেই মেয়ে দেখতে চান? উত্তরে যা বলল না— ওইসব কথা শুনে যে-কারও মন ভরে যাবে। বলল— ছি-ছি, এ ভাবে মেয়ে দেখাটেখায় আমি বিশ্বাসী নই। গিয়ে আপনাদের সঙ্গে একটু গল্প করব। আর, মেয়ের যদি আপত্তি না থাকে— ওর সঙ্গে একবার আলাপ করেও আসতে পারি। আসলে ব্যাপারটা কী জানেন-- আমরা প্রবাসী লোক। আমাকে অবশ্য মাঝেমাঝেই কলকাতায় আসতে হয়। কয়েক বছর আগে টানা থাকতে হয়েছিল বেশ কিছুদিন। কলকাতার সেকেন্ড হুগলি ব্রিজের শেষের দিকের কাজটা আমরাই করেছি।"

ইন্সপেক্টর ঘোষরায় চোখ বড়-বড় করে বললেন, 'অ্যাঁ! এইসব বলেছে নাকি।'

'শুধু এটাই নয়, আরও অনেক তাকলাগানো কথা। শুনলে মনে হবে বিশাল বড় লোক। আর কী ভদ্র। বলল— এবার খুব ছোট একটা কাজ নিয়ে এসেছি। তবে অসম্ভব টাইট প্রোগ্রাম। আজকেই শুধু একটা ঘন্টা সময় বার করতে পারব। অবশ্য আপনাদের অসুবিধে থাকলে— সঙ্কোচের কোনও কারণ নেই, পরে একদিন দেখা হবে। আচ্ছা, আপনারাই বলুন, এ সব শুনলে কী মনে হয়? ভাবলাম, মেয়ের কপাল, না হলে হুট করে এত বড় একটা সম্বন্ধ কেন আসবে! বললাম— না-না, আমাদের কোনও অসুবিধে নেই। আপনি আপনার সুবিধেমতো যখন খুশি আসুন। তখন লোকটা টেলিফোনে আমাদের বাড়ির ঠিকানা আর এখানে আসার ডিরেকশনটা নিয়ে নিল। ফোন নামিয়ে রেখে আমার তখন কী অস্থির-অস্থির ভাব! ও অফিসে ছিল। ওকে ফোন করে বললাম— এই ব্যাপার, তুমি তিনটের আগে বাড়িতে চলে এসো। মেয়ে আমাদের এবারই গ্র্যাজুয়েট হয়েছে। কলেজটলেজ নেই। ওকে বললাম, তুই আজ আর বাড়ি থেকে বেরোস না। একজন আসবে, আমাকে একটু সাহায্য করতে হবে।'

'তা, এল তিনটের সময়?'

'হ্যাঁ, ঠিক তিনটেয়। একটা মারুতি চেপে। পরে জেনেছি ওটা মিরান্দার রেন্ট-এ-কার থেকে ভাড়া করা। তা, ওকে আমরা খুব আপ্যায়ন করে বসালাম। আপনি যে চেয়ারটায় বসেছেন, ওখানেই বসেছিল।'

'সঙ্গে আর কেউ এসেছিল, নাকি একা?'

'একা।'

'এসেই বলল এই তিনদিনের মধ্যে ওর এক ঘণ্টাই ছুটি। কনস্ট্রাকশনের কাজ চলছে। এমন ভাবে কথা বলছিল যেন কোটি-কোটি টাকার ব্যবসা। হাসতে হাসতে বলল, ওর ফার্মে দু-ডজন ইঞ্জিনিয়ার কাজ করছে। সব সেরা সেরা ছেলে। আই আই টি, বি এইচ ইউ, রাঁচি মেসরা, যাদবপুর থেকে ভাল ছেলেদের ছেঁকে নিয়েছে। বলল, ওর ফার্মে যারা একবার কাজে ঢোকে তারা ওকে আর ছেড়ে যায় না। কারণ, মাইনে আর সুযোগসুবিধে অন্যান্য কোম্পানির চাইতে চার গুণ বেশি। প্রতিটি লেভেলেই তাই। সাধারণ কর্মীদেরও ওই হারে পেমেন্ট করে থাকে। বাড়তি দাবিদাওয়াও মেনে নেয়। এই তো, এখান থেকে বেরিয়ে সাইটে গিয়ে সাড়ে-চারটের সময় কিছু ওয়ার্কারকে পেমেন্ট করতে হবে। ওরা সন্ধের সময় দেশে যাওয়ার জন্যে ট্রেনে চাপবে। ভাগলপুরে দেশ। কী একটা উৎসব আছে সেই জন্যেই বাড়তি পেমেন্ট।'

স্ত্রীকে থামিয়ে দিয়ে প্রিয়ব্রত বললেন, 'কী বোলচাল। ব্যবসার সুবাদে তো আমাকে বহু লোকের সঙ্গে মিশতে হয়, কিন্তু এ লোকটা একেবারে আলাদা ধাঁচের। একটা কথা আমার মনে আছে পরিষ্কার। বলেছিল: অসুখী মুর্গি কখনও ভাল ডিম পাড়তে পারে না। এই কথাটা ও নাকি খুব মানে। জীবনের সব জায়গাতেই কথাটা সত্যি। কারখানার উৎপাদন বাড়াতে গেলে শ্রমিকদের সুখী রাখা দরকার। লাভের অঙ্ক কমুক, তাতে কিছু এসে যায় না। যে শুধুই লাভের অঙ্ক কষে, সে মানুষ হিসেবে ছোট হতে বাধ্য। তারপর বড়-বড় আদর্শের কথা। ওই যে মোরাল টেক্সটবুকে যেগুলো লেখা থাকে।'

প্রিয়ব্রতকে থামিয়ে দিয়ে তমালিকা কথা শুরু করলেন আবার। 'আমার কিন্তু প্রথমদিকে বেশ ভাল লাগছিল লোকটাকে। পৃথিবীতে ছোট আর মাঝারি মাপের লোকই তো বেশি, কিন্তু বড় মানুষও তো আছে। মনে হয়েছিল, এ মানুষটা নির্ঘাত ওই শেষের দলের একজন। বলল— ওদের পরিবারের ধারাটাই ওইরকম। সত্যিকারের বড় মানুষ বলতে যা বোঝায় তা ওদের পরিবারে আছে বেশ কয়েকজন। বিলাসিতায় গা ভাসাবার ক্ষমতা রাখে অনেকেই, কিন্তু এখনও ওদের পরিবারে ওই সিম্পল লিভিং আর হাই থিংকিং। ছেলে নাকি বাবাকেও ছাপিয়ে গেছে। ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র। হার্ভার্ড থেকে ডক্টরেট করেছে। ওর শখ— আমেরিকান ইউনিভার্সিটিতে পড়াবে। দাদার একমাত্র সন্তান, দাদার খুব ইচ্ছে ও পারিবারিক ব্যবসা দেখাশোনা করুক। কিন্তু ছেলেকে এই ব্যাপারে কখনও জোর করেনি। দাদা অসম্ভব নন-ইনটারফেয়ারিং। বলে, ছেলে সাবালক, শিক্ষিত; আমি কেন ওর ওপর আমার মত খাটাতে যাব। ওই ছেলে শেষে কাকার কথায় বাবার ব্যবসায় ঢুকতে রাজি হয়েছে। কাকা বলেছে, ভাল লাগলে বাবার ব্যবসায় থাকবে, ভাল না লাগলে যা ভাল বুঝবে তাই করবে।'

এই পর্যন্ত বলার পরে তমালিকা হঠাৎ থেমে গেলেন। ওঁর হাতে চায়ের কাপ, কাপে চা; কিন্তু উনি আর চায়ে চুমুক দিলেন না। শূন্য দৃষ্টিতে সামনের দেয়ালের দিকে কয়েক

মুহূর্ত তাকিয়ে থাকার পরে বললেন, 'কিন্তু এ সব শুনে আপনাদের কি লাভ? ও তো থানায় গিয়ে সবকিছুই জানিয়ে এসেছে। মেয়ের যা ক্ষতি হওয়ার তা তো হয়েই গেছে, আপনারা দয়া করে এবার মেয়েটাকে উদ্ধার করে দিন।'

ইন্সপেক্টর ঘোষরায়কে একটু বিব্রত দেখাল, কিন্তু উনি চটপট নিজেকে সামলে নিয়ে আশ্বাস দেওয়ার গলায় বললেন, 'মিসেস সিন্‌হা, আমরা ইতিমধ্যেই বাঙ্গালোর পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। আমাদের চেষ্টার মধ্যে কোনও ত্রুটি থাকবে না। কিন্তু তদন্তের কাজ ঠিক ভাবে চালাতে গেলে আপনাদের সহযোগিতা দরকার সবার আগে। যা-যা কথা হয়েছে, যা-যা ঘটেছে, খোলাখুলি সব জানান। তুচ্ছ ব্যাপারও এড়িয়ে যাবেন না, অনেক সময় খুব ছোটখাটো ব্যাপারের মধ্যে অপরাধীকে ধরার সূত্র পাওয়া যায়। ওই লোকটা যে অসম্ভব ধড়িবাজ, আপনাদের কথা শুনেই তা বুঝে গিয়েছি। কিন্তু আরও জানা দরকার। আপনি যা বলছিলেন বলে যান, প্লিজ।'

ইন্সপেক্টরের এত কথা শুনেও কিন্তু তমালিকার শূন্য দৃষ্টি স্বাভাবিক হল না।

কৌশিক বলল, 'কথায় বলে, নিজের বিপদে বুদ্ধিমানরাও বোকা বনে যায়। আপনারা সত্যিই অদ্ভুত একটা বিপদের মধ্যে পড়েছিলেন। আপনাদের জায়গায় থাকলে আপনাদের মতোই আরও অনেকে ওই জোচ্চোরগুলোকে বিশ্বাস করে বসত। কিন্তু এখন আপনারা অত্যন্ত বিবেচকের মতো কাজ করছেন। যে মুহূর্তে টের পেয়েছেন ব্যাপারটা গোলমেলে, আপনারা পুলিশকে জানিয়েছেন। এ সব ক্ষেত্রে সময় যত নষ্ট হয়, ক্ষতির মাত্রা তত বাড়ে। হঠাৎ এ ভাবে আপনি থেমে গেলে তদন্তের কাজ ঠিক ভাবে শুরু করতে দেরি হয়ে যাবে। আপনি যেমন বলছিলেন তেমনি বলে যান। ইন্সপেক্টর ঘোষরায় অত্যন্ত এফিসিয়েন্ট অফিসার। কোনও কাজই উনি পরে করব বলে ফেলে রাখেন না।'

শেষ কথাটা শুনে একটু নড়েচড়ে বসে ইন্সপেক্টর বললেন, 'এই ইয়াং ছেলেটি একজন নামকরা প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর। আপনারা নিশ্চয়ই ওর নাম শুনেছেন, ও হচ্ছে—।'

কথাটা ওইখানেই থামিয়ে দেওয়ার জন্যে কৌশিক তমালিকার দিকে তাকিয়ে চটপট প্রশ্ন করে বসল, 'কাকা কী বলল, ভাইপো মুক্তোর ব্যবসায় ঢুকে পড়েছে?'

আগের কথার খেই ধরলেন ভদ্রমহিলা। 'না, ঢোকেনি— তবে ঢুকবে। খুব বাধ্য ছেলে, কাকাকে খুব মানে। কাকার কথায় আমেরিকান ইউনিভার্সিটিতে পড়ানোর প্ল্যান ছেড়ে দিয়ে বাবার ব্যবসায় ঢুকবে এখন। কাকার কথাতেই বিয়েতে মত দিয়েছে। আর ওর বিয়ের ব্যাপারে কাকার কথাই নাকি শেষ কথা। এমন একটা ইঙ্গিতও একবার দিয়েছিল— ওর খুব ইচ্ছে, দাদাকে এখন কিচ্ছু না জানিয়ে সরাসরি বিয়ের আসরে হাজির করিয়ে তাক লাগিয়ে দেবে। কথাবার্তা এমন ভাবে বলছিল যেন বিয়ে ঠিকই হয়ে গেছে। আমি বললাম, আপনি এখনই এসব বলছেন কেন? মেয়ে তো দেখেননি এখনও। তো, কী বলল জানেন? বলল, আগে ঘর তারপর মেয়ে। আপনাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে আমার ভীষণ ভাল লেগে গেছে। বাকিটাও ভাল লাগবে ঠিক।'

'আপনারা কি সেদিনই মেয়ে দেখিয়েছিলেন ?'

ইন্সপেক্টরের প্রশ্নের উত্তরে একটু আমতা-আমতা করে তমালিকা বললেন, 'কী করব বলুন, লোকটার কথাবার্তা শুনে আমরা মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। ও কিন্তু একবারও মেয়ে দেখার কথা তোলেনি। আমাদের মনে হয়েছিল, এত কথার পরে মেয়েকে একবার না দেখানোটা খারাপ হবে। তবে মেয়ে দেখানো বলতে যা বোঝায়, তা কিন্তু নয়। চা-টা দেওয়ার কাজটা মেয়েকে দিয়েই করিয়েছিলাম। তখনই ঝিমলির সঙ্গে পরিচয়। লোকটা কিন্তু একটাওঁ আবোলতাবোল প্রশ্ন করেনি। মা-মা করে কথা বলেছিল কয়েকটা। মেয়ে চা বানিয়েছে শুনে চায়ের সে কী প্রশংসা। প্রশংসা শুনতে কার না ভাল লাগে বলুন ? মেয়েরও ভাল লেগেছিল। তবে ভাল লাগার সব চেয়ে বড় কারণ হল একটাও বেয়াড়া প্রশ্ন শুনতে হয়নি। বুঝতেই তো পারছেন, আজকালকার লেখাপড়া জানা মেয়ে— পাত্রপক্ষের কাছে এ ভাবে হাজিরা দেওয়াটাই তো ওরা অসম্মানজনক বলে মনে করে থাকে।'

'খুব স্বাভাবিক। দেশ এগিয়েছে বলে আমরা এত লাফালাফি করি, কিন্তু একে কি এগনো বলে ? নারী স্বাধীনতা, মেয়েদের সমানাধিকার— অল বোগাস। যৌতুক, পণ, বধূ নির্যাতন আগে যেমন ছিল আজও তেমনি আছে ; বরং বলা যেতে পারে— আগের চাইতে বেড়েছে। ঠগ্-জোচ্চোররা এই সব ঘটনার ফায়দা তুলছে পুরোমাত্রায়।' দোর্দণ্ডপ্রতাপ পুলিশ অফিসার অবনী ঘোষরায়ের পেশা ও উর্দির আড়াল থেকে একজন উদ্বিগ্ন অভিভাবক যেন কথাগুলো বললেন।

সায় দিলেন তমালিকা। 'ঠিক বলেছেন আপনি। কিন্তু গোড়ার দিকে কিছু বোঝা যায় না। পাজি লোকদের নয়, জোচ্চোরদের তো নয়ই। লোকটা যাই-ই বলুক না কেন, আমাদের একটু খটকা থেকেই গিয়েছিল, কিন্তু ওই চালটার পরে—।'

'কী চাল ?'

'বলছি। এক ঘণ্টা লোকটা গল্প করল আমাদের সঙ্গে, তারপর বলল : এবার উঠি তা হলে। সাইটে গিয়ে ওয়ার্কারদের ছোট্ট একটা পেমেন্ট করে অন্য কাজে ছুটতে হবে। ঠিক চারটের সময় আমাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে মারুতিতে উঠল, ফিরে এল দু-তিন মিনিট বাদেই। কী ব্যাপার ? একটু ইতস্তত করে বলল— সাদা রঙয়ের ছোট্ট একটা প্যাকেট কি এখানে ফেলে গিয়েছি ? আমরা বসার ঘরেই বসেছিলাম। কাজের লোকদের ওটা সরাবার প্রশ্ন উঠছে না। খোঁজ হল ভাল করে। না, কোনও প্যাকেটট্যাকেট নেই। সোফা, কার্পেটে কাগজের একটা কুচিও পড়ে ছিল না। লোকটার চোখেমুখে তখন কী বিব্রত ভাব। বলল, তা হলে চৌরঙ্গির ওই সিগারেটের দোকানটাতেই ফেলে এসেছি। সিগারেট কিনতে নেমেছিলাম একবার। শুধু শুধু কষ্ট দিলাম আপনাদের।'

'কী ছিল ওই প্যাকেটটাতে ?'

'আমরাও ওই প্রশ্নটা করেছিলাম। প্রথমে কিছুতেই বলবে না। পরে বলল, ঠিক আছে

বলছি, তবে আপনারা ও নিয়ে ভাববেন না। একটু অসুবিধে হবে ওয়ার্কারদের, কিন্তু পরে আমি ওদের কমপেনসেট করে দেব অন্য ভাবে।'

'বলল না কী ছিল প্যাকেটটাতে ?'

'বলল, বেশ কিছুক্ষণ নাটক করার পরে বলল। বলল, প্যাকেটটাতে আট হাজার টাকা ছিল। দশজন লেবার ছুটিতে যাচ্ছে ভাগলপুরে। কী-একটা উৎসবটুৎসব আছে ওদের। বাড়তি কিছু টাকা চেয়েছিল। আমি বলেছিলাম—ঠিক আছে, দিয়ে দেব। আসলে পেমেন্টের ব্যাপারগুলো সারে ম্যানেজাররা। ওদের অন্য জায়গায় পাঠিয়েছি, তার ফলে কাজটা আমার ঘাড়ে চেপে গেছে। এখন ব্যাঙ্ক বন্ধ। টাকা যে তুলব তারও উপায় নেই। টাকা না পেলে ওদের খুব মন খারাপ হয়ে যাবে জানি, কিন্তু কী আর করা যাবে।'

'টাকা চাইল কি আপনাদের কাছে ?'

'না-না, চাওয়াচাওয়ির কোনও প্রশ্নই ওঠে না। আমরা বারবার প্রশ্ন করায় ওই গল্পটা শুনিয়েছিল। তারপরেই বলেছিল ঠিক আছে, চলি এখন! আপনারা এসব নিয়ে একদম ভাববেন না। আমাদের মনের অবস্থাটা তখন ভেবে দেখুন। আমাদের কুটুম হতে যাচ্ছে, আর তার বিপদে আমরা চুপ করে থাকব।'

স্ত্রীর কথার খেই ধরে প্রিয়ব্রত বললেন, 'তারপর কী হল জানেন ? মনে হল, টাকাটা আমরাই হারিয়েছি। টাকা এখন জোগাড় করার দায়িত্বও আমাদের। লোকটাকে বসতে বলেছিলাম। ও বসেছিল, আর ছটফটানি শুরু হয়ে গিয়েছিল আমাদের। একসঙ্গে অত ক্যাশ টাকা বাড়িতে থাকে না। চেকবই আছে, কিন্তু চেকে তো আর ওইসব লেবারের পেমেন্ট হয় না। তমালিকা বলল, ঠিক আছে আমি দেখছি। তারপর এ-আলমারি সে-আলমারি, এ-বাক্স সে-বাক্স ঘাঁটাঘাঁটি করে আট হাজার টাকা জোগাড় হল। তারপর টাকাটা লোকটার হাতে তুলে দিলাম। একটু না-না করছিল, কিন্তু চাপাচাপি করায় নিল। টাকা নিয়ে মারুতি চেপে চলে যেতেই আমার মনে হয়েছিল—বিরাট একটা বোকামি করে ফেলেছি। চিনি না জানি না, টেলিফোনে যোগাযোগ করে বিয়ের একটা সম্বন্ধ নিয়ে এসেছিল। যা বলেছে তা তো মিথ্যেও হতে পারে। এইটুকু আলাপে অতগুলো টাকা হাতে তুলে দিলাম। আমার আশঙ্কার কথা তমালিকাকে বলতেই ও বলল, লোককে অবিশ্বাস করা তোমার একটা স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। পরে অবশ্য ওরও খটকা লেগেছিল।'

প্রিয়ব্রতকে থামিয়ে দিয়ে আবার মুখ খুলল তমালিকা। 'সত্যিই তাই। প্রথমে আমি উলটো কিছু ভাবতেই পারিনি। যে লোকটা এতক্ষণ ধরে অত ভাল ভাল কথা বলে গেল, তাকে কি চট করে জোচ্চোর ভাবা যায়। কিন্তু পরের দিকে আমারও একটু-একটু করে সন্দেহ হতে শুরু করেছিল। এখন ভাবি, লোকটা ওই টাকা নিয়ে ভেগে গেলে ভাল হত। আমাদের তাহলে এ ভাবে কপাল পুড়ত না।'

'পরদিন এসে কি টাকা ফেরত দিয়ে গিয়েছিল ?'

'পরদিন নয়, ঠিক পনেরো মিনিট পরে। আমরা তখনও বসার ঘরেই। বাড়ির সামনে

মারুতি এসে দাঁড়াল। লোকটা ব্যস্তসমস্ত হয়ে নামল গাড়ি থেকে। কী ব্যাপার? এসেই বলল, আপনাদের অযথা হয়রানি করানোর জন্য লজ্জিত। কিছুটা যাওয়ার পরে দেখি সিটের খাঁজে আটকে আছে আমার টাকার প্যাকেটটা। এই নিন আপনাদের টাকা। আমি আর ও দুজনেই তখন ভাবছি, একটু আগেই ওর সম্পর্কে কত আজেবাজে কথা বলেছি; সেগুলো ওর কানে গেলে কী বিচ্ছিরি ব্যাপার হত। আমাদের টাকাটা আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে লোকটা বলল: যাই, দৌড়োই এবার। লেবাররা হাপিত্যেশ করে বসে আছে। টাকা পেলে দেশের ট্রেন ধরবে।'

তমালিকা থামতেই ইন্সপেক্টর ওঁর ভারী হাতের একটা থাপ্পড় সোফার হাতলে কষিয়ে দিয়ে বললেন, 'ডেঞ্জারাস! এ তো সাঙ্ঘাতিক ধড়িবাজ। আট হাজার টাকা ফেরত দিয়ে আপনাদের আস্থা ষোলো আনার ওপর আঠেরো আনা আদায় করে নিল। এ লোককে তখন আপনারা বোধহয় ব্ল্যাঙ্ক চেকও সই করে দিতে পারতেন।'

থমথমে মুখে জবাব দিল তমালিকা, 'ঠিক বলেছেন, ওই ঘটনার পর থেকে লোকটার একটা কথাও আমরা আর অবিশ্বাস করিনি।'

প্রিয়ব্রত পকেট থেকে রুমাল বার করে কপালের ঘাম মুছে নিয়ে বললেন, 'থিয়েটার রোডে একটা মাল্টিস্টোরিড অ্যাপার্টমেন্টের ঠিকানা দিয়েছিল নিজের অ্যাপার্টমেন্ট বলে। আমরা ফোন করে কথাটথাও বলেছি কয়েকবার। পরে জেনেছি ওটা একটা ফার্নিশ্‌ড গেস্ট হাউস।'

কৌশিক প্রশ্ন করল, 'ছেলেকে কবে দেখলেন?'

'দুদিন বাদেই।'

'ছেলেকে দেখে কী মনে হয়েছিল?'

'কী বলব! দারুণ হ্যান্ডসাম। অত্যন্ত মার্জিত, শিষ্ট। আলাপ করে আমার মেয়ে তো দারুণ ইম্‌প্রেস্‌ড। ঠিক হল, ছেলের বাবা বিদেশ থেকে ফিরলে আমরা হায়দ্রাবাদের বাড়িতে গিয়ে দিনটিন ঠিক করব। এ প্রস্তাব আমাদের নয়, ছেলের কাকারই। আমরা যে কথা বলতে চেয়েছিলাম, আগ বাড়িয়ে ওই লোকটাই তা বলে দিয়েছিল।'

'তার মানে লোকটা আর একবার আপনাদের আস্থা অর্জন করল।'

'ঠিক তাই। আমরা বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে ছিলাম। এমন সময় লোকটা এসে আর এক চাল চালল। বলল, একটা বিজনেস ডিলে ছেলের বাবাকে জোহান্সবার্গ যেতে হচ্ছে। এটা নাকি ওর ব্যবসার মস্ত বড় একটা এক্সটেনশন। পাঁচ মাস আটকে থাকবে ওখানে। শুনে আমাদের খুব মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল।'

'স্বাভাবিক। শুভ কাজ পিছিয়ে গেলে সবারই মন খারাপ হয়।'

'আমাদের টেনশন বাড়িয়ে দেওয়ার পরে লোকটা বলল: ছেলের বাবা ঠিক দেড় দিনের জন্যে দেশে ফিরছে সামনের সপ্তাহে। আমাকে টেলিফোনে বলছিল ওই সময় যদি কোনও শুভদিন থাকে, আর পাত্রীপক্ষ যদি রাজি হয়, রেজিস্টার্ড ম্যারেজটা তাহলে হয়ে যাক।

আমার পকেট-ডায়েরিতে শুভদিনের একটা লিস্টি আছে। দেখে বললাম, শুভদিন তো আছে, কিন্তু পাত্রীপক্ষের ওপর এই চাপটা দেওয়া বোধহয় ঠিক নয়। দাদা বলল, সেটা ঠিক। তবু তুমি একবার কথা বলে দেখ। এখন তেমন কোনও অনুষ্ঠানের মধ্যে না গিয়ে বিয়েটা হয়ে যাকে। পাঁচ মাস পরে ফিরে এসে দাদা দুটো পার্টি থ্রো করবে। একটা কলকাতায় একটা হায়দ্রাবাদে। শেরাটন গ্রুপের সঙ্গে কথা বলে দুটো লাইকলি ডেটে দুটো হোটেলের ব্যাঙ্কোয়েট হল আর অনেকগুলো রুম বুক করতে বলে দিয়েছে আমাকে। বিদেশ থেকে দাদার বেশ কয়েকজন ডিস্টিংগুইশ্‌ড গেস্ট আসবে। দাদার ধারণা, বিয়ে হয়ে গেলে ছেলে ব্যবসাতেই থাকবে। দেরি হলে কলেজে পড়ানোর চাকরি নেবে। এইসব শুনিয়ে বলল, দাদার এই আশঙ্কটা অমূলক। সোমেন আমাকে যখন কথা দিয়েছে, কথার নড়চড় ও কিছুতেই করবে না।'

'সোমেন কে?'

'ছেলের নাম।'

'কাকা-সাজা লোকটা নিজের নাম কী বলেছিল আপনাদের?'

'নীলাঞ্জন সামন্ত।'

'আচ্ছা, বিয়ের আসরে ছেলের বাবার তো আসার কথা ছিল, এসেছিল?'

'না, কিন্তু ওরা এমন ভাব দেখাচ্ছিল যে, যে-কোনও মুহূর্তে এসে পড়বে। ছেলে আর ছেলের কাকা উদ্বিগ্ন মুখে বারবার ঘড়ি আর দরজার দিকে তাকাচ্ছিল। ছেলের কাকার পকেটে একটা সেলফোন ছিল। বিয়ের একটু আগেই সেটা বেজে উঠেছিল। বিড়বিড় করে কীসব বলার পর লোকটা বলল, ব্যবসার কাজে দাদা আটকে গেছে, এক সপ্তাহ পরে আসবে। মেয়েকে আশীর্বাদ জানিয়েছে ফোনে।'

'পুরো ব্যাপারটাই একেবারে অঙ্ক কষা। পাক্কা র‍্যাকেট।'

'ঠিক বলেছেন। আমাদের একেবারে পুতুল বানিয়ে দিয়েছিল।'

ইন্সপেক্টর ঘোষরায়ের চোখমুখ থমথমে হয়ে গিয়েছিল। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে বললেন, 'মেয়ের সঙ্গে গয়নাগাটি গেছে সাত লাখ টাকার মতো, তাই তো বলছিলেন তখন?'

শুকনো মুখে একদিকে মাথা কাত করলেন প্রিয়ব্রত।

'নগদ টাকা কিছু হাতিয়েছে নাকি?'

'না, তেমন কিছু নয়। এটা আমি অবশ্য পরে জেনেছি। তমালিকা বলছিল সোমেনের বাবা এসে পৌঁছতে পারেনি। বেড়াতে যাওয়ার সময় মেয়ের হাতে তাই ও বিশ হাজার টাকা দিয়ে দিয়েছিল।'

ঘরের আবহাওয়া আবার ভারী হয়ে গিয়েছিল বেশ। একটু বাদে কৌশিক জিজ্ঞেস করল, 'হায়দ্রাবাদের ওই ব্যবসায়ী, যাকে ওরা ছেলের বাবা সাজিয়েছিল, তার সঙ্গে যোগাযোগ হল কবে?'

'কাল রাত্তিরে। কালকেই উনি বিদেশ থেকে ফিরেছেন। সব শোনার পরে বললেন, বুঝতে পারছি আপনারা চিটের খপ্পরে পড়েছেন। এক্ষুনি পুলিশকে সব জানান। রাত্তিরে কাউকে আর কিছু বলার মতো মনের অবস্থা ছিল না। আজ সকাল হতে ইন্সপেক্টর ঘোষরায়ের কাছে ছুটেছিলাম।'

।। পনেরো ।।

দুপুরের শুরুতে কলেজ স্ট্রিট কফি-হাউসের চেহারাটা একটু অন্যরকম থাকে। ফাঁকা-ফাঁকা। আলো-হাওয়া দিব্যি খেলা করে বিশাল হাউসে। বাতাসে ভাসে চমৎকার কফির গন্ধ। কোণের দিকে একটা টেবিলে এসে বসল প্রমিতা আর কৌশিক। সন্ধের দিকের জমজমাট কফি-হাউসের টেবিলে বেয়ারা আসতে একটু দেরি করে। কিন্তু এখন খদ্দের তো নামমাত্তর, সুতরাং বসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই টেবিলে হাজিরা দিল বেয়ারা। কফি আর স্যান্ডুইচের অর্ডার নিয়ে বেয়ারা চলে যেতেই কৌশিক জিজ্ঞেস করল, 'বলো, কী জন্যে ডেকেছ?'

প্রমিতা ওর ধনুকের মতো ভুরুদুটো প্রায় এক ইঞ্চি ওপরে তুলে বলল, 'তুমি সত্যি দিনদিন কেমন যেন হয়ে যাচ্ছ। আমি কি তোমাকে ব্যবসার কাজে ডেকেছি?'

কৌশিক একটু লজ্জা পেয়ে বলল, 'না-না, অনেক সময় কিছু দরকারি কথাবার্তা থাকে তো আমাদের।'

ধনুকদুটো আবার আগের জায়গায় ফিরে এসেছে। এবার একটু বুঝি অভিমান জমেছে প্রমিতার গলায়। 'না, এখন আমার কোনও দরকারি কথাবার্তা নেই। কফিটা খেয়ে তুমি চলে যেতে পারো।'

রহস্যময় একটা হাসি খেলে গেল গোয়েন্দার ঠোঁটে। কিন্তু গলাটা একটু করুণ-করুণ করে ও বলল, 'সত্যি, আমাদের পেশাটা খুব বাজে। একমাত্র কাজ হল অপরাধীদের পেছনে ছুটে বেড়ানো। যা কিছু ভাল তার মধ্যে মন্দ খুঁজে বার করা। আর সব চাইতে খারাপ দিক হল— সব কিছুকে সন্দেহ করা। এই পেশার লোকরা অবশ্য এর ওপর একটা মহত্ত্ব চাপিয়ে দিয়েছে। কাজটাকে বলে সত্যান্বেষণ। আর যে সত্য খুঁজে বেড়ায় সে নাকি সত্যান্বেষী। ঠিক আছে, তর্কের খাতিরে মেনে নিলাম কথাটা সত্যি। কিন্তু সমাজের উপকার করতে গিয়ে গোয়েন্দার নিজের যে মস্ত ক্ষতি হয়ে যায়, সে ব্যাপারটার দিকে কেউ তো ভুলেও তাকায় না। পেশার বাজে দিকটা এক সময় চেপে ধরে গোয়েন্দাকে। ভালকে ভাল ভাবে নিতে পারে না। সন্দেহপ্রবণ হয়ে পড়ে। কয়েক দিন আগে একটা রিপোর্টে পড়ছিলাম, এই স্নিফার ডগরা— । স্নিফার ডগদের কাজ কী জানো?'

প্রমিতা এখন কৌতূহলী শ্রোতা হয়ে গেছে। দুদিকে মাথা নাড়াল ও।

পৃথিবীর বেশির ভাগ মানুষই নিজের পেশা নিয়ে কথা বলতে ভালবাসে। গোয়েন্দা ওর চেয়ারটা প্রমিতার আর একটু কাছে টেনে নিয়ে এসে বলল, 'কুকুরদের তো মারাত্মক ঘ্রাণশক্তি। এই শক্তিটাকে আজকালকার পুলিশ আর সিকিউরিটির লোকবা খুব কাজে লাগায়। আমাদের দেশের বড়-বড় নেতারা মঞ্চে উঠে বক্তৃতা করার আগে স্নিফার ডগকে এনে গোটা মঞ্চটাকে শুঁকিয়ে নেওয়া হল। এদের স্পেশাল ট্রেনিং থাকে, কোথাও কোনও বোমাটোমা লুকনো থাকলে ঠিক বার করে দেয়। অপরাধীরা কাউকে হয়তো খুন করে পালিয়েছে। স্নিফার ডগ এনে সেই খুন-হওয়া লোকটাকে শোঁকানো হয়, অপরাধীদের ফেলে-যাওয়া অস্ত্রটস্ত্র থাকলে তাও শুঁকিয়ে নেওয়া হয়। তারপর পুলিশের কুকুর ওই গন্ধ শুঁকে শুঁকে অপরাধী ধরে কিংবা লুকনো জিনিসপত্তর উদ্ধার করে দেয়। সব সময় অবশ্য পারে না। কিন্তু কুকুরগুলোর মস্ত একটা ক্ষতি হয়ে যায়। ওই রিপোর্টটা বলছিল— আজেবাজে জিনিস বেশি শোঁকা মানে বেশি পরিমাণে আজেবাজে জিনিস শরীরে ঢুকে যাওয়া। শরীরের মধ্যে খারাপ জিনিস বেশি জমার অর্থই হল অকালমৃত্যু। স্নিফার ডগদের বেশির ভাগই স্বল্পায়ু হয়। পুরো জীবনটা বাঁচতে পারে না। গোয়েন্দাদের ওইরকম অকালমৃত্যু হয় না, তবে অপরাধীদের হাতে মারা পড়ার একটা আশঙ্কা তো থেকে যায়ই। এটা আমি বাদ দিচ্ছি। যে যুদ্ধের যে নিয়ম সেটা তো মানতেই হবে। তবে মানসিক দিক থেকে গোয়েন্দাদের কোনও ক্ষতি হয় কিনা— সেটা কিন্তু এখনও জানা যায়নি।'

শেষের দিকের কথাগুলো শুনে ভাল মানুষ প্রমিতাকে একটু বিচলিত দেখাল। ও শুকনো মুখে বলল, 'আচ্ছা, প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটরদের অনেকে শুনেছি, কম ঝুঁকির নানা কাজ করে থাকে। তুমি সেই রকম কিছু করলে তো পারো।'

'কম ঝুঁকি মানে?'

'কম ঝুঁকি মানে কম ঝুঁকি। তুমিই তো একদিন বলছিলে, কিছু কিছু ডিটেকটিভ এজেন্সি আছে যারা খুনখারাপির তদন্তের মধ্যে যায় না। অন্য ধরনের কাজকর্ম করে। একদিন বলছিলে—।'

গলা ছেড়ে হেসে উঠে গোয়েন্দা বলল, 'সে সব কাজ করা কি ঠিক হবে?'

'কেন, অসুবিধেটা কোথায়?'

'এই ধরো আমাকে অ্যাসাইনমেন্ট দিল খুব বড়লোকের এক বউ। তার সন্দেহ, তার কর্তা—মানে সাহেবের সঙ্গে তার লেডি সেক্রেটারির একটু ইয়ে আছে। অফিসের পরে দুজনে মিলে হোটেল-রেস্টুরেন্টে যায়। গোয়েন্দার কাজ হল সাহেবের পিছু নিয়ে সব কিছু জেনে মেমসাহেবকে জানানো। একটু তথ্য প্রমাণ, ছবি-চিঠি ইত্যাদি জোগাড় করতে পারলে ভাল হয়। সে সব আবার দাখিল করতে হবে মেমসাহেবের কাছে।'

'মেমসাহেব জেনে কী করবে?'

'টিট্ করবে সাহেবকে। কিংবা ডিভোর্সের দিকে যাবে। উল্টোদিকের ঘটনাও ঘটে আবার।'

'কী রকম?'

'স্বামীর সন্দেহ— সে অফিসে বা কাজকর্মে বাইরে গেলে মেমসাহেব বাড়িতে তার বয় ফ্রেন্ডকে ঢোকায়। কজন বয় ফ্রেন্ড, সম্পর্ক কতটা গভীর— এসব জানাতে হবে গোয়েন্দাকে।'

ঠোঁট উলটে প্রমিতা বলল, 'বাড়িটা তো আর হোটেল-রেস্টুরেন্ট নয়; বাড়ির ভেতরের ব্যাপার গোয়েন্দা জানবে কী করে?'

'জানতে হবে। না হলে গোয়েন্দার ব্যবসা টিকবে না। মাথা খাটিয়ে উপায় বার করতে হবে। চেষ্টা করতে হবে মেমসাহেবের সঙ্গে ভাব করার। আর একজন বয় ফ্রেন্ড হয়ে বাড়িতে ঢুকতে পারলে তো কথাই নেই। গোয়েন্দাগিরি হবে, একটু আবার ফুর্তিও হবে সেই সঙ্গে। কী, ওইরকম একটা এজেন্সি খুলব না কি?'

আর একবার ঠোঁট বাঁকাল প্রমিতা। 'বাজে কথা বোলো না তো।'

'বাজে নয়, ঠিক কথাই বলছি। এখন তুমিই বলো, ভয়ংকর খুনির পেছনে ছুটব, না সুন্দরী বউয়ের বয় ফ্রেন্ড ধরার কাজে লাগব।'

প্রমিতা মনে মনে অন্য কোথাও চলে গিয়েছিল। চট করে সেখান থেকে ফিরে এসে বলল, 'সুনেত্রাদির বরটা একটু খ্যাপাগোছের। আসলে খুব পণ্ডিত হলে ওইরকমই হয় বোধহয়।'

'কেন, কী করল আবার?'

'ওই তো বউয়ের ওপর রাগ দেখিয়ে খড়্গপুরের সেমিনার অ্যাটেন্ড করতে গেল, ফিরল একেবারে মাটির মানুষ হয়ে। আমি আড়াল থেকে একটু নজরে রেখেছিলাম। মনে হল, বউয়ের ওপর রাগ দেখাবার কথা বোধহয় ভুলেই মেরে দিয়েছে। সুনেত্রাদির সঙ্গে কী সুন্দর ব্যবহার, গল্প। এই ভাবে দিনদুয়েক কাটাবার পরে আবার প্রচণ্ড খেপে উঠেছিল।'

'কেন? এবার কী দোষ করেছিল তোমার সুনেত্রাদি?'

'দিদি কিছুই করেনি, রাগ দিদির ওপরেও নয়।'

'তবে কার ওপর?'

'ওর কীসব বইপত্তর না লেখাপত্তর হারিয়েছে। কিন্তু ওর ধারণা, চুরি হয়েছে। চুরি করেছে ও-বাড়ির কাজের লোক দেবু।'

'লোকটা কি ওই বাড়িতে সবে এসেছে?'

'না-না, অনেক দিনের লোক। প্রফেসর ভট্‌চাজের ঘরের জিনিসপত্র ওই তো গুছিয়ে রাখে। গোছানো মানে বইপত্তর গুছিয়ে রাখা। অনেক সময় কাগজপত্তর নীচেয় পড়ে থাকে, সেগুলোও তুলে রাখে। প্রফেসর প্রায়ই তড়পায়—বইপত্তরে হাত দেবে না। যা যেমন আছে তা ঠিক তেমনি থাকুক। ঘর গোছানো নিয়ে কাজের লোকের কোনও মাথাব্যথা নেই। যা বলবে তাই শুনবে। কিন্তু কী হত জানো, পাঁচ-ছদিনের মধ্যে অত বড় সেক্রেটারিয়েট টেবিলটা বইয়ের পাহাড় হয়ে যেত। তাক থেকে বই নামানো হয়েছে, কিন্তু তোলার ব্যাপার নেই। তার ফলে ওই বইয়ের পাহাড়ের খাঁজে দিনে অন্তত বারতিনেক অধ্যাপকের চশমা হারাত, কলম হারাত। ওই হারোনোর ব্যাপারটা সামাল দেওয়ার জন্য দিদি দেবুকে বলেছিল— বাবু যাই বলুক না কেন, তুই রোজ সকালে এসে টেবিলটা একবার গুছিয়ে দিয়ে যাবি। কাল একেবারে হুলস্থুল কাণ্ড। দেবু নাকি ওর দরকারি কাগজপত্তরটত্তর সরিয়েছে। আমি তখন ওই বাড়িতেই ছিলাম। অধ্যাপকের চেহারাটা একেবারে পালটে গিয়েছিল। দেবুকে এই মারে তো সেই মারে। দিদি কয়েকবার বোঝাবার চেষ্টা করে বলেছিল; দেবুর যা বিদ্যে তাতে তোমার দরকারি কাগজ খুঁজে নিয়ে ওর পক্ষে সরানো সম্ভব নয়। বিরাট পণ্ডিতরা বোধহয় সহজ যুক্তিগুলো ধরতে পারে না। অধ্যাপকের ধারণা, দেবু চুরি করেছে।

সুতরাং ওকে এক্ষুনি ও-বাড়ি থেকে তাড়ানো দরকার। বেগতিক দেখে সুনেত্রাদি আড়ালে দেবুকে বলেছে— তুই দেশের বাড়িতে সাতদিন ছুটি কাটিয়ে আয়। ফিরে যখন আসবে তখন ওকে তাড়াবার কথা হয়তো মনেই থাকবে না অধ্যাপকের।'

'কেন, মনে থাকবে না কেন?'

'বললাম না, অসম্ভব ভুলো মন। তারপর আবার নিজের কাজের চাপ আছে। পরশুদিন তো একটা সেমিনার অ্যাটেন্ড করার জন্যে পন্ডিচেরী যাচ্ছে। ওখান থেকে যাবে কালিকট না কোথায় যেন। যাক, এই সময় ওর বাইরে থাকাই ভাল। সুনেত্রাদি একটু হাঁপ ছেড়ে বাঁচবে। বন্ধুর সঙ্গে নিশ্চিন্তে গল্প করার সুযোগ মিলবে।'

'কোন্ বন্ধু?'

'সত্যিকারের বন্ধু বলতে তো একজনই— রিমিদি। রিমিদি আর ওর বর দিন-তিনেকের জন্যে ছুটি কাটাতে কলকাতায় আসছে জব্বলপুর থেকে।'

'অত দূর থেকে মাত্র তিনদিনের জন্যে।'

'বর তো ডাক্তার, বদলি ডাক্তার আসেনি বলে এত ছোট ট্রিপ। কিছুদিন পরেই অবশ্য লম্বা ছুটি নেবে। বন্ধুর আসার খবরে সুনেত্রাদি খুব এক্সাইটেড। ঠিক করেছে, একদিন ওদের বাড়িতে এনে রাখবে। অধ্যাপক কলকাতায় থাকলে এটা কিন্তু কিছুতেই সম্ভব হত না।'

'ওহ্। ও তো আবার সন্দেহ করে তোমার দিদির সঙ্গে তোমার রিমিদির বরের প্রেম আছে, তাই না?'

'পাগল হলে যা হয়। কী ভাবে এটা মাথায় ঢুকেছে কে জানে। সুনেত্রাদির মতো ভালমানুষকে নিয়ে এই ধরনের সন্দেহ কী করে আসে—ভগবান জানে!'

কৌশিক হেসে উঠে বলল, 'অধ্যাপকের তো ভুলো মন, দেখবে এই সন্দেহ করার ব্যাপারটাও বেমালুম ভুলে মেরে দিয়েছে।'

বেখাপ্পা কথাটার জবাবে ছোট্ট একটা বাঁকানো ঢেউ খেলে গিয়েছিল প্রমিতার ঠোঁটে। ভুরভুর করে গন্ধ উঠছিল কফির কাপ থেকে। এই ধরনের কাপ দেখেই বোধহয় লেখা হয়েছিল— দি কাপ দ্যাট চিয়ার্স। কফি খেয়ে বেশ একটা চনমনে ভাব এসে গিয়েছিল গোয়েন্দার। প্রমিতাকে বলল, 'শোনো, পাঁচ-ছটা দিন আমাকে আর পাবে না।'

'কোথায় যাচ্ছ?'

'অজ্ঞাতবাসে।'

'ওহ্। তোমাদের পেশায় তো আবার গন্তব্যস্থলের কথা বলা যায় না।'

রহস্যময় সেই হাসিটা আবার ফুটে উঠল গোয়েন্দার ঠোঁটে। 'তোমাকে বলতে আপত্তি কোথায়। তবে এখনও পর্যন্ত আমি নিজেই জানি না— ঠিক কোথায় কোথায় যাব। শুধু এটুকু জানি, প্রথমে গ্রামে যাচ্ছি, তারপর শহরে।'

কৌশিকের কথা শুনে ঝলমল করে হেসে উঠল প্রমিতা। 'বাহ্! তুমি তো সবই বলে দিলে। এই পাঁচ-ছ দিনের মধ্যে তোমাকে খুঁজতে গেলে তাহলে পাহাড়ে আর জঙ্গলে যাওয়ার দরকার নেই। শহর আর গ্রাম খুঁজলেই পাওয়া যাবে তোমাকে। তাই তো?'

কৌশিকও হাসল। 'হ্যাঁ, খোঁজার জায়গা মাত্র দুটো। চলো এবার ওঠা যাক।'

একটু ম্লান হল প্রমিতার মুখ। 'এর মধ্যেই!'

'আর বোলো না। দৌড়-ঝাঁপ তো শুরু করে দিয়েছি, শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে পৌঁছব কে জানে!'

'এখন কোথায় যাবে?'

'প্রথমে যাব আমার অফিসে, তার পর নানা জায়গায়। তুমি?'

'আমার স্কুল শেষ। এখন যাওয়ার জায়গা একটাই— বাড়ি।'

কফিহাউস থেকে বেরিয়ে গোয়েন্দা বলল, 'ঠিক আছে, গুড বাই। ফিরে এসেই ফোন করব তোমাকে।'

ফুটপাথের বইয়ের দোকানগুলোয় এর মধ্যেই বেশ ভিড় জমে গেছে। এই ফুটপাথ দিয়ে যারা হাঁটে তাদের প্রত্যেককেই দোকানদাররা ক্রেতা ভেবে নেয়। সুতরাং ফুটপাথ ছেড়ে রাস্তায় নেমে পড়ল ওরা দুজন। একটু বাদেই দুজনের পথ ঘুরে গেল দুদিকে।

অফিস খুলে নিজের চেয়ারে বেশ আয়েশ করে বসে সকালের খবরের কাগজ পড়ছিলেন মুখার্জিবাবু। গোয়েন্দাকে দেখে তড়াক করে উঠে বসলেন, 'আপনি! আপনি এখনও কলকাতায়!'

'হ্যাঁ, ছাড়ার মুখে, শনিবার রাত্তিরে যাব। এদিকে কোনও খবরাখবর আছে?'

'নতুন খবরের মধ্যে একটা হল আপনার ওই ভদ্রকের বন্ধু— কমলেশ গুপ্ত আজ সকালে আমার বাড়িতে এসেছিলেন।'

ঝকঝকে মুখে গোয়েন্দা বলল, 'আপনার সঙ্গে দেখা করে এসেছে। বাহ্!'

'হ্যাঁ, এসেছিলেন। খুব সুন্দর ব্যবহার ভদ্রলোকের। অনেকক্ষণ ধরে গল্পটল্প করলেন। বিয়ের বিজ্ঞাপন বেরুবে রোববারের কাগজে। ওই দিন সকালেই চলে আসবেন আমাদের বাড়িতে। পাত্রী তো বিবাট বড়লোক। আপনি তো কিছুই বলেননি আমাকে?'

'এর আবার বলাবলির কী আছে! কমলেশের জামাইবাবু মস্ত ধনী, এটুকু শুধু জানতাম। মধ্যিখানে পাঁচ বছর কমলেশের সঙ্গে আমাদের দেখা সাক্ষাৎই হয়নি। হালে অবশ্য বারদুয়েক দুটো জায়গায় দেখা হয়েছে। তবে খুব একটা গল্প করার সুযোগ পাইনি। এই রিকোয়েস্টটা টেলিফোনে। বলেছি বিয়েটিয়ের ব্যাপারে আমি একেবারেই আনাড়ি। তবু তোমার ব্যাপার যখন, আমার সাধ্যে যা কুলোয় তা করব।'

'শ্রবণার ব্যাপারটা জানেন তো?'

'শ্রবণা কে?'

'ও হরি, আপনি দেখছি এ-ব্যাপারে কিছুই জানেন না। অবশ্য জানবেনই বা কী করে! এ তো একেবারে হালের খবর। দেখা হলে কমলেশবাবু সব জানাবেন আপনাকে। খুব দুঃখের ব্যাপার। শোনার পর থেকেই মনটা খুব খারাপ হয়ে আছে। বারবার মনে হচ্ছে, এই তো আমাদের জীবন। প্রত্যেকের মাথার ওপর সরু সুতোয় বাঁধা মস্ত এক খাঁড়া ঝুলছে। সুতো ছিঁড়লেই খাঁড়ার ঘায়ে ধড় থেকে মুন্ডু আলাদা হয়ে যাবে। অথচ লাভ-লোকসানের চুলচেরা হিসেব কষতে গিয়ে প্রতি মুহূর্তে আমরা কামড়াকামড়ি, লাঠালাঠি করি—।'

কথাগুলো শুনতে শুনতে মুখার্জিবাবুকে বেশ ভাল করে দেখে নিয়ে গোয়েন্দা জিজ্ঞেস করল, 'কেউ কি মারাটারা গেছে?'

'কমলেশবাবু সব বলবেন আপনাকে। খুব দুঃখের ব্যাপার। ওঁর দিদি-জামাইবাবু

পশুপতিনাথ দর্শন করতে গিয়েছিলেন কাঠমাণ্ডুতে। গিয়েছিলেন এয়ারে। ফেরার সময় গাড়িতে আসছিলেন। পাহাড়ি পথ দিব্যি পেরিয়ে রক্সৌলে যখন পৌঁছেছেন তখনই গাড়ি উলটলো। ছোট খাদ, কিন্তু বেয়াড়া ভাবে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই মারা গেলেন ওঁর দিদি। জামাইবাবুর অবস্থাও ভাল নয়। দিল্লিতে চিকিৎসা চলছে। এখন ওঁর একমাত্র চিন্তা— উনি চলে গেলে ওঁর মেয়েকে কে দেখবে! কমলেশবাবুরা আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু ওঁকে শান্ত করা যায়নি। এক কথা— আমি চলে গেলে আমার মেয়ের কি হবে! একমাত্র সন্তান তো। আসলে ভদ্রলোকের বিরাট ব্যবসা। মস্ত বড় পেপার ডিস্ট্রিবিউটর, পেপার মিল তৈরির দিকে এগোচ্ছেলেন—। মেয়ে-জামাইকে পুরো ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিতে চান চটপট। সেই জন্যেই বোধহয় নার্সিংহোমে ঢোকার পর থেকে মেয়ের বিয়ে বিয়ে বলে অস্থির হয়ে পড়েছেন।'

অবাক হয়ে কৌশিক বলল, 'এত ব্যাপার! আমি তো কিছুই জানি না। ঘুরে এসেই দেখা করতে হবে কমলেশের সঙ্গে। আপনি যতটা যা পারেন, করবেন কিন্তু।'

অভয় দিয়ে মুখার্জিবাবু বললেন, 'আপনি এ নিয়ে কিছু ভাববেন না। আমি তো আছিই। যথাসাধ্য হেল্প করব ওঁকে।'

কৌশিক দেয়াল-আলমারি খুলে একটা ব্রাউন রংয়ের প্যাকেট বার করে ফোলিও ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, আমি চলি এখন। ভাল কথা, আপনি ওই ট্রাভেল এজেন্টের সঙ্গে একটু যোগাযোগ রাখবেন। ওদের প্যাসেঞ্জার-লিস্টটায় একটু নজর দিতে হবে। নতুন কি বুকিং-টুকিং হল— দেখে নেবেন কায়দা করে।'

'আপনি এখন কোথায় চললেন?'

'প্রথমে যাব পুলিশের ওই শিল্পী সি, প্রসাদের কাছে।'

'প্রসাদ মানে যিনি অপরাধীর চেহারার বর্ণনা শুনে ছবি আঁকেন?'

'হ্যাঁ।'

'কার ছবি আঁকাবেন? এই কেসের কোনও অপরাধী কি?' বেশ উৎসাহের সঙ্গে প্রশ্ন করলেন মুখার্জিবাবু।

'জোর দিয়ে বলতে পারছি না, তবে হলেও হতে পারে।'

'কী রকম চেহারা বলুন তো?'

মুখার্জিবাবুর উৎসাহে ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিয়ে ঠাণ্ডা গলায় গোয়েন্দা বলল, 'ঠিক আছে, আমি চলি এখন, সাবধানে থাকবেন। ও হ্যাঁ, কমলেশ এখানে কোথায় উঠেছে বলুন তো?'

'মিন্টোপার্কের কাছে একটা গেস্টহাউসে।'

'ওর ফোন নাম্বারটা আছে আপনার কাছে?'

পকেটটকেট হাতড়ে জিভ কেটে সহকারী বললেন, 'এই রে বাড়িতে ফেলে এসেছি। বেশ সোজা নম্বরটা— টু ফোর টু— ন্না, আসলে এই টেলিফোন নম্বরটম্বরগুলো কিছুতেই আমার মনে থাকে না। মনে রাখার জন্যে বারবার মুখস্থ করি। সব সময় তো আর হাতের কাছে ডায়েরি থাকে না। কিন্তু যতই মুখস্থ করি কবি না কেন, প্রয়োজনের সময় দেখি— ঠিক ভুলে মেরে দিয়েছি।'

কৌশিক হেসে বলল, 'মনে রাখা খুব সহজ যদি একটা সহজ কায়দা কাজে লাগান।'

ঠাণ্ডা মুখার্জিবাবু দপ্‌ করে জ্বলে উঠে বললেন, 'কী কায়দা, একটু বলে দিয়ে যান তো।'

নিজের চেয়ারটায় আবার বসে পড়ে কৌশিক বলল, 'বলতে গেলে অনেক কথা বলতে হয়। ঠিক আছে, ছোট করে বলছি। আপনি আপনার স্কুল ছেড়েছেন কদ্দিন আগে?'

'ওহ্ বাবা, তা অন্তত চল্লিশ বছর আগে।'

'অদ্দিন আগের স্কুলজীবনের সব কথা নিশ্চয়ই আপনার মনে নেই। কারুরই থাকে না। কিন্তু এখন যদি আপনাকে নিয়ে গিয়ে ওই স্কুলের একটা ক্লাসরুমে বসিয়ে দেওয়া হয়, আপনার দেখবেন হঠাৎ এমন অনেক কথা মনে পড়ে যাবে যেগুলো আপনি বেমালুম ভুলে মেরে দিয়েছিলেন। পুরনো কথা মনে করতে আপনাকে সাহায্যে করবে পুরনো দিনের সেই বেঞ্চি, ডেস্ক, ব্ল্যাক বোর্ড, মাস্টারমশাইয়েব বসার চেয়ার-টেবিল, ঘবেব দরজা-জানালা, জানলার বাইরের দৃশ্য। পুরনো কথা কেন মনে পডবে জানেন?'

'কেন?'

''পুবনো পরিবেশ পুরনো কথা মনে পড়িয়ে দেয়। ইংরেজিতে একে বলে 'লিঙ্ক মেথড' বা 'অ্যাসোসিয়েশন'। পুরনো দিনের চেনা দৃশ্য পুবনো কথা মনে কবাবেই। ওখানে সশরীরে হাজির না হলে কিন্তু হারিয়ে-যাওয়া ওই কথা বা ঘটনাগুলো আপনার কিছুতেই মনে পড়ত না। বিশেষজ্ঞরা একেই বলেছেন, লিঙ্ক মেথড। ধরুন, আপনাকে ছটা জিনিস মনে করে নিয়ে আসার কথা বলা হল। জিনিসগুলো হল একছড়া কলা, একটা সাবান, এক ডজন ডিম, একটা গ্লাস আর কিছু তুলো আর গজ। আপনি ট্রেনে উঠছেন সেই সময় বলে দেওয়া হল। জিনিসগুলো আনতে হব এক সপ্তাহ বাদে। আপনার কাছে কাগজ-কলম নেই। টুকে রাখবেন তার উপায় নেই। এখন আপনি যদি লিঙ্ক মেথডের সাহায্য নেন, তাহলে ওগুলোর কথা কিন্তু কিছুতেই ভুলবেন না।''

মুখার্জিবাবুর চোখমুখ বেশ চকচকে দেখাচ্ছিল। 'কীরকম?'

কৌশিক হাসল। 'লিঙ্ক মেথড মানে একটার সঙ্গে আর একটাকে লিঙ্ক করা বা জুড়ে দেওয়া। আর এই ব্যাপারে আপনাকে একটু অসম্ভব কল্পনার সাহায্য নিতে হবে। এই পরামর্শটাও বিশেষজ্ঞদের। অসম্ভব কিছু ভেবে নিলে সেটা আর পাঁচটা সাধারণ জিনিসের সঙ্গে মিশে যায় না। ঠিক আছে, এবার ওই ছটা জিনিসকে মেশান তো।'

অবাক হবে মুখার্জিবাবু বললেন, 'কী করে মেশাব। ওগুলো তো মিশ খায় না।'

'ঠিক আছে আমি মেশাচ্ছি। কলার খোসা বা ভেজা সাবানে পা পড়লে আছাড় খাওয়ার আশঙ্কা থাকে তো?'

'তা থাকে।'

'বেশ, আপনি ভেবে নিন—আপনার এক পায়ের নিচে কলার খোসা, অন্য পায়ের নীচে সাবান। আপনি মস্ত এক আছাড় খেলেন। আপনার এক হাতে ছিল ডিম, অন্য হাতে গ্লাস। আছাড় খেলে হবে কী? ডিমও ভাঙবে, গ্লাসও ভাঙবে। গ্লাস ভাঙলে হাত কাটবে। হাত কাটলে তুলো আর গজ লাগবে। উদ্ভট এই দৃশ্যটি মাথায় রেখে দিলে আপনি কি আর ছটা জিনিসের কথা ভুলতে পারবেন চট করে?'

তারিফ করার গলায় মুখার্জিবাবু বললেন, 'মন্দ বলেননি তো। আচ্ছা ওই টেলিফোন নাম্বার মনে রাখার কায়দাটা এবার শিখিয়ে দিন।'

হাতঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে গোয়েন্দা বলল, 'চট করে একটা টেলিফোন নম্বর বলুন— বানিয়েই বলুন না হয়।'

'বলছি—ধরুন 242·1085।'

'বেশ। ইংরেজি 2 কিন্তু হাঁসের মতো দেখতে। আর ইংরেজি 4 সংখ্যার চেহারা অনেকটা টেবিলের মতো। আপনি উদ্ভট কল্পনার সাহায্যে এবার ভেবে নিন একটা টেবিলের দুপাশে দুটো হাঁস। এদিকে এই দৃশ্য। ওদিকে 10 মানে লরেল আর হার্ডি। লরেল রোগা, হার্ডি মোটা। ওরা দেখছে 8 আর 5 কে। 8 মানে শেপ্‌লি একটি মেয়ে, আর তার পাশে 5 মানে একজন প্রেগন্যান্ট মহিলা। সংখ্যা দুটোর চেহারার সঙ্গে ওই রকম কল্পনা কিন্তু দিব্যি খাপ খেয়ে যায়। ওই উদ্ভট অ্যাসোসিয়েশন নিয়ে মনে মনে মজাদার একটা গল্প বানিয়ে ফেলুন এবার। তাহলে দেখবেন টেলিফোন নম্বরটা আপনি আর কিছুতেই ভুলতে পারছেন না।'

কথাটা শেষ করেই ফোলিও ব্যাগ হাতে নিয়ে ভিড়ের রাস্তায় মিশে গিয়েছিল গোয়েন্দা।

।। ষোলো ।।

'নাহ্! এ লাইন আর পাওয়া যাবে না। ডায়াল করলেই টেপ শুনিয়ে দিচ্ছে—অল লাইন্‌স আর বিজি, প্লিজ ডায়াল আফটার সাম টাইম। সাম টাইম মানে কি নো টাইম?'

ওপাশে দাঁড়িয়ে দেয়াল-ঘড়ির ব্যাটারি পালটাচ্ছিল নিমো. কৌশিকের কথার উত্তরে জিজ্ঞেস করল, 'কোথাকার লাইন দাদা?'

'ব্যাঙ্গালোর। আধঘণ্টা ধরে সমানে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি--।'

'খুব দরকারি ফোন?'

'ন্‌না, দরকারি ফোন হলে কেউ কি এতক্ষণ ধরে চেষ্টা করে। আমি ইয়ার্কি মারব বলে আধঘণ্টা ধরে টেলিফোন নিয়ে পড়ে আছি।'

দাদার কথায় কাজের ছেলেটি বেশ লজ্জা পেয়ে গেল। আমতা-আমতা করে কী যেন বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু মুখ থেকে কোনও শব্দ বেরুবার আগেই ডোর-বেল বেজে উঠল।

দরজা খুলে নিমো কাকে যেন বসাল, তারপর এ-ঘরে এসে বলল, 'মধুসূদন পুরকাইত বলে একজন আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।'

কথাটা শুনেই প্রায় লাফিয়ে উঠল গোয়েন্দা। তারপর নিমোকে ডায়েরির একটা নম্বর দেখিয়ে বলল, 'এই লাইনে ফোন করে যা সমানে। কাউকে পেলেই আমাকে দিবি।'

গোয়েন্দাকে দেখে অতিমাত্রায় বিনীত গুপ্তচরটি উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। কিছু-কিছু মানুষ আছেন যাঁদেব চোখমুখ সব সময়ই অভিব্যক্তিহীন। চোখমুখের চেহারা দেখে ভেতরের কথা বিন্দুমাত্র আন্দাজ করা যায় না। গোয়েন্দাকে দেখে বিনীত মানুষটি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে একটু যেন ঝুঁকে পড়লেন। 'আরে উঠলেন কেন, বসুন-বসুন।' গোয়েন্দার

কথায় আবার আগের ভঙ্গিতে আগের জায়গায় বসে পড়লেন মধুসূদন। মুখে মৃদু হাসি। মানুষটির মনের কথা পড়ার চেষ্টা করে গোয়েন্দা বলল, 'চা-টা খাবেন?'

দুদিকে মাথা নাড়িয়ে উত্তর দিলেন মধুসূদন, 'না, আমি একটু আগেই রাতের খাবার খেয়ে নিয়েছি।'

'এর মধ্যেই?'

'আমি একটু তাড়াতাড়ি ঝামেলা মিটিয়ে ফেলি। কাজে ফেঁসে গেলে অবশ্য আলাদা কথা।'

কথাটার উত্তরে গোয়েন্দা কিছু বলল না। আশা করছিল, গুপ্তচর এবার অন্য কথা পাড়বেন। মধুসূদন কিন্তু কোনও কথাই তুললেন না। অতিমাত্রায় বিনীত মানুষটি ঠিক আগের ভঙ্গিতে বসেই রইলেন। কয়েক মুহূর্ত স্থির থাকার পরে গোয়েন্দার মনে হল, প্রশ্ন না করলে মধুসূদন বোধহয় এই ভাবেই সারা রাত বসে থাকবেন।

গোয়েন্দা আরও কিছুক্ষণ চুপ করে ছিল, তারপর ধৈর্যহীন মানুষের ভঙ্গিতে আচমকা জিজ্ঞেস করে বসল, 'আপনাকে তো বেশ কয়েকটা ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে বলেছিলাম। নিয়েছেন কিছু?'

উত্তাপহীন গলায় জবাব দিলেন মধুসূদন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'সব ব্যাপারে বোধহয় নিতে পারেননি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, পেরেছি।'

গোয়েন্দার দৃষ্টি ধারালো হয়ে উঠছিল। মধুসূদনের চোখমুখের দিকে তাকিয়ে মনের কথা আর একবার পড়ার চেষ্টা করে বলল, 'তেমন-কিছু পাননি বোধহয়?'

অভিব্যক্তিহীন চোখমুখ তুলে মধুসূদন বললেন, 'পেয়েছি। আপনি ঠিকই আন্দাজ করেছেন, ওখানে খুব গোলমেলে ব্যাপার আছে।'

গোয়েন্দার ফর্সা মুখে লালচে একটা আভা ছড়িয়ে পড়েছিল। 'কীরকম?'

এদিক-ওদিক তাকিয়ে গলার স্বর বেশ খাদে নামিয়ে গুপ্তচর বললেন, 'এখানে বাইরের কেউ নেই তো?'

'না-না, কেউ নেই। সব কথা আপনি স্বচ্ছন্দে বলতে পারেন।'

তবু বাড়তি সাবধানতা নেওয়ার জন্যে মধুসূদন গোয়েন্দার একটু কাছে টেনে নিয়ে এলেন নিজের চেয়ারটা। কিন্তু মুখ খোলার আগেই পাশের ঘর থেকে নিমো চেঁচিয়ে উঠল, 'দাদা লাইন পেয়েছি।'

'আসছি' বলে ছুটে গিয়ে টেলিফোন ধরল, কৌশিক, তারপর বলল, 'কুড আই টক টু—। হোল্ড অন ফর আ মোমেন্ট প্লিজ।' মাউথপিস হাত দিয়ে আড়াল করে গোয়েন্দা বলল, 'পাশের ঘরের ভদ্রলোক চা-কফিটফি কিছু খাবেন কি না দেখ গিয়ে—।'

নিমো পরিষ্কার বুঝতে পারল দাদা গোপন কথাবার্তা ওর সামনে বলতে চায় না বলে কায়দা করে সরিয়ে দিচ্ছে। এটা একেবারেই ভাল লাগল না নিমোর। মনে মনে বলল: আমি তো তোমারই লোক। গোপন কথা কিছু শুনে ফেললে আমি কি আর লোক ডেকে ডেকে বলতে যেতাম। কিন্তু মনের সব কথা মুখে আনা যায় না বলে নিমো ব্যাজার মুখে এ-ঘর থেকে ও-ঘরে গিয়ে বলল, 'চা খাবেন তো?'

মধুসূদন কী যেন ভাবছিলেন, একটু চমকে উঠে বললেন, 'না-না, চা খাব না এখন!'

'কফি?'

'না।'

'কোল্ড ড্রিংক্স?'

'না।'

'শরবত?'

শরবতের কথায় মধুসূদন একটু দুর্বল হলেন। 'শরবত মানে দই দিয়ে তো?'

'হ্যাঁ।'

'বেশ দাও, তবে খুব একটা ঠাণ্ডা দিও না কিন্তু।'

রান্নাঘরে চলে গেল নিমো, তারপর একটু শব্দ করে শরবত বানাবার তোড়জোড় শুরু করে দিল।

একটু বাদে শরবতের গ্লাস একটা প্লেটের ওপর চাপিয়ে এ-ঘরে এসে নিমো দেখল, দাদা টেলিফোনের কথাবার্তা সেরে নতুন লোকটার সঙ্গে কথা জুড়েছে নিচু গলায়। ওকে দেখামাত্রই কথা থেমে গেল। ছোট্ট একটা টুল টেনে এনে অতিথির সামনে শববতের গ্লাসটা রেখে নিমো বলল, 'আমি একটু আসছি।'

'এখন আবার কোথায় যাবি?'

'কাল ভোরেই তো দেশে যাব, কয়েকটা জিনিস কেনা বাকি আছে।'

'ফিরবি কখন?'

নিমোর গলার শিরা সামান্য একটু ফুলে উঠেছিল। 'তোমাদেব দরকারি কথাটথাগুলো শেষ হলেই—।'

নিমোর অভিমানের কারণটা ধরতে পেরে খুব সূক্ষ্ম একটা হাসির রেখা ফুটে উঠেছিল গোয়েন্দার ঠোঁটে। 'ঠিক আছে যা, আমাদের কথা কিন্তু আধঘন্টা-চল্লিশ মিনিটের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে।'

এক ঘন্টা বাদে নিমো ফিরে এসে দেখল অতিথি চলে গেছে, আর ওর দাদা থমথমে মুখে ঘরের মধ্যে পায়চারি করছে। মুখচোখ থমথমে, মাঝেমধ্যে কপালে ভাঁজ ফুটে উঠছিল কয়েকটা।

নিমো লক্ষ করে দেখেছে, তদন্তের কাজ বেশ বড় রকমের একটা বাঁক নেওয়ার মুখে এলে দাদার চেহারাটা এইরকম হয়ে ওঠে। কেমন যেন অচেনা-অচেনা, কখনও-কখনও পায়চারি চলে একটানা বহুক্ষণ। হঠাৎ-হঠাৎ সোফার ওপর পা ছড়িয়ে বসে খাতায় বিদঘুটে সব অঙ্ক কষে। ওদিকে, রাতের খাবার পড়ে থাকে টেবিলেই।

দাদাকে খুব ভালবাসে নিমো। সেই দাদার ওইরকম চেহারা দেখে অপরাধীদের ওপর ওর খুব রাগ ধরে যায়। মনে মনে ওদের উদ্দেশে বলে: তোরা বড় মাপের কয়েকটা সূত্র ফেলে যেতে পারিস না? ফেলে গেলে দাদার খাটুনিটা কমত।

দাদার কষ্টের বহর দেখে নিমোর একটু আগের অভিমান গলে জল হয়ে গেছে একদম। ও নরম গলায় বলল, 'দাদা, একটু কফি করে দেব?'

গোয়েন্দা কথাটার কোনও উত্তর দিল না। একটু বাদে জিজ্ঞেস করল, 'তুই কাল ক'টার সময় বেরোবি?'

'ছটায়। সাতটা পাঁচে ট্রেন।'

'ভোরে উঠে এক কাপ চা করে দিবি। আমিও ওই সময় বেরোব। যা, খেয়েদেয়ে শুয়ে পড় এখন।'

নিমোর খুব বলতে ইচ্ছে করছিল—তুমি আগে খেয়ে নাও। কিন্তু বলার সাহস পেল না। মানুষটা এখন আরও গম্ভীর আর প্রায় পুরোপুরি অচেনা। কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকার পরে পায়ে পায়ে নিজের ঘরে ঢুকে পড়েছিল নিমো।

ভোর হতে না হতেই এ বাড়ির দুটি প্রাণী উঠে পড়েছিল বিছানা ছেড়ে। তৈরি হতে ওদের বেশিক্ষণ সময় লাগল না। নিমো এক কাপ চা এনে ওর দাদার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'ডিমের পোচ আর টোস্ট করে দিই ?'

'না-না, এখন আর কিচ্ছু খাব না। কাল রাত্তিরে খেতে খেতে অনেক দেরি করে ফেলেছিলাম। তুই যা খাওয়ার খেয়ে নে।'

ভোরের আবছা আলো আর একটু পরিষ্কার হতেই এ বাড়ির দুই বাসিন্দা বেরিয়ে পড়েছিল রাস্তায়।

নিমোর কাঁধে ঝুলছে পেটমোটা একটা ব্যাগ। দেশের বাড়ির জন্যে খুব একটা খারাপ সওদা করেনি ও। দুই রাস্তার মুখে এসে গোয়েন্দা বলল, 'তুই তাহলে পাঁচদিন পরে ফিরছিস। ডুপ্লিকেট চাবিটা হারাস না আবার। সাবধানে থাকিস।

'তুমি কবে ফিরছ ?'

'আমি ? তুই আসার একদিন আগে, কিংবা এক-দুদিন পরে।'

'তুমিও সাবধানে থাকবে দাদা।'

কিশোরটির কথা শুনে গোয়েন্দা হেসে উঠে বলল, 'ওই তোর বাস আসছে। উঠে পড়।'

যাত্রীর সংখ্যা খুব কম থাকে বলে ভোরের বাস বেশ জোরে ছোটাছুটি করে। এই বাসটা স্টপে দাঁড়িয়ে নিমোকে তুলে নিয়ে ছুট লাগাল সামনের দিকে। গোয়েন্দা একটা ট্যাক্সি ধরে বাস-গুমটিতে এসে রকেট সার্ভিসের একটা বাসে চড়ে বসেছিল।

নির্দিষ্ট সময়ে ছেড়ে দিল বাস। তারপর একটা লম্বা জার্নি। বাস থেকে নেমে ভ্যান-রিক্শা, তারপরে গরুর গাড়ি। দুপুর বারোটা-নাগাদ চণ্ডীপুরের চণ্ডীতলায় পৌঁছে গিয়েছিল কৌশিক। এই তো, সরু এই মেঠো পথটাই পৌঁছে গেছে অতীতের 'মা চণ্ডী স্টুডিও' আর আজকের 'কালীমাতা সার ভাণ্ডার'-এ।

গরুর গাড়ির ভাড়া মিটিয়ে গাড়ি থেকে নেমে মেঠো পথ ধরল কৌশিক। কী খোলামেলা প্রকৃতি এখানে। গাছপালা সবুজ, আকাশ নীল। দূষণহীন পরিচ্ছন্ন বাতাস বুকের মধ্যে টেনে নিলে আরাম লাগে। হাতের অ্যাটাচি নাচাতে নাচাতে পথ ভাঙছিল গোয়েন্দা। এ এলাকাটা এখন আর আগের মতো অচেনা নয়।

এই পথটাই পৌঁছে গেছে রাধাগোবিন্দ গিরির বাড়ির দিকে। চুরাশিটি বিয়ে করে গণ্ডগ্রাম চণ্ডীতলাকে বিখ্যাত করে দিয়েছেন ইনি। মাঝেমধ্যেই নানা জায়গা থেকে লোকজন আসে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে। দর্শনার্থীর মধ্যে লালমুখো সাহেব মেমও আছে। মাঝবয়সী মাধবরঞ্জন সেদিন তো কাকার কথা বেশ গর্বের সঙ্গে বলছিল। গর্বের সবচেয়ে বড় কারণ হল, কাকার বিয়ে তো জনকল্যাণমূলক কাজ। খেতে-পরতে পায় না এমন অনেক বাপ-মাকে উনি কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করেছেন।

বিয়েব পরে মেয়ের খাওয়া-পরার সমস্যাই যে মেটে শুধু তা নয়, নতুন বউয়ের নামে কিছুটা জমিও লিখে দেন রাধাগোবিন্দ। বিবেচক মানুষ। একাশি বছর বয়েস হয়েছে। কবে আছেন কবে নেই। সুতরাং ওঁর মৃত্যুর পরে ঝগড়াঝাটির মধ্যে না গিয়ে বউরা যাতে খেয়েপরে সুখে শান্তিতে থাকতে পারে—তার জন্যেই এই ব্যবস্থা। এই জন্যেই নাকি এই গাঁ আর আশেপাশে গাঁয়ের লোকজন দু-হাত তুলে আশীর্বাদ করে মানুষটাকে।

আরও কিছুটা হাঁটার পরে কৌশিক টের পেল ভুল পথে এসে পড়েছে। যাকগে, কিছু এসে যায় না তাতে। বাঁদিকের মাঠটা ভাঙলেই রাধাগোবিন্দর বাড়ি পাওয়া যাবে। এমন চমৎকার প্রকৃতির মধ্যে একটু আধটু পথ হারানোও বুঝি আনন্দের। গাছাপালা আর ঘাসের সতেজ গন্ধ নাকে এসে লাগছিল।

মাঠ ভেঙে কিছুটা হাঁটার পরেই আচমকা সানাইয়ের শব্দ ভেসে এল ওর কানে। এমন একটা নির্জন প্রায়-পরিত্যক্ত জায়গায় সানাই! সানাইয়ের শব্দে কৌশিকের ছেলেবেলার একটা কথা মনে পড়ে গেল হঠাৎই। ওর এক পিসতুতো ভাই পিন্টু করুণ মুখ করে প্রায়ই বলত—সানাইয়ের শব্দ কানে গেলেই ওর ভীষণ খিদে পেয়ে যায়। ছেলেবেলায় কোনও-কোনও বিয়েবাড়ির সামনে বাহারি নহবত বসত। সানাইয়ের সুর সেখান থেকে লাফিয়ে উঠে আকাশবাতাস ভারী করে দিত।

কৌশিক যত এগোচ্ছিল সানাইয়ের সুর ততই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। মাঠের শেষে বাঁশবন, বাঁশবন পেরুতেই রাধাগোবিন্দর বাড়ি দেখা গেল। সেদিনের সেই নিঝুম বাড়িটা আজ উৎসবমুখর। দরজার পাশে চাটাই বিছিয়ে বসে সানাই বাজাচ্ছে সানাইওয়ালা। বাড়ির সামনে বেশ কিছু লোকজন। বাচ্চাদের একটা ঝাঁক ছুটোছুটি করছে। রোমাঞ্চ খেলে গেল কৌশিকের দেহে। আজকেই কি রাধাগোবিন্দর পঁচাশি নম্বর বিয়েটা হচ্ছে!

ঠিক তাই। আর একটু এগোতেই যে মানুষটি দ্রুত পায়ে এগিয়ে এলেন ওর কাছে, তিনি মাধবরঞ্জন, রাধাগোবিন্দর মাঝবয়সী ভাইপো। হাসিমুখে মাধবরঞ্জন বললেন, 'খুব ভাল দিনে এসে পড়েছেন আপনি। আজকেই কাকার পঁচাশি নম্বর বিয়ের বৌভাত।' বলার পরেই বুঝি খটকা লাগল একটু, 'তারিখটা বোধহয় আপনি জানতেন। কাকাবাবু কি নেমন্তন্ন করে চিঠি দিয়েছিলেন আপনাকে?' একটু বিব্রত মুখে জবাব দিল কৌশিক, 'না-না, আমি নেমতন্ন পেয়ে আসিনি। হঠাৎই এসে পড়েছি।'

মাধবরঞ্জন বুঝলেন উৎসাহের বশে বেয়াড়া কথা বলে ফেলেছেন। সুতরাং সেটা সামাল দেওয়ার জন্যে আন্তরিক ভঙ্গিতে বললেন, 'এ বিয়েটা অন্য ধরনের। এখানে নেমন্তন্ন-টেমন্তন্ন বড় কথা নয়। আপনি এসেছেন দেখে কাকাবাবু যে কী খুশি হবেন—আসুন-আসুন ভেতরে আসুন।'

পোশাক-আশাক, চেহারায় এই বিয়েবাড়ির লোকজনের সঙ্গে কৌশিককে মেলানো যায় না একেবারেই। কৌতূহলী হয়ে সবাই ওকে দেখছিল। মাধবরঞ্জন বেশ আপ্যায়নের ভঙ্গিতে ওকে বাড়ির ভেতরে নিয়ে গেলেন। উঠোনে চার সারি পংক্তিভোজন হচ্ছিল। যাঁরা অতিথি-অভ্যাগতদের খাওয়া-দাওয়ার তদারকি করছিলেন তাঁদের মধ্যে রাধাগোবিন্দও ছিলেন। গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবি, পরনে খাটো ধুতি। একাশি বছরের নতুন বর হাঁক পাড়লেন, 'এই এদিকে একবার মুড়িঘন্টটা ঘুরিয়ে দাও তো।'

কৌশিককে দাঁড় করিয়ে রেখে মাধবরঞ্জন দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেলেন কাকার কাছে। পাশে দাঁড়িয়ে কাকার কানে কী যেন বলতেই কাকা চঞ্চল হয়ে এদিকে তাকালেন, তারপর

া্বা লম্বা পা ফেলে কৌশিকের কাছে এসে বিনীতভাবে সামান্য ঝুঁকে পড়ে বললেন, আমার কী কপাল! শুভদিনে আপনার পায়ের ধুলো পড়ল আমার বাড়িতে।'

জবাবে কৌশিক বলল, 'কপাল তো আমার! আপনার বিয়েব দিনে এসে হাজির হতে পারলাম।'

কৌশিকের মনে হয়েছিল, বিয়ের কথায় বুড়ো বর সামান্য একটু লজ্জা পাবে। কিন্তু লজ্জাটজ্জার মধ্যে না গিয়ে রাধাগোবিন্দ বললেন, 'বিয়ে ব্যাপারে দুটি জিনিসেব ওপর আমি নির্ভর করে থাকি। এক—কন্যা সুলক্ষণা কি না। দুই—যোটকবিচার। প্রথম কাজটি করেন আমাদের কুলপুরোহিত। দ্বিতীয় কাজটি কবেন জ্যোতিষী। জন্মরাশিব শুভাশুভ বিচার করেন। তা, জ্যোতিষী বলেছেন—এ একেবারে রাজযোটক। খুব পয়মন্ত মেয়ে। দীর্ঘকাল আপনারা সুখেশান্তিতে ঘরসংসার করবেন।'

দীর্ঘকালীন সুখশান্তির কথা শুনে কৌশিক আড়চোখে একাশি বছরের বরকে একবার দেখে নিল।

একটু দম নিয়ে রাধাগোবিন্দ বললেন, 'জ্যোতিষীর কথা একেবারে অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেছে। নতুন বউ পয়মন্ত না হলে শুভদিনে গরিবের ঘরে আপনার পায়ের ধুলো পড়ত না।' তারপর চাপা গলায় নির্দেশ দিলেন মাধবরঞ্জনকে—'যাও, তুমি তোমার নতুন কাকিমার সঙ্গে এঁর পরিচয় করিয়ে দাও।'

মাধবরঞ্জন বললেন, 'আসুন।'

সামনে নানা বয়েসের মানুষজনের ছোটখাটো একটা ভিড় জমে গিয়েছিল। মাধবরঞ্জনের কথা শুনে ভিড়টা দু-ভাগ হয়ে পথ তৈরি করে দিল। ওই পথে মাধবের পিছু-পিছু কিছুটা হাঁটার পরে নতুন বউয়ের ঘরে পৌঁছে গেল কৌশিক। ঘরে আসবাবপত্র বলতে বেটপ চেহারার একটা নতুন খাট। খাটের একধারে লালচে বেনারসীতে মোড়া একটি কিশোরী। অচেনা এক অতিথিকে দেখার জন্য অল্পবয়সী মেয়েটি অবাক চোখে তাকিয়েছিল। মেয়েটি বেশ রোগা। হাতে ঢলঢল করছে বড় মাপের চুড়ি আর শাঁখা। সিঁথি-কপাল লেপটে আছে সিঁদুরে। মাধবরঞ্জন নতুন বউয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কাকিমা, ইনি খুব মানী মানুষ। কলকাতা থেকে এসেছেন।'

কথাগুলো কানে যাওয়ার পরে নতুন বউয়ের বোধহয় লজ্জা পাওয়ার কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। একহাত ঘোমটা টেনে আরও জড়সড় হয়ে বসল এবার।

দু-চার মুহূর্ত থমকে থাকার পরে কৌশিক পকেট থেকে ওয়ালেট বার করে দুটো একশো টাকার নোট টেনে নিয়ে নতুন বউয়ের সামনে রেখে নমস্কার করল। নতুন বউ পাল্টা নমস্কারের মধ্যে না গিয়ে আরও কিছুটা জড়সড় হল।

ঘর থেকে বেরিয়ে আসার সময় কৌশিক মনে মনে বেশ কিছুটা চটে গিয়েছিল। এইটুকু একটা মেয়ে, বয়স বড়জোব ষোলোসতেরো; তাকে বিয়ে করে বসেছে একটা থুত্থুড়ে বুড়ো। রাগ করে এদেরই বোধহয় ঘাটের মড়া বলা হয়ে থাকে।

তবে আপ্যায়নের বহর এতই বড় ছিল যে, রাগটাকে ও জিইয়ে রাখতে পারল না বেশিক্ষণ। রাগের জায়গায় বিস্ময়বোধ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল এবার। রাধাগোবিন্দ অতিরিক্ত

শ্রদ্ধাভক্তির সঙ্গে ছেলে আর ছেলে-বউয়ের বয়সী নতুন শ্বশুর-শাশুড়ির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন।

আলাপ পরিচয়ের পালাটা ছিল বেশ লম্বা। তার মধ্যে ছিল বড় বউ, মেজ বউ, সেজ বউ। এরা বোধহয় 'পাটরানিদের' দলে পড়ে। প্রায় সার বেঁধে দাঁড় করানো নানা পক্ষের নানা বয়সের ছেলেমেয়ের সঙ্গেও আলাপ করিয়ে দিলেন। বিভিন্ন পক্ষের বেশ কয়েকজন সম্বন্ধীর সঙ্গেও আলাপ করানো হল।

মনে মনে এবার বেশ মজা পেতে শুরু করেছিল কৌশিক। একাশি বছরের বুড়ো, কিন্তু স্মৃতিশক্তি অসম্ভব ভাল। এত বউ, এত ছেলেমেয়ে, এত সম্বন্ধী—কিন্তু টকাটক সবার নাম বলে দিচ্ছে! রাধাগোবিন্দ আর মাধবরঞ্জন খুব আদরযত্ন করে কৌশিককে খাওয়ালেন। একবার কী একটা দরকারে কাকাকে উঠতে হয়েছিল, সেই ফাঁকে ভাইপো বললেন, 'আপনাকে দেখেই কাকাবাবুর সাবিত্রীকাকিমা আর হরির কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। শুভদিন তো, আমাকে ওদের কথা বলতে বলতে গলা ধরে এসেছিল ওঁর। খুব নরম মন তো।'

'ওঁরা কারা?'

আরে আপনি আগের বার যে ছবিটা নিয়ে এসেছিলেন তার মধ্যেই তো ওদের ছবি ছিল। সাবিত্রীকাকিমা, ছেলে হরি—যে হরিকে হাত-পা বলে ডাকত সবাই।'

'ও হ্যাঁ-হ্যাঁ মনে পড়েছে এবার।'

একটা ঢোক গিলে মাধবরঞ্জন গলা নামিয়ে বললেন, 'কাকাবাবুর দয়ার শরীর। সবার জন্যেই ওঁর দয়া। আপনি আমাদের ভাল চান, আপনাকে বলতে বাধা নেই। এই যে আমাদের নতুন কাকিমা—কুলীন ঘরের, কিন্তু অবস্থা ভীষণ পড়ে গিয়েছিল। রোজ দু-বেলা খাওয়া-দাওয়া জুটত না। কাকাবাবুর বেশির ভাগ বিয়ে এইরকম পড়ন্ত ঘরেই। নতুন কাকিমাকে উনি মাথায় করে রাখবেন, তারপর কাকিমার হাত দিয়েই শ্বশুর-শাশুড়ির কাছে চাল, ডাল, টাকাপয়সা পাঠাবেন। ওঁদের রুজিরোজগারের যাহোক-তাহোক একটা ব্যবস্থা করে দেবেন। নতুন কাকিমা যাতে লজ্জাসঙ্কোচ বোধ না করেন তার জন্যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কিছু জমিজমা লিখে দিয়ে বলবেন; তুমি তোমার জমিজমার আয় থেকে কাকে কী দিচ্ছ—তা তো আমার দেখার দরকার নেই। এইরকম দেবতুল্য চরিত্র বলেই এ বাড়ির সাত সতীনের এক রা। সবাই ওঁকে এত মানে।'

রাধাগোবিন্দ কাজ সেরে ফিরে এসে বললেন, 'এ কি হাত গুটিয়ে বসে আছেন কেন?'

জবাবে কৌশিক বলল, 'হাত গোটাব কেন? প্রচুর খেয়েছি। খুব ভাল খেলাম।'

উজ্জ্বল চেহারার বৃদ্ধ মানুষটি বিব্রত হয়ে বললেন, 'ছি-ছি! সামনে বসে থেকে আপনাকে খাওয়াতে পারলাম না! মুড়িঘন্টটা আর একবার ঘোরাই?'

কৌশিকের মুখে এবার রহস্যময় একটা হাসি ফুটে উঠল। 'খেতে পারি, কিন্তু একটা শর্তে।'

'কী শর্ত?'

'দিনসাতেক বাদে নতুন কাকিমাকে সঙ্গে নিয়ে আমার কলকাতার বাড়িতে চলে আসুন। বহু বছর তো কলকাতায় যাননি, তার মানে পাতাল রেলে চড়া হয়নি। আমি আপনাদের

পাতাল রেলে চড়াব। সঙ্গে নিয়ে কলকাতা ঘোরাব। দু চারদিন থেকে আবার ফিরে আসবেন আপনার গাঁয়ে। রাজি ? রাজি হলে মুড়িঘণ্ট খাব।'

'ঠিক আছে, যাব। মরে না গেলে যাব।'

'বেশ তাহলে মুড়িঘণ্ট দিন দু-হাতা।'

খাওয়ার পরে একটা বড় কাগজে পথনির্দেশিকাসমেত নিজের নাম-ঠিকানা লিখে রাধাগোবিন্দের হাতে সেটা ধরিয়ে দিয়ে ফেরার পথ ধরেছিল কৌশিক।

একই পথ। গরুর গাড়ি, ভ্যান-রিক্শা, তারপর বাস। পাক্কা সাড়ে ছ'ঘণ্টার সফর শেষ হওয়ার পরে হাওড়া স্টেশনে এসে ম্যাড্রাস মেলে স্লিপার কোচে উঠে পড়ল গোয়েন্দা।

।। সতেরো ।।

টেলিফোন তুললেন প্রফেসর মৃদুল ভট্টাচার্য।

সঙ্গে সঙ্গে ওপাশ থেকে ভারী গলা ভেসে এল, 'আমি প্রফেসর ভট্টচার্যের সঙ্গে কথা বলতে চাই। উনি কি আছেন ?'

'স্পিকিং।'

'নমস্কার, আমি থানা থেকে ইন্সপেক্টর ঘোষরায় বলছি। আপনি এখন কি খুব ব্যস্ত ?'

এবার একটু বুঝি অপ্রসন্ন শোনাল এদিকের কণ্ঠস্বর। 'হ্যাঁ, অল্পস্বল্প। কেন ?'

'আচ্ছা, আপনার কি কিছু চুরি গেছে।'

'চুরি ! কী চুরির কথা বলছেন ?'

'খুব শৌখিন একটা পেপারকাটার। সিলভারের তৈরি। বাঁটের ওপর সাতটা জুয়েল বসানো।'

এবার চমকে উঠলেন অধ্যাপক। 'দাঁড়ান-দাঁড়ান, এক মিনিট ধরুন। দেখছি।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে দ্রুত পায়ে আলমারির দিকে এগিয়ে গেলেন অধ্যাপক। একটু বাদেই ফিরে এসে উদ্বিগ্ন গলায় বললেন, 'না, নেই তো ! কেস পড়ে আছে, ওটা নেই। আপনি কি পেয়েছেন ?'

'হ্যাঁ।'

'কোত্থেকে ?'

এবার ইন্সপেক্টরের কণ্ঠস্বর আর একটু ভারী হল। 'আপনি এখন যদি একবার থানায় আসতে পারেন, খুব ভাল হয়। একটা আইডেন্টিফিকেশনের ব্যাপার আছে।'

হঠাৎই উত্তেজিত হয়ে উঠলেন অধ্যাপক। 'শুধু পেপারকাটার নয়, আমার আরও কিছু-কিছু দরকারি জিনিসপত্র খোয়া গেছে। সরিয়েছে ওই লোকটাই। আমার স্ত্রী বলছিল

বিশ্বাসী কাজের লোক, কিন্তু আমি বিশ্বাস করিনি। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি। আপনি একটু ভাল করে লোকটার তল্লাশি নিন তো ইন্সপেক্টর, আমি এক্ষুনি আসছি।'

অধ্যাপক বারান্দায় বেরিয়ে হাঁক পেড়ে গাড়ি বার করতে বললেন ড্রাইভারকে। তারপর ফিরে এসে চটপট তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

গাড়ি যখন রাস্তার প্রথম বাঁকটা পার হল তখন হাতঘড়ির দিকে তাকালেন অধ্যাপক। বেলা সাড়ে তিনটে। আকাশ কখন যেন মেঘে ঢেকে গেছ। জোলো হাওয়া ছেড়েছে একটু, বৃষ্টি নামতে পারে যে-কোনও মুহূর্তে। কিন্তু বৃষ্টি নামল না। একই রকমের থমথমে আবহাওয়ায় মিনিট দশেক গাড়ি ছোটার পরে থানা এসে গেল।

ব্যস্তসমস্ত হয়ে ইন্সপেক্টর ঘোষরায়ের ঘরে ঢুকে চারদিকে একবার চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে অধ্যাপক প্রশ্ন করলেন, 'কোথায়? দেবু কোথায়?'

ইন্সপেক্টর একটু অবাক হয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলেন, 'দেবু কে?'

'ওই স্কাউন্ড্রেলটা। আমাদের সো-কল্ড বিশ্বাসী চাকর!'

ইন্সপেক্টর ঘোষরায় একটা সবজান্তার হাসি হেসে সামনের চেয়ারটা অধ্যাপককে দেখিয়ে দিয়ে বললেন, 'আপনি বসুন আগে।'

অধ্যাপক বসার পরে ইন্সপেক্টরের ঠোঁটের হাসিটা কেমন যেন রহস্যময় হয়ে উঠেছিল। উর্দিপরা বিশাল মানুষটি একটু কেটে কেটে বললেন, 'অপরাধের জগৎটা ভারী অদ্ভুত। এখানে যাকে সন্দেহ করা হয়, প্রায়ই দেখা যায় সেই মানুষটি নির্দোষ। ও দিকে আবার যাকে ভালমানুষ ভাবা হয়েছিল, দেখা গেল সে-ই অপরাধী। ওই লোকটিকে চেনেন?' ও দিকের বেঞ্চির দিকে আঙুল তুললেন ইন্সপেক্টর।

বেঞ্চিতে বসে থাকা মানুষটিকে একটু খুঁটিয়ে দেখে নিয়ে ভুরু কোঁচকালেন অধ্যাপক।

ইন্সপেক্টরের ঠোঁটের হাসির রহস্য আর একটু বোধহয় জমাট হল। 'বাঙ্গালোরে আপনার যে শ্যালক থাকেন, এ হল তার বন্ধু প্রসেনজিৎ, প্রসেনজিৎ রায়। সম্ভ্রান্ত, শিক্ষিত, ভাল চাকরি করেন। সমাজে যাঁদের প্রতিষ্ঠিত বলা হয়ে থাকে, ইনি হলেন তাঁদেরই একজন। আপনার হয়তো মনে আছে, বিয়ের রাতে বুলা নামের একটি মেয়ে খুন হয়েছিল—এই মানুষটি সেই বুলার কাকা।'

শেষের কথাটি অধ্যাপকের কানে বোধহয় ঢুকলই না। উনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কিন্তু আপনি আমার পেপারকাটারটা কোত্থেকে উদ্ধার করলেন?'

খুব মজার কথা শুনলে খোলা গলায় যে ভাবে একজন হেসে ওঠে, ইন্সপেক্টরের হাসিটা এবার ঠিক সেইরকমই হয়ে উঠেছিল। শরীর দুলিয়ে একচোট হেসে নেওয়ার পরে বললেন, 'আপনাদের মুশকিল কী জানেন, ছাপার হরফের বাইরের জগৎটার দিকে আপনারা তাকাতেই চান না। আপনার পেপারকাটারটা আমি এই ভদ্দরলোকের কাছ থেকে উদ্ধার করেছি। দাঁড়ান, ওটা আপনাকে একবার দেখিয়ে নিই।'

সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ড্রয়ার খুলে সুদৃশ্য একটা পেপারকাটার বার করে অধ্যাপকের দিকে এগিয়ে দিয়ে ইন্সপেক্টর জিজ্ঞেস করলেন, 'এটা আপনার তো?'

একটু যেন ছেলেমানুষের ভঙ্গিতে ইন্সপেক্টরের হাত থেকে ওটা টেনে নিয়ে অধ্যাপক বললেন, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ আমারই। ব্রাসেলসের একটা সেমিনারে একটা পেপার পড়েছিলাম দু-বছর

আগে, অর্গানাইজারদের তরফ থেকে এটা আমাকে উপহার দেওয়া হয়েছিল। সঙ্গে আরও দু-তিনটি জিনিস ছিল। কিন্তু এটা যে আমারই, আপনি বুঝলেন কী করে?'

আবার সেই সবজান্তার হাসিটা ফুটে উঠেছিল ইন্সপেক্টরের মুখে। 'জিনিসটা আপনি যদি খুব ভাল করে দেখতেন—দেখতে পেতেন পেপারকাটারের ফলার কাছে খুদে-খুদে হরফে প্রফেসর এম ভট্টাচার্য এমবস করা আছে।'

অধ্যাপক একটু লজ্জা পেলেন। 'আসলে ওঁরা আমাকে একটা সাইটেশন দিয়েছিলেন তো, তাই অন্য কোথাও আর নামটাম খুঁজিনি।' কথাটা বলেই বুকপকেটে ওটা ঢোকাতে যাচ্ছিলেন উনি।

অমনি হাঁ-হাঁ করে উঠলেন ইন্সপেক্টর, 'না-না, ওটা এখন আপনি পাবেন না। চোরাই মাল উদ্ধার করেছি আমি। ওটা এখন আমার এগ্‌জিবিট—।'

অধ্যাপক শুকনো মুখে পেপারকাটারটা ফিরিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আর কী-কী পেয়েছেন?'

'কেন, আপনার আর কী-কী খোয়া গেছে? টাকাপয়সা?'

'গেলেও বড় অ্যামাউন্ট নয়। কিন্তু কিছু ইম্পর্টান্ট ডকুমেন্ট আমি খুঁজে পাচ্ছি না।'

এবার হিংস্র একটা হাসি ফুটে উঠল বিশাল চেহারা ইন্সপেক্টরের চোখেমুখে। 'শুধু আপনার নয়, আরও অনেকের অনেককিছু খোয়া গেছে। সব টেনেহিঁচড়ে বার করব এবার। শুধু মালপত্তর নয়, র‍্যাকেটের সব খবরাখবর। আমি জিজ্ঞাসাবাদ এখনও তেমনভাবে শুরু করিনি। ঠিক আছে, আপনার আর সময় নষ্ট করব না। আপনি এখন কলকাতায় আছেন তো?'

'না, কয়েক দিন থাকছি না। একটা কনফারেন্সে যেতে হবে।'

'ঠিক আছে ঘুরে আসুন। কয়েক দিন পরেই আপনার দরকার পড়বে। নমস্কার।'

ঘর থেকে বেরোবার আগে তীব্র বিতৃষ্ণার চোখে প্রসেনজিৎকে একবার দেখে নিয়েছিলেন অধ্যাপক।

অধ্যাপকের চলে-যাওয়াটা বেশ মনোযোগের সঙ্গে দেখলেন ইন্সপেক্টর, কিংবা ওটা ঠিক দেখা নয়; ওদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে উনি পরবর্তী লাইন অব অ্যাকশন ঠিক করে নিচ্ছিলেন।

একটু বাদে খুকখুক করে কেশে গলা পরিষ্কার করে প্রসেনজিতের দিকে তাকিয়ে গমগমে গলায় ইন্সপেক্টর বললেন, 'এবার আপনি ওখান থেকে উঠে এসে সামনের চেয়ারটায় বসুন। হ্যাঁ, উপস্থিত চেয়ারেই বসুন।'

প্রসেনজিতের চোখমুখ বেশ থমথমে দেখাচ্ছিল। সামনের চেয়ারে এসে বসতেই ইন্সপেক্টর বললেন, 'পেপারকাটারটা দেখেই হাতানো মাল বলে সন্দেহ হয়েছিল আমার। অথচ আপনি বলেছিলেন—আপনার। চট করে প্রমাণ করে দিলাম তো ওটা কার। এবার আমার প্রমাণ দাখিল করে যাওয়ার পালা। একটার পর একটা। ব্যাঙ্গালোর যাচ্ছিলেন কেন?'

'ট্রেন থেকে নামিয়ে এনে এখন জিজ্ঞেস করছেন, কেন যাচ্ছিলাম? জানেন, আমি আপনার নামে ড্যামেজ স্যুট আনতে পারি!'

'বাহ্! আপনি দেখছি এখনও ফোঁস করছেন! ভাল খেলোয়াড় বলতে হবে।'

'কী বলতে চাইছেন আপনি?'

'ইঁদুর ধরার পরে সেটাকে কিছুটা ঘায়েল করে বেড়ালের মাঝেমধ্যে একটু খেলা করার

শখ হয়। ইন্সপেক্টরের ঠোঁটের ফাঁকের হাসি দেখলে যে-কারও মনে হবে, উনি এখন সেই ধরনের একটা খেলায় মেতেছেন। ভারী-ভারী আঙুল টেবিলে ঠুকে দু'-চারটে তালকাটা বোল্ তুলে ইন্সপেক্টর জিজ্ঞেস করলেন, 'সন্ধ্যা নামের মেয়েছেলেটা কোথায়?'

অবাক হয়ে প্রসেনজিৎ পালটা প্রশ্ন করলেন, 'সন্ধ্যা কে?'

'সন্ধ্যা নিশ্চয়ই ওর নাম নয়। মিথ্যে নাম বলেছিল আমাদের কাছে। ওই যে ব্লু ফিল্মের নায়িকা। গল্ফ গ্রিনের ফাঁকা ফ্ল্যাটে শুটিং করার সময় যেটাকে তুলে আনা হয়েছিল। কোর্টে প্রোডিউস করার পরে হোমে পাঠানো হয়। তারপর ওখান থেকে পালায়। মেয়েছেলেটার ঠিকানা বলুন।'

'কী যা-তা বলছেন! ওই ধরনের কোনও মেয়েকে আমি চিনি না।'

টেবিলে আর একবার তবলা বাজালেন ইন্সপেক্টর। তারপর আবার মুখ খুললেন। 'একটা সময় আপনি অভিনয়-টভিনয় করতেন। তা, অভিনয়টা দেখছি আপনার ভালই আসে। বছর-দুয়েক আগে আপনি একটা শর্ট ফিল্ম বানিয়েছিলেন। ফিল্মেব নামটা হল গিয়ে দাঁড়ান বলছি—হ্যাঁ, ফলেন ওম্যান। ছবির বিষয় হল—ভদ্র পরিবারের মেয়েরা কী ভাবে দালাল-গুণ্ডার খপ্পরে পড়ে নষ্ট হয়ে যায়। সামাজিক সমস্যা নিয়ে তৈরি ছবি। কুড়ি মিনিটের ছবি। কিন্তু ছবিটা কোথাও আপনি বেচতে পারেননি।'

আর একবার অবাক হলেন প্রসেনজিৎ। 'আরে! এ খবর আপনি কোত্থেকে পেলেন?'

ইন্সপেক্টরের গোঁফের ফাঁকে রহস্যময় হাসিটা খেলে গেল আবার। 'শুধু এই খবরটাই নয়, আপনার সম্পর্কে আরও অনেক খবর জোগাড় করেছি আমি। আমার লোক বেশ কিছুদিন ধরেই আপনার পেছনে ঘুরছে। অতীতে কী-কী করছেন, এখনই বা কী করছেন—তার অনেক কিছুই আমার জানা। আপনার নামে যে সিক্রেট ফাইলটা খোলা হয়েছে এখানে—সেটা এর মধ্যেই বেশ মোটা হয়ে গিয়েছে। ছবির পেছনে বিস্তর খরচা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ছবি বেচতে পারেননি বলে পুরো টাকাটাই আটকে গেছে আপনার। কী, তাই তো?'

বিরক্ত হয়ে এবার একটু কাঁধ ঝাঁকালেন প্রসেনজিৎ। 'হ্যাঁ, শখ-সাধ মেটাতে গিয়ে অনেকেই অনেক কিছু করে থাকে। ওটা আমার একেবারেই ব্যক্তিগত ব্যাপার। ও প্রসঙ্গ এখানে টেনে আনছেন কেন?'

'কারণ আছে বলেই টানছি। অনেকগুলো টাকার ব্যাপার। কিছু টাকা তো আপনাকে শোধ দিতে হবে। এই যেমন ব্যাঙ্কলোন—।'

'ওহ্! ব্যাঙ্কলোনের কথাটাও জেনেছেন!'

'বললাম না, অনেক কিছুই জেনেছি।'

'ব্যাঙ্ক থেকে ধার নেওয়াটা কি অপরাধ?'

'না, নিশ্চয়ই নয়। তবে জলে-যাওয়া টাকার কিছুটা কিংবা বেশির ভাগটা তুলে আনার জন্যে কেউ-কেউ তো অপরাধের পথ ধরে।'

'কী বলতে চাইছেন আপনি!' প্রসেনজিতের চোখমুখ এবার বেশ লালচে হয়ে উঠেছিল।

জবাবে মুচকি হেসে টেবিলে আর একবার তবলা বাজালেন ইন্সপেক্টর। এবার ওই বাজনার মধ্যে ছোট্ট একটা গত্ ছিল, তাল কাটেনি একবারও। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে ইন্সপেক্টর বললেন, 'ছবি বানাবার কায়দাকানুন আপনার মোটামুটি জানা আছে। সুতরাং আপনি এবার একটা শিওর শটের দিকে গিয়েছিলেন। চোট-খাওয়া টাকাটা যাতে

হাতে-হাতে উঠে আসে। আমি যদি বলি, গল্‌ফ গ্রিনের ফাঁকা ফ্ল্যাটে সেদিন রাত্তিরবেলায় যে নীল ছবিটা তৈরি হচ্ছিল, যার পরিচালক ধরা যায়নি—সেই মানুষটি আপনি।'

'আমি! ব্লু ফিল্মের পরিচালক! কী, কী বলছেন আপনি!'

মস্ত থাবার মতো হাতদুটো তুলে প্রসেনজিৎকে শান্ত হওয়ার ইঙ্গিত করলেন ইন্সপেক্টর। ওঁর চোখমুখ দেখে মনে হচ্ছিল জখম-হওয়া ইঁদুরের সঙ্গে বেড়ালের খেলাটা বেশ জমে উঠেছে। এবার শুধু চোখ দিয়ে হেসে বললেন, 'ক্যামেরাম্যান এ লাইনে নতুন। আপনাকে সঠিক নামে চেনে না, পরিচয় তো নয়ই। ওর কাছ থেকে আপনার চেহারার ডেসক্রিপশনটা টোকা ছিল। তখন পরিস্থিতি অন্যরকম ছিল, আপনাকে সন্দেহ করার চিন্তা তাই মাথায় আসেনি। তারপর একটু-একটু করে আপনার গুণের পরিচয় পাওয়ার পরে অঙ্ক মিলিয়ে নিয়েছি। সন্ধ্যা নামের ওই খানকিটার ঠিকানাটা দিন এবার।'

লালচে মুখের প্রসেনজিৎ কী যেন বলতে গিয়ে কিছুই বলতে পারলেন না প্রথমে। শেষে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বললেন, 'আমার ওই শর্ট ফিল্মে যারা অভিনয় করেছে তারা সবাই ভদ্র পরিবারের মেয়ে।'

'এটা আপনি ঠিক বলছেন। আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি। সন্ধ্যার ঠিকানাটা দরকার। এইসব মেয়েছেলে ধরা পড়ে গেছে জানতে পারলে হুড়হুড় করে সব বলে দেয়। বলে দিলে এই কেসটা গুটিয়ে ফেলার কাজটা আমার সহজ হবে। ঠিকানাটা কী সন্ধ্যার?'

নতুন করে আর একবার উত্তেজিত হলেন প্রসেনজিৎ। 'আপনি খুব একটা বাজে ব্যাপারের সঙ্গে জড়াতে চাইছেন আমাকে। এটা কিন্তু ঠিক হচ্ছে না।'

সেই হিংস্র ভাবটা আবার ফিরে এসেছিল ইন্সপেক্টরের চোখেমুখে। কিন্তু মুহূর্তের জন্যে। ইঁদুর-বেড়ালের খেলাটা আর এক দফা উপভোগ করার জন্যেই উনি বোধহয় ভোল পালটে অস্বাভাবিক শান্ত গলায় বললেন, 'প্রফেসর ভট্‌চাজের শালা অপূর্ব এক সময় আপনার খুব বন্ধু ছিল। ওর কাছ থেকে মোটা অঙ্কের একটা টাকা ধার নেওয়ার পরে ওই বন্ধুটি শত্রু হয়ে গেছে আপনার। এটা ঠিক বললাম কি?'

প্রসেনজিৎ এবার একটু থতমত খেয়ে গিয়েছিল। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে বলল, 'হ্যাঁ, টাকা ধার নিয়েছি। কিন্তু অপূর্ব আমার শত্রু হয়ে যায়নি। টাকাটা জোগাড় করতে পারলেই শোধ দিয়ে দেব।'

বাঁকা একটা হাসি ফুটে উঠেছিল ইন্সপেক্টরের ঠোঁটে। 'আবগারিতে কাজ করেন। মোটা টাকা ঘুষ খান। ঘুষের টাকা থেকে টাকাটা তো শোধ করে দিতে পারতেন।'

'মানে?'

'মানে তো আপনার অফিসের রেকর্ডে আছে।'

এবার একটু কেঁপে উঠলেন প্রসেনজিৎ। 'আমি, আমি একটা চক্রান্তের শিকার হয়েছিলাম।'

ইন্সপেক্টর গোঁফে তা দেওয়ার ভঙ্গি করলেন। 'ঘোড়া থেকে সাট্টা—সব নেশাই তো আছে আপনার। ওখানে যখন-তখন প্রচুর টাকার দরকার হয় বলেই কি শিকার হতে হয়েছিল?'

কথাটা শুনে সারা শরীরে আর একবার কাঁপুনি খেলে গিয়েছিল প্রসেনজিতের। হঠাৎই যেন ওর মুখ ঝুলে পড়ল নীচের দিকে।

জখম ইঁদুর আর ছোটাছুটি করতে পারছে না। শিকারি বেড়াল থাবা গেড়ে বসে আছে সামনে।

ইন্সপেক্টরের চোয়াল কঠিন হয়ে উঠেছিল। আচমকা কঠিন কর্কশ স্বর বেরিয়ে এল ওঁর মুখ থেকে। 'আপনার দাদা সদাশিব প্রকৃতির। ওই দাদার এই ভাই ভাবা যায় না। আপনাকে তো ওঁর ব্যবসার একটা অংশ দিতে চেয়েছিলেন। ভালমানুষি দেখিয়ে সেটা নেননি কেন?'

শরীরের প্রায় সব রক্তই যেন ফর্সা প্রসেনজিতের মুখের চামড়ার নীচে জমা হয়েছিল। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে বললেন, 'আপনাকে বলেছি বোধহয় আমার দাদা সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় এত বড় ব্যবসাটা দাঁড় করিয়েছেন। অথচ আমাদের প্রতি কখনও কোনও কর্তব্যে অবহেলা করেননি। যখন যা দরকার তা পেয়েছি। না চাইতেই পেয়েছি। অল্প বয়সে বাবা মারা গেছেন আমাদের, কিন্তু বাবার অভাব দাদা কখনও বুঝতে দেননি। লেখাপড়া শিখিয়েছেন। এমনকী এই চাকরিটা জুটিয়ে দেওয়ার ব্যাপারেও দাদা কিছুটা সাহায্য করেছেন। যা মাইনেপত্তর পাই তাতে আমার দিব্যি চলে যায়। বিয়েটিয়ে করিনি এখনও। হ্যাঁ, কুসঙ্গে পড়ে আমার কিছু বদভ্যাস তৈরি হয়েছিল, কিন্তু সেগুলো আমি কাটিয়ে ফেলেছি প্রায়।'

ইন্সপেক্টরের চোখেমুখে ঘোরতর অবিশ্বাসের ছাপ। 'কিন্তু আপনার সম্পর্কে পাওয়া খবরগুলো তো সে-কথা বলছে না।'

'যদি না বলে সে দোষ কি আমার? আপনার ইনফর্মার কয়েকটা বাসি খবরে লতাপাতা জুড়ে সামান্য ব্যাপারকে বড় করে তুলে আপনাকে জানিয়েছে।'

'আমার ইনফর্মার পাকা লোক। তার খবর ভুল হয়নি কখনও।'

'আগে ভুল কি ঠিক হয়েছে আপনিই ভাল জানেন। তবে এবার ভুল হয়েচে। আমি বলছি ভুল হয়েছে।'

ইন্সপেক্টর ভারী আঙুলগুলো দিয়ে আর একবার তবলা বাজালেন টেবিলে। এবারের বোলগুলো তালকাটা। বাহবা দেওয়াল গলায় ইন্সপেক্টর বললেন, 'বাহ্। আপনি দেখছি খুব ঠাণ্ডা মাথার লোক। এখনও তক্কো চালিয়ে যাচ্ছেন সমানে। ঠিক আছে, আমিও ঠাণ্ডা মাথায় আর দু-চারটে প্রশ্ন কবি আপনাকে। স্পষ্ট ভাষায় উত্তর দেবেন। দাদার ব্যবসা বড় ব্যবসা, উনি তার একটা অংশ আপনাকে দিতে চাইছিলেন, আপনি নেননি কেন?'

'কেন নিতে চাইনি বললাম তো আপনাকে।'

'আপনার আপন দাদা। ওঁর ব্যবসার একটা অংশ পাওয়ার আইনগত অধিকারও তো আপনার আছে।'

'না নেই। দাদা যদি পৈতৃক টাকায় ব্যবসা করতেন, তা হলে থাকত। দাদা সেটা করেননি। কারণ আমার বাবা কোনও টাকাপয়সা রেখে যাননি। দাদা চাকরি করে টাকা জমিয়েছেন। তারপর সেই টাকায় ব্যবসা করেছেন। এই যে বাড়ি-গাড়ি— সে সবই দাদার নিজের টাকায়। ব্যবসার প্রতিটি পাইপয়সা দাদার নিজের রোজগারের। ওর টাকা বা সম্পত্তির ওপর আমার কোনও আইনগত অধিকার নেই। সুতরাং ওটা আমি দাবি করতে পারি না।'

'বাহ্। চমৎকার আর্গুমেন্ট। বেশ কনভিন্‌সিং। এবার বলুন আপনার দাদার সম্পত্তির ডিডে ওই সব কথা লেখা হয়েছিল কেন?'

'কোন্ সব কথা?'

'বিয়ের আগে আপনার ভাইঝি বুলার মৃত্যু হলে ধর্মতলার দোকানটার মালিকানা আপনি পাবেন।'

রীতিমত উত্তেজিত হয়ে উঠলেন প্রসেনজিৎ। 'ওটা আমার কাছে একটা অ্যাবসার্ড ক্লজ বলে মনে হয়েছিল। আমি সে-কথা দাদাকে একবার নয়, বেশ কয়েকবার বলেছিলাম। বলেছিলাম কি না আপনি আমার দাদাকে এক্ষুনি ফোন করে জেনে নিন।'

খুব সুন্দরভাবে হেসে উঠে ইন্সপেক্টর বললেন, 'ফোন করার দরকার নেই। আপনার কথা ঠিক আমি আপনার দাদার কাছ থেকে সেটা জেনে নিয়েছি।'

'তবে?'

'ওই সব কথা বলে দাদার কাছে নির্লোভ ও ভালমানুষ থেকে গেছেন।'

প্রসেনজিতের মুখের চামড়া ফেটে রক্ত বেরুবার উপক্রম হল। 'কী বলতে চাইছেন আপনি?'

'বলছি। দাদার কাছে ভালমানুষ থেকে গেছেন। কিন্তু এমন যদি হয়, ডিড বানাবার সময় আপনি আপনাদের উকিলকে টাকা খাইয়ে ওই কথাটি লিখিয়ে নিয়েছেন। তারপর আচমকা সেই ঘটনাই ঘটে গেল। বুলার ওই বিয়েটাকে তো আর বিয়ে বলা যায় না। সাদা কথা হল, বুলার হঠাৎ মৃত্যু হওয়ার ফলে বুলার ধর্মতলার বড়সড় ওই দোকানটার মালিকানা এখন আপনি পেয়ে গেলেন।'

উত্তরে কিছু বলতে না পেরে কাঁপতে কাঁপতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন প্রসেনজিৎ।

শান্ত ভঙ্গিতে ওকে বসার ইঙ্গিত করে ইন্সপেক্টর বললেন, 'আমার খবর আছে ফিনান্সিয়াল ইররেগুলারিটিজ ধরা পড়ার পরে আপনার বিরুদ্ধে আপনার অফিস থেকে সেকেন্ড চার্জশিট তৈরি করা হচ্ছে। আপনাকে ওটা সার্ভ করার আগেই আপনি চাকরি ছেড়ে দেবেন বলে ঠিক করেছেন। কারণ বুলার ধর্মতলার ওই দোকানটার মালিকানা পাওয়ার সুবাদে আপনি এখন বেশ বড়লোক। আমি কি ভুল বললাম?'

'আপনি কী ইঙ্গিত করছেন?' চেরা গলায় প্রায় চিৎকার করে উঠলেন প্রসেনজিৎ।

ইন্সপেক্টর ঘোষরায়ের গলায় এবার বাজ ডাকল। 'ইঙ্গিত-কিঙ্গিত আবার কী? মেরে হাড় গুঁড়ো করে দিলে বুলার খুনের ব্যাপারে তোর চক্রান্তের সব কথা তুই বাপ-বাপ বলে স্বীকার করবি।'

ইন্সপেক্টরের হাতের ভারী থাবাটা টেবিলের ওপর পড়ে-থাকা কলিংবেলের ওপর আছড়ে পড়তেই একজন কনস্টেবল ছুটে এল। ওর দিকে তাকিয়ে হুঙ্কার ছেড়ে ইন্সপেক্টর বললেন, 'ব্যাটাকে লক-আপে ঢোকা। আমাকে এক্ষুনি একবার লালবাজারে যেতে হবে। ফিরে এসে তিন মিনিটের মধ্যে ওর পেটের সব কথা আমি টেনে বার করব।'

।। আঠারো ।।

একটা গোমড়া আর থমথমে গোছের বাড়ি হঠাৎই কেমন যেন উৎসবমুখর হয়ে উঠেছিল। স্টিরিও থেকে একটু চড়া সুরে গান বাজছে। কখনও বিলিতি পপ্ মিউজিক। মাঝে মাঝে

গান ছাপিয়ে ঝোড়ো হাসি উঠছিল। এ-বাড়ির যে-ঘরে অদৃশ্য হরফে 'সাইলেন্স' ঝোলানো থাকে, কাজের লোকরা যে দরজার সামনে দিয়ে বেড়ালের মতো নিঃশব্দে হাঁটে; সেই জায়গাগুলোও আজকের হট্টগোলের আওতায় এসে গেছে। অধ্যাপক ভট্টাচার্য এখন পণ্ডিচেরির কনফারেন্সে। রান্নাঘর থেকে তরিবত করে রান্না-করা সুখাদ্যের ঘ্রাণ ভাসছিল বাতাসে।

সুনেত্রা হঠাৎ ঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বলল, 'সাড়ে-নটা বাজে, খাবার দিতে বলি এবার?'

সঙ্গে সঙ্গে নকল একটা মুখ-ঝামটা ভেসে এল প্রাণের বন্ধু রিমির কাছ থেকে। 'সে কী রে, এত তাড়াতাড়ি খাওয়াতে চাইছিস কেন? তুই কি খাইয়ে-দাইয়ে এখন তাড়িয়ে দিবি নাকি আমাদের?'

জিভ কেটে সুনেত্রা বলল, 'আস্তে আস্তে, সৌমিত্র শুনতে পাবে।'

একটু দূরে সোফায় বসে পা দোলাতে দোলাতে সিগারেট টানছিল রিমির ডাক্তার বর সৌমিত্র। ও গলা তুলে বলল, 'না, আমি শুনতে পাইনি। তবে আজ রাতে আর এ-বাড়ি থেকে আমরা কেউ নড়ছি না। মালাইকারির চিংড়ির যে সাইজ দেখেছি, আজ রাত্তিরে দুবার খাব।'

ওর কথায় হেসে উঠল সবাই। সুনেত্রা বলল, 'নিন্দে করার অভ্যেসটা দেখছি তোমার আগের মতোই রয়ে গেছে। আমি জব্বলপুরে চিঠি দিয়ে অনেক আগে থেকেই নেমন্তন্ন করে রেখেছি— তিনটে রাতের মধ্যে একটা রাত আমাদের বাড়িতে থাকতে হবে; আর এখন বদনাম দেওয়া হচ্ছে।'

গলার স্বর আর একটু উঁচুতে তুলে সৌমিত্র বলল, 'কোথায় চিঠি দিয়েছ। আমি কোনও চিঠি পাইনি।'

'তুমি পাওনি, কিন্তু তোমার বউ পেয়েছে। পেয়েছে কি না জিজ্ঞেস করে দেখ।'

'ওর কথা এখন ধরা হবে না। ও এ-বাড়িতে পা দেওয়ার পর থেকে তোমার ছায়া হয়ে গেছে আবার।'

'বেশ, বউয়ের কথা ধরতে হবে না। সাক্ষী আছে আমার হাতের কাছেই। প্রমিতা ওই চিঠিটা দেখেছে। কী রে প্রমিতা বল।'

'ওর কথা ধরা হবে না, ও তোমার দলের লোক।'

'বেশ ধরার দরকার নেই। আজ রাত্তিরে তোমাকে দু বারের জায়গায় তিনবার মালাইকারি খাইয়ে দেব। তিন নম্বর খাওয়াটা হবে ভোররাত্তিরে।'

'পাগল। তা হলে কাল আর আমাকে ট্রেন ধরতে হবে না।'

'ট্রেন ধরার জন্যে কে তোমাকে মাথার দিব্যি দিয়েছে। থেকে যাও আর কয়েকটা দিন।'

ফোঁস করে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সৌমিত্র বলল, 'থাকতে পারলে আমার মতো খুশি আর কে হত! ছোটলোকের চাকরি করি। যেতেই হবে। তবে তোমার কোনও অসুবিধে হবে না। তোমার দু-নম্বর ছায়া তো তোমার সঙ্গেই রয়ে যাচ্ছে।'

সুনেত্রা এবার সৌমিত্রর সুরে সুর মেলাল। 'সত্যি, তিনটে দিন দেখতে দেখতে কেটে গেল। এ ভাবে আসার কোনও মানে হয় না।'

মাসদুয়েকের মধ্যেই লম্বা ছুটি নিয়ে আসছি। তখন কিন্তু আবার তাড়াবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠো না।

ঠোঁট ওলটাবার হালকা একটা ভঙ্গি করে রিমি বলল, 'এ লোকটার খালি ঠেস দিয়ে কথা বলা। তুমি কিন্তু একবারের জন্যেও ওদের জব্বলপুরে যাওয়ার নেমন্তন্ন করোনি।'

'এর আবার বলাবলির কী আছে। তুমি ওর মত করাও। বাস, সঙ্গে সঙ্গে আমি ওকে মাথায় করে নিয়ে যাব। এই, আর একবার পনির পকৌড়াটা নিয়ে এসো তো।'

এবার রীতিমত ধমকে উঠল রিমি। 'না, দিবি না তো। তখন থেকে এটা-সেটা চেখে চেখেই পেট ভরিয়ে ফেলছে। খাবার-টেবিলে দেখবি কিচ্ছু খেতে পারবে না।'

বন্ধুকে উলটো ধমক মারল সুনেত্রা। 'খুব পারবে। এই—।'

হাত দিয়ে সুনেত্রার মুখ চেপে ধরে রিমি। 'থাক, তোকে আর অর্ডার দিতে হবে না, টেবিলে খাবার লাগাতে বল।'

খাবার ঘরটা দেখার মতো। মস্ত ঘরে মস্ত টেবিল। চারপাশে মেহগনি কাঠের নকশাতোলা চেয়ার। দেয়ালে নরম রঙের অয়েলপেন্টিং। একটা মাঝারি মাপের ঝাড়লণ্ঠন নেমে এসেছে সিলিং থেকে। লণ্ঠনের লুকনো জায়গায় বিদ্যুতের আলো। পাখার হাওয়ায় বোধহয় অল্পবল্প দুলছে ঝাড়লণ্ঠন। সেই সঙ্গে দেয়ালে দুলছে ছায়ার নক্‌শা।

দুজন কাজের লোক রুপোর বাটিভর্তি একের পর এক খাবার এনে টেবিল ভরিয়ে ফেলছিল। ছ'টা চেয়ার, চারটের সামনে বাহারি ম্যাট।

একটু বাদেই খাবারঘরে ডাক পড়ল অতিথিদের, আর ঘরে ঢুকেই চোখ কপালে তুলে সৌমিত্র বলল, 'করেছ কী! এ তো দেখছি একেবারে রাজবাড়ির খাওয়া!'

'এটা তো রাজবাড়িই।' হাসতে হাসতে উত্তর দিল রিমি।

কর্তাগিন্নির পেছনে একটু জড়সড় ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েছিল প্রমিতা। সুনেত্রা এগিয়ে গিয়ে ওকে কাছে টেনে এনে বলল, 'এই মেয়েটা এখন আমার ফ্রেন্ড, ফিলোজফার অ্যান্ড গাইড। ওর মাকে ফোন করে এখানে ওর রাত্তিরে থাকার পারমিশন আদায় করে নিয়েছি। নে, তুই বোস।'

ওদিকে বসল সৌমিত্র আর রিমি, এদিকে সুনেত্রা আর প্রমিতা। রান্নাঘরের লোক দুজন অনেক পুরনো, তার ফলে ওরা ঠিক বাড়ির লোকের মতোই হয়ে গেছে। নিছক পরিবেশন নয়, অতিথিদের একটু জোরাজুরি করেও খাওয়াতে ভালবাসে।

সৌমিত্র যেটা মুখে তুলছে সেটা নিয়েই প্রশংসা করছে উচ্ছ্বসিত ভঙ্গিতে। অতিথি এত প্রশংসা করলে গৃহকর্ত্রীর ভাল লাগবেই। ঝলমলে মুখে সৌমিত্রর দিকে তাকিয়ে সুনেত্রা বলল, 'খাবার খুব ভাল লাগলে কেউ খেতে খেতে এত কথা বলতে পারে না।'

মুখে নকল একটা দুঃখের ভাব ফুটিয়ে জবাব দিল সৌমিত্র, 'এমনি এমনি বলছি না, মনের দুঃখে বলছি। জব্বলপুরের বাড়িতে যে কুক রান্না করে সে জাতে বিহারি, তার রান্না মুখে তোলা যায় না। ওই বাড়িতে একজন বাঙালি মহিলা থাকেন, দেখতে মোটামুটি সুন্দরীই ; কিন্তু ওঁর রান্নার হালও একই রকম।'

'ওই শুরু হল আবার বাঁকা-বাঁকা কথা।' রিমির মন্তব্যে হেসে উঠল সবাই।

সুখাদ্যের টেবিলে আড্ডা জমে উঠেছিল দারুণ। হঠাৎ সুনেত্রার দিকে তাকিয়ে রিমি বলে উঠল, 'এই রে! তোর সঙ্গে ঝগড়া করার কথা ভুলে গিয়েছি একদম!'

'মনে পড়েছে যখন, এখন কর।'

'দূর, এত খেয়েদেয়ে ঝগড়া করা যায় না।'

'ঠিক আছে, এখন ঝগড়া করতে হবে না। ঝগড়ার বিষয়টা শুধু বলে দে।'

মুর্গির একটা ঠ্যাং হাতে তুলে নিয়ে সৌমিত্র বলল, 'বিষয়টা আমি জানি। তুমি নাকি রিমির সাত-আটটা চিঠির জবাব দাওনি?'

'বাজে কথা। আমি চিঠি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি চিঠির উত্তর দিয়েছি। না পেলে ডাকবিভাগের দোষ।'

'চিঠি না লিখলে সবাই ডাকের দোষ দেয়।'

মুর্গির পা থেকে একটুকরো মাংস ছিঁড়ে নিয়ে সৌমিত্র বলল, 'সুনেত্রা, আমি তোমাকে তিনটে চিঠি দিয়েছি।'

'তিনটে চিঠিরই উত্তর দিয়েছি। পাওনি?'

'পাইনি মানে—অবশ্যই পেয়েছি। এখনও চিঠিগুলো লুকিয়ে লুকিয়ে পড়ে থাকি।'

সুনেত্রা মুচকি হেসে বলল, 'লুকিয়ে পড়ার মতো চিঠি দিইনি তোমাকে।'

মজার গলায় কথা গোপন করার ভঙ্গিতে বলে উঠল সৌমিত্র, 'ঠিক আছে, ও কথা এখন থাক—।'

ওর কথা বলার ধরনে হেসে উঠেছিল সবাই।

এক-একটা আড্ডায় সবাই খুব মন খুলে হাসতে চায়, কথাটা সে যেমনই হোক না কেন। এই আড্ডাটা ঠিক সেইরকম। আড্ডা একসময় খাবার ঘর থেকে উঠে এল বসার ঘরে। বসার ঘরে রাত বাড়ছিল তরতর করে।

কিন্তু পৃথিবীটা ভারী অদ্ভুত জায়গা। এখানে একই সময় নানা জায়গায় নানান ধরনের ঘটনা ঘটে থাকে। তবে এই মুহূর্তে গোটা পৃথিবীর দিকে তাকাবার দরকার নেই। বাঙ্গালোরের একটা নিরিবিলি এলাকায় সাজানো-গোছানো একটা গেস্টহাউসের দোতলার পুবমুখো ঘরটার দিকে তাকানো যেতে পারে।

পুবদিকের উঁচু পাঁচিলঘেরা মস্ত বাড়িটা সুনেত্রার দাদা অপূর্বর।

ওই বাড়ির ওপর কিছুদিন আগে দোতলার এই ঘর থেকে নজরদারি করে গেছেন মুখার্জিবাবু। সেই ঘরে এখন একগাল চাপদাড়ি মাথায় টুপি একটা লোক টেবিলল্যাম্পের আলোয় ছোট একটা নোটবই উলটে যাচ্ছিল। পাশে লাল রংয়ের টেলিফোন।

একটু বাদে প্রয়োজনীয় নাম্বারটা পাওয়ার পরে টেলিফোন কাছে টেনে নিয়ে ডায়াল করল চাপদাড়ি। ওপাশ থেকে 'হ্যালো' ভেসে আসতেই চাপদাড়ি চাপা গলায় বলল, 'কে? গাঙ্গুলি নাকি?' এ গলার স্বর যারা চেনে তারাই বুঝতে পাববে দাড়ি আর টুপিতে সম্পূর্ণ অচেনা হয়ে ওঠা মানুষটি হল বিখ্যাত প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর কৌশিক মিত্র।

গলার স্বর চিনতে পেরে টেলিফোনের ও দিকের গাঙ্গুলি নিচু সুরে কী সব যেন বলে গেল বেশ কিছুক্ষণ ধরে।

শুনতে শুনতে হাসি ফুটে উঠেছিল চাপদাড়ির মুখে। একটু বাদে কৌশিক বলল, 'বাহ্! তুমি দেখছি সব খবরাখবরই জোগাড় করে ফেলেছ এর মধ্যে। হ্যাঁ-হ্যাঁ, এইগুলোই জানতে চেয়েছিলাম আমি। বাঙ্গালোরে আমার কাউন্টারপার্ট দেখছি দারুণ কাজের। মুখার্জিবাবুর

কাছ থেকে পাওয়া যে তিনটে গাড়ির নম্বর দিয়েছিলাম তোমাকে—সেগুলোর মালিকের হদিস পেলে? কী বললে? লোক লাগিয়েছ, সকালের মধ্যে পাওয়া যাবে। বাহ্! ফাইন। শোনো, বাঙ্গালোর পুলিশের সঙ্গে আমার কথাবার্তা হয়ে গিয়েছে। ওঁরা বলেছেন, আমাদের সব রকম সাহায্য দেবেন। এখন দেখা যাক, কদ্দুর কী করতে পারি! তুমি কাল সকাল আটটা পর্যন্ত বাড়িতে আছ তো—আমি তার মধ্যেই তোমাকে ফোন করব আবার। দরকাব পড়লে আজ রাতেই—। আর যদি কোনও কারণে আটকে যাই— পরে সেলফোনে ধরে নেব তোমাকে। ঠিক আছে তা হলে, গুডনাইট।' টেলিফোন ছেড়েই টেবিল-ল্যাম্পটা নিবিয়ে দিয়েছিল কৌশিক। তারপর চুপ করে কয়েক মুহূর্ত চেয়ারে বসে থাকার পরে লঘু পায়ে এগিয়ে গিয়েছিল জানলার দিকে।

জানালা ভারী পর্দা টাঙানো ছিল। আস্তে আস্তে পর্দা সামান্য ফাঁক করে বাইরের দিকে তাকাল গোয়েন্দা। একটু আগেই ঘড়ি দেখেছে ও। এখন রাত প্রায় দেড়টা। এলাকাটা শহরের এক প্রান্তে। দিনের বেলাতেই এখানে কম লোক চলাচল করে। সন্ধে সাতটা-সাড়ে সাতটার পরে ঝুপ করে রাত নেমে আসে। রাত ন'টা সাড়ে ন'টা নাগাদ সে রাত বেশ গভীর হয়ে ওঠে। রাত দেড়টায় সেই রাত অসম্ভব জমাট হয়ে যায়।

দুরে একটা টিমটিমে রাস্তার আলো। রাতের নিজস্ব আলোও বিশেষ নেই। বোধহয় মেঘ জমেছে আকাশে। কোমরে গোঁজা পিস্তলটা একবার ছুঁয়ে নিয়ে নিঃশব্দে ওদিকের ঝুল-বারান্দায় এসে দাঁড়াল। তারপর রেনওয়াটার পাইপ বেয়ে নেমে এল নীচে। মাটিতে পা দেওয়াব সময় ক্ষীণ একটা শব্দ উঠেছিল। কিন্তু সে শব্দ ওর কান ছাড়া আর কোথাও বুঝি পৌঁছয়নি।

মাটিতে কয়েক মুহূর্ত উবু হয়ে বসে থাকার পরে নিঃশব্দ দ্রুত পায়ে সামনের রাস্তাটা পেরিয়ে অন্ধকার মাঠের মধ্যে নেমে গিয়েছিল গোয়েন্দা। দিনেব বেলাতেই ওর পথটা ঠিক করে রেখেছিল ও। একটু ঘুর পথ, সেই পথ ধরে কিছুটা হাঁটার পরেই অপূর্বর বাড়ির পেছনদিকেব পাঁচিলের সামনে এসে গিয়েছিল গোয়েন্দা।

ঝাপসা অন্ধকারে ইতিমধ্যেই ওর চোখ বেশ সয়ে গিয়েছিল। এই তো এখানেই দেড় মানুষ উঁচু পাঁচিলের গায়ে সরু একটা ফাটল ধরেছে। ফাটলে পা লাগিয়ে ও তরতর করে উঠে গেল পাঁচিলের মাথায়, তারপর একই ভঙ্গিতে নেমে পড়ল বাড়ির ভেতরের কমপাউন্ডে। নামার সময় এবারও সামান্য একটু শব্দ উঠেছিল, কিন্তু সে শব্দও ওর কান ছাড়া আব কোথাও বোধহয় পৌঁছয়নি। তবু সাবধানের মার নেই। পাঁচিলের পাশে অন্ধকার একটু বেশি, ওই অন্ধকারের মধ্যে ও পাক্কা এক মিনিট বসে রইল চুপ করে।

গোটা বাড়ি ঘুমিয়ে আছে। পকেট থেকে ছোট্ট পেনসিল টর্চটা বার করে লঘু পায়ে দ্রুত হেঁটে ও ওদিকের ঝাউগাছের আড়ালে এসে দাঁড়াল। বাড়ির সামনের দিকের মতো পেছনেও মস্ত কম্পাউন্ড, তবে এদিকে ওদিকের মতো বাগান নেই। এলোমেলো ভাবে কিছু গাছপালা লাগানো আছে শুধু। ভেতরদিকেও একটা পাঁচিল, কিন্তু বাইরের মতো অত উঁচু নয়। এ পাঁচিল টপকানো গোয়েন্দার কাছে কোনও সমস্যাই নয়, কিন্তু কী আছে ভেতরে?

নিশুতি রাত। আকাশে আবছা আলো কখনও একটু বাড়ছিল, কখনও কমছিল।

ঝাউগাছের আড়াল ছেড়ে নিঃশব্দে কয়েক পা দ্রুত হেঁটে ওদিকের ঝুপসি গাছের পাশে এসে দাঁড়াল গোয়েন্দা।

এত বড় বাড়ি, কিন্তু কোথাও কোনও শব্দ নেই। অন্ধকারে ধারালো চোখে সামনের ওই পাঁচিলটার দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল কৌশিক। তারপর ঝুঁকে পড়ে দ্রুত পায়ে কিছুটা হেঁটে পাঁচিলের গায়ে গা লাগিয়ে দাঁড়াল। না, কোথাও কোনও শব্দ নেই।

একটু বাদে ডিঙি মেরে পাঁচিলের ওপর গলা তুলে ভেতরদিকে তাকাল। পাঁচিলের এ দিকে শানবাঁধানো মস্ত উঠোন। উঠোনের অপর প্রান্তে সারবাঁধা গোটাসাতেক ঘর। এ বার ধীরে ধীরে পাঁচিল টপকাল গোয়েন্দা। ঘরগুলোর লম্বা ছায়া এসে পড়েছে উঠোনে। এখানে নিজেকে লুকিয়ে রাখা সহজ। আবার কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দ অপেক্ষা। তারপর বসে পড়ে অদ্ভুত উপায়ে চার হাত-পায়ে হেঁটে ঘরগুলোর সামনের বারান্দায় উঠে পড়ল, আর ওঠার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ওদিকের একটা ঘরে নাইট ল্যাম্প জ্বলে উঠল. মুহূর্তের মধ্যে বারান্দার একটা থামের আড়ালে সরে গিয়েছিল গোয়েন্দা। শুধু সরাই নয়, কেমন যেন লেপটে গিয়েছিল থামের সঙ্গে। একটু বাদে নীল রঙের নাইট ল্যাম্প নিবে গেল আবার।

একদম কোণের দিকের ঘর থেকে খুব সরু গলায় চাপা কণ্ঠস্বর ভেসে আসছিল মাঝেমধ্যে। কান খাড়া করে শব্দের মানে ধরার চেষ্টা করল গোয়েন্দা। কিন্তু এত দূর থেকে কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না। শুধু এটা ধরতে পারছিল একটি নয়, দুটি কণ্ঠ। দুটিই মেয়ের। কী ভাষায় কথা বলছে?'

তীব্র মনঃসংযোগ করেও বোঝা গেল না। তবে কথাবার্তার মধ্যিখানের বিরতি দেখে এটা বুঝতে পারল—ঘুম এসে গেছে দুজনেরই। হয়তো কথা চলছে বহুক্ষণ ধরে। বেড়ালের মতো নিঃশব্দ পা ফেলে ফেলে ওই শব্দ অনুসরণ করে একদম কোণের ঘরের জানালার পাশে পৌঁছে গেল গোয়েন্দা। ভাষাটা ইংরেজি, কিন্তু জোরালো ভার্নাকুলার অ্যাকসেন্ট। জানলার পাল্লায় কান লাগাতেই অস্পষ্ট শব্দগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠল গোয়েন্দার কাছে। উচ্চারণ শুনে বোঝা গেল পূর্ব আর দক্ষিণ ভারতের অল্পবয়সী দুটি মেয়ে কথা বলছে। কিন্তু কী বলছে?

নিঃশ্বাস প্রায় চেপে রেখে কথাগুলোর মানে বোঝার চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগল গোয়েন্দা। যতটুকু যা বুঝল তাতে কৌশিকের জায়গায় অন্য কেউ থাকলে নির্ঘাত রোমাঞ্চিত হত। কিন্তু এই গোয়েন্দাটি অসম্ভব নিস্পৃহ ভঙ্গিতে রহস্য-রোমাঞ্চের মধ্যে ঢুকতে পারে। এটিও চর্চা করে আয়ত্ত করেছে।

জানলার ধারে অল্পস্বল্প মশার উৎপাত আছে। কিন্তু অসম্ভব সহ্যশক্তির পরিচয় দিয়ে কর্নাটকি মশাগুলোকে দেহের রক্ত খেতে দিচ্ছিল গোয়েন্দা।

আরও মিনিট-পনেরো কথা বলবার পরে ঘুমে কথা জড়িয়ে গিয়েছিল মেয়ে দুটির। তারপর আর কোনও শব্দ নেই। তার মানে ওরা এবার ঘুমিয়ে পড়েছে নির্ঘাত।

জানলার ফাঁক দিয়ে ঘরের ভেতরে পেনসিল টর্চের আলো ফেলতে গিয়েও থমকে গেল কৌশিক। না, এখন আলো ফেলা ঠিক হবে না। হয়তো ওদের ঘুম এখনও তত

গাঢ় হয়নি। কিন্তু এক-এক করে পাশের ছটি ঘরের জানলার ফাঁক দিয়ে টর্চের আলো ফেলে ভেতরের দৃশ্য দেখে নিল দ্রুত। ঘরগুলো যেখানে শেষ হয়েছে, সেখান থেকে ইংরেজি 'এল' হরফের ধাঁচে করিডর ঢুকে গেছে বাড়ির ভেতর দিকে।

পায়ে একটুও শব্দ না তুলে এ বার ওই করিডর ধরল কৌশিক। একদম শেষের ঘর থেকে নাক ডাকার গম্ভীর শব্দ ভেসে আসছিল। কিন্তু ওই ঘরটা পর্যন্ত পৌঁছবার আগেই হঠাৎই একটা ইঁদুর না ছুঁচো ওর পা ঘেঁষে ছুটে গেল। ঘটনাটা এতই আকস্মিক যে চমকে উঠে সরতে গিয়ে ওর হাতে ধাক্কা লেগে গেল একটা দরজায়। শব্দ খুব একটা জোরে ওঠেনি, কিন্তু নিশুতি রাতে ওই শব্দটাই বিকট হয়ে ছড়িয়ে গিয়েছিল চারদিকে। আর ওই শব্দ ওঠার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পাশের ঘরে জোরালো নিয়ন আলো জ্বলে উঠেছিল।

এখানে লুকোবার কোনও জায়গা নেই। দ্রুত একটু সরে গিয়ে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়েছিল কৌশিক। কোমরে পিস্তল ওর হাতে উঠে এসেছিল। বুকের মধ্যে দ্রুত ধকধকানি। ওর মনে হচ্ছিল, ওই শব্দটাও বোধহয় কিছু দূর পর্যন্ত পৌঁছে যাচ্ছে।

আশঙ্কা করছিল পাশের দরজা এক্ষুনি খুলে যাবে হাট হয়ে। ঘরের মধ্যে কে বা কারা আছে কে জানে! অস্ত্র বাগিয়ে নিয়েও বেরুতে পারে। পিস্তল-ধরা হাতটা আর একটু কঠিন হয়ে উঠেছিল গোয়েন্দার। কিন্তু এক মিনিটা দু মিনিট, তিন মিনিট, চার মিনিট, পাঁচ মিনিট নিঃশব্দ কেটে গেল। ঘরের দরজা খুলে কেউ বেরুল না। ঘরের ভেতরের নিয়নের জোরালো আলো ও দিকের খোলা জানলা দিয়ে বাইরে এসে পড়েছে। ঘরের মধ্যেও কোনও শব্দ নেই।

এই অবস্থায় এখানে পাঁচটা মিনিট থাকা মানে বিরাট সময় পার করে দেওয়া। কৌশিক এ বার পায়ে পায়ে খোলা জানলার দিকে এগোল। জানলার একটা পাল্লার কয়েকটা খড়খড়ি তোলা। কয়েকটা মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকার পরে খুব সাবধানে ওই খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে ঘরের ভেতর দিকে তাকাল।

ঘরের মধ্যে ঝকঝকে আলো, কিন্তু প্রথমে কাউকে দেখা গেল না। এ বার একটু সরে এসে চোখ ঘোরাতেই একটা লোককে দেখা গেল। উসকোখুসকো চুল, মুখে দিনতিনেকের না-কামানো দাড়িওয়ালা লোকটা বিছানার ওপর ঝুঁকে পড়ে কী যেন করছে।

কী করছে বোঝা গেল পরের মুহূর্তে। একটা অ্যাম্পুল ভেঙে সিরিঞ্জের ছুঁচ ঢোকাল তার ভেতরে। বেশ পাকা হাতে তরল পদার্থ ভরে ফেলল সিরিঞ্জে। তারপর বাঁ হাতের শিরার মধ্যে ছুঁচ ঢুকিয়ে ওষুধটা ঠেলে দিল দেহের মধ্যে। শূন্য সিরিঞ্জ রাখল বেডসাইড টেবিলের ওপর খট করে, তারপরেই বিছানায় শুয়ে পড়ে আলো নিভিয়ে দিল ঘরের। অন্ধকারে আবার চোখ সইয়ে নেওয়ার জন্যে কয়েক মুহূর্ত একই ভাবে দাঁড়িয়ে থাকল গোয়েন্দা।

ওদিকের ওই ঘর থেকে ভেসে-আসা গম্ভীর সেই নাক ডাকার শব্দ থেমে গেছে এখন। রাত আবার আগের মতোই নিশুতি। হাতের পিস্তলটা কোমরে গুঁজে নিয়ে যে পথে এসেছিল ঠিক সেই পথেই ছোট-বড় দুটো পাঁচিল টপকে বাইরের মাঠে এসে পড়ল গোয়েন্দা। তারপর আগের মতোই একটু ঘুরপথে এসে তরতর করে রেনওয়াটার পাইপ বেয়ে পৌঁছে গেল গেস্টহাউসের দোতলার ঘরে।

আবার টেবিলল্যাম্প জ্বলল। ড্রয়ার থেকে হাতে উঠে এল আবার সেই নোটবুকটা। লাল ফোনটা টেনে নিয়ে ডায়াল করল আবার। ওপাশ থেকে 'হ্যালো' ভেসে আসতেই

গোয়েন্দা বলল, 'গাঙ্গুলি ? ঘুম ভাঙাবার জন্যে দুঃখিত, কিন্তু কোনও উপায় ছিল না—। মনে হয়, কাল-পরশুর মধ্যেই একটা বড় ধরনের অপারেশনে নামতে হবে আমাদের। আমি সকাল আটটা নাগাদ তোমার বাড়িতে পৌঁছে যাচ্ছি। গিয়ে সব বলব। কোনও অসুবিধে হবে না তো তোমার ? ঠিক আছে, তা হলে গুড নাইট।'

॥ উনিশ ॥

আকাশ এখনও মেঘে ছেয়ে আছে। রাস্তা জলে ভেজা। রাস্তার ছোটখাটো গর্তগুলো বৃষ্টির জলে ভর্তি। বেলা সাড়ে-দশটা, কিন্তু ঘড়ির দিকে না তাকালে সময় বোঝা কঠিন। একটু আগেই চেম্বার খুলে বসেছেন গোয়েন্দার প্রবীণ সহকারী মুখার্জিবাবু। অফিসে এসেই ওঁর প্রথম কাজ হল সকালে খবরের কাগজটা খুঁটিয়ে পড়া। পড়ার আগে হেডিংগুলোয় চোখ বুলিয়ে নেন দ্রুত। তারপর খবরের ভেতরের অংশ পড়া।

পডার সময় প্রথমে চুপচাপ থাকেন, তারপর ওঁর ঠোঁট নড়ে, সবশেষে বিড়বিড় করে পড়েন। আজ বিড়বিড় করার মুখেই কমলেশ গুপ্ত এসে হাজির হলেন। এই ক'দিনের পরিচয়ে সুদর্শন, মৃদুভাষী এই মানুষটির সঙ্গে মুখার্জিবাবু বেশ মিশে গেছেন। কমলেশ আসতেই বেশ খাতির করার ভঙ্গিতে সামনের চেয়ারে ওঁকে বসিয়ে মুখার্জিবাবু বসলেন, 'ওহ্! কাল মাঝরাত্তিরে বেশ ঘাবড়ে গিয়েছিলাম।'

একটু উদ্বিগ্ন হলেন কমলেশ। 'কেন, কী হয়েছিল ?'

'আর বলবেন না। রাত্তিরে একটু শীত শীত ছিল। অঘোরে ঘুমোচ্ছিলাম। হঠাৎ ঘুম ভাঙতেই শুনি জানলায় বেশ জোরে জোরে কে যেন টোকা দিচ্ছে।'

'কে ?'

হেসে উঠে মুখার্জিবাবু জবাব দিলেন, 'কেউ না, শিলাবৃষ্টি হচ্ছিল। সেই শিল এসে পড়ছিল জানলায়। উঠে দেখি, তুমুল বৃষ্টি পড়ছে। সেই সঙ্গে শিল। বাড়ির সামনের পিচের রাস্তা বরফের টুকরোয় সাদা হয়ে গেছে। ইয়া সাইজ। ইটের টুকরোর মতো। ওই শিল মাথায় পড়লে মাথা ফাটবে।'

কমলেশ হাসলেন। 'অসম্ভব নয়। আমরা যে শিলাগুলো দেখি, সেগুলো তো মাটিতে পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়ার পরে।'

'কারেক্ট। ভাঙার আগে কোনও-কোনওটার সাইজ বোধহয় আধলা ইটের মতো। আর পড়ছে কোন্ উঁচু থেকে। ধরুন, এভারেস্টের মতো উঁচু জায়গা থেকে পড়ছে। নাকি আর একটু নিচু থেকে ?'

উত্তরে মজা পাওয়ার হাসি খেলল কমলেশের মুখে।

মুখার্জিবাবুর মুখে কিন্তু হাসি নেই। 'ঠিক আছে—এভারেস্ট বাদ দিন, কেদার-বদরি কিংবা অমরনাথের হাইট ধরুন ; চোদ্দো-পনেরো হাজার ফিট ওপর থেকে কোনও দুষ্টু

ছেলে আধলা ছুড়ল, সেটা এসে পড়ল নকুল মিত্তির লেনের এক বাসিন্দার মাথায়। ডেঞ্জারাস!'

মুখার্জিবাবু নিজের মাথায় হাত দিয়ে ঘটনার ফলাফল বোধহয় ভেবে নিলেন এক লহমায়।

কমলেশ একটা সিগারেট ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'মুখার্জিবাবু, এ ক'দিন আপনি আমাকে যে ভাবে সাহায্য করেছেন তার সত্যিই কোনও তুলনা নেই, এখন শুধু একটা কাজই বাকি।'

'কোন্ কাজটা বলুন তো?'

'একজন ম্যারেজ রেজিস্ট্রার দরকার। শ্রবণার বিয়ে তো সামনের বুধবার। রেজিস্ট্রারকে আমার মিন্টো পার্কের গেস্টহাউসে নিয়ে আসব। ফিজ্‌টা কোনও প্রবলেম নয়, তবে ঠিক সময়ে ওঁকে আসতে হবে। পরদিন সকালের ফ্লাইটেই মেয়ে-জামাইকে নিয়ে দিল্লিতে ছুটতে হবে।'

'ভাল কথা, আপনার জামাইবাবু কেমন আছেন এখন?'

'এই তো আজ সকালেই দিল্লির নার্সিংহোমে ফোন করেছিলাম। ডাক্তার বলছে, একটু বেটার। তবে খুব একটা আশার কথা শোনাচ্ছে না। আমি লে-ম্যান, তবু মনে হয়—অতিরিক্ত উদ্বেগ থাকার জন্যেই বোধহয় জামাইবাবুর ইমপ্রুভমেন্ট সে-ভাবে হচ্ছে না। মেয়ে-জামাইকে দেখার পরে উদ্বেগ কাটবে।'

একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে মুখার্জিবাবু বললেন, 'সত্যি, আমাদের জীবনটা কী অনিশ্চিত ভাবুন। এখন একরকম আছি, একটু বাদে কী হবে কে জানে! হপ্তাতিনেক আগে আপনার জামাইবাবু কি কল্পনাও করতে পেরেছিলেন—যাক্‌গে ওসব নিয়ে ভেবে এখন আর কী হবে। দুঃখকষ্ট নিয়েই তো জীবন—। কেউ ওগুলো এড়াতে পারে না। ম্যারেজ রেজিস্ট্রার নিয়ে চিন্তার কোনও কারণ নেই। চৌরাস্তার মোড়ে একজন বসেন, আমি আজকেই কথা বলে নেব। কী কথা হল—রাত্তিরে টেলিফোনে জানাব। আর কী করতে হবে বলুন?'

'আর তো বিশেষ কিছু করার নেই। লোকজন তো কাউকেই বলা হচ্ছে না। বরপক্ষের কয়েকজন আসবেন। এদিকে আপনি আছেন, আমি আছি। কৌশিক নিশ্চয়ই এর মধ্যে এসে যাবে। শুধু বিয়েটা রেজিস্ট্রি করা হবে। ব্যস, তাহলেই এদিকের কাজ শেষ। এত তাড়াতাড়ি বিয়েটা ঠিক করতে পারব—এটা ভাবিনি। আপনার ওপর দিয়ে কিন্তু প্রচণ্ড ধকল গেল।'

'না-না, ধকলের কী আছে। রোববার ঘরে বসে বসে টেলিফোন কল রিসিভ করা শুধু। তবে আপনি আসার পরে আমি ফ্রি হয়ে গিয়েছিলাম। আসল পরিশ্রম তো আপনার ওপর দিয়ে গেছে। একগাদা পাত্রপক্ষের সঙ্গে কথা বলা কি চাট্টিখানি কথা! তারপর পাত্রের ছবি বাছাই। আপনার প্রাইমারি সিলেকশনটা কিন্তু জব্বর—। আমরা সব মিলিয়ে পাত্র দেখেছি জনা-এগারো। সে ব্যাপারেও আপনি চটপট ডিসিশন নিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত যাকে বাছাই করা হয়েছে, মনে হয় সে পাত্র সব দিক থেকেই ভাল। অত্যন্ত সুদর্শন। বড় ঘর। আর একটা জিনিস আমার খুব ভাল লেগেছে।'

'কোন্‌টা বলুন তো?'

'প্রিন্টিংয়ের ব্যাপারে ছেলের ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি আছে। শ্বশুরমশাই তো কাগজের মিল বানাতে চান। জামাই এই ব্যাপারে নিশ্চয়ই ওঁকে সাহায্য করতে পারবে।'

'হ্যাঁ, এ-ব্যাপারটাও ভেবেছি আমি। প্রিন্টিং আর পেপার অ্যালায়েড। তবে ছেলে তো মস্ত চাকরি করে। ব্যবসায় রাজি হবে তো?

মুখার্জিবাবু বেশ একটু তাস ঠোকার ঢঙে বললেন, 'রাজি না হওয়ার কী আছে বলুন তো? এই যে এত পড়াশুনো, এত ডিগ্রিটিগ্রি— সে সবই তো শেষ পর্যন্ত রোজগারের জন্যে। শ্বশুরের একমাত্র জামাই। তাছাড়া শ্বশুর অসুস্থ—মানবিকতা বলেও তো একটা কথা আছে। আপনি তো আবার এদিকের ব্যাপারটা বলেও রেখেছেন।'

'হ্যাঁ, সে তো গোড়াতেই বলেছি। এত তাড়াহুড়ো করে বিয়ে দেওয়া, রেজিস্টার্ড ম্যারেজ—বিয়ের পরদিনই মেয়ে-জামাইকে নিয়ে দিল্লিতে ছোটা—সব কিছুই তো জামাইবাবুর অসুস্থতার কারণে। ছেলের বাবা অত্যন্ত ভদ্র—উনি বারবার বলেছেন, আপনার কিছু কাজ বরং আমাকে দিয়ে দিল্লিতে চলে যান। বিয়ের আগের দিন এলেই চলবে।'

'খুব ভাল মানুষ বলতে হবে। তো, আপনি দিল্লি চলে যান না।'

একটু অসহায় ভঙ্গিতে হেসে কমলেশ বললেন, "গিয়ে কী করব? জামাইবাবুর কেবিনে তো 'নো ভিজিটর্স' ঝোলানো। ডাক্তারবাবু অবশ্য বলেছেন, দেখা এক-আধবার করতে পারেন; তবে না করাই ভাল। দেখা করলেই ওঁর একটা ইমোশনাল আউটবার্স্ট হয়। ওঁর শরীরের পক্ষে সেটা এখন ক্ষতিকারক।"

'না-না, তাহলে আপনার যাওয়ার দরকার নেই। একেবারে মেয়ে-জামাইকে নিয়েই যাবেন। আচ্ছা—।'

'কী?'

'না থাক—।' মুখার্জিবাবু নিজেকে একেবারেই গুটিয়ে নিলেন।

কিন্তু কমলেশ ছাড়লেন না। 'কী হল, চুপ করে গেলেন কেন?'

কথা ঘোরাবার জন্যে মুখার্জিবাবু বললেন, 'একটু কফি খাবেন?'

'না-না, কফি খাব না। আপনি কী বলছিলেন বলুন। আপনার সঙ্গে আমার বন্ধুর মতো সম্পর্ক হয়ে গেছে। সঙ্কোচটঙ্কোচ করবেন না।'

আরও একবার পাশ কাটাবার চেষ্টা করলেন মুখার্জিবাবু, কিন্তু বেহাই না পেয়ে মুখ খুলতে বাধ্য হলেন। "আপনার ভাগ্নি শ্রবণার কথা খুব মনে পড়ছে। দুটো দিনের তো পরিচয়, কিন্তু এমন ভাল মেয়ে আমি খুব কমই দেখেছি। কী বিশাল ধনীব সন্তান, কিন্তু মুহূর্তের জন্যেও সেটা বুঝতে দেয় না। চমৎকার ব্যবহার। প্রথম আলাপেই আপন করে নিয়েছে। 'কাকু' বলে ডাকে, কিছু না খাইয়ে একদিনও ছাড়েনি। আর দেখতেও কী সুন্দরী। দুদিনেই বড্ড মায়া পড়ে গেছে মেয়েটির ওপর। এত ভাল মেয়ের খারাপ কিচ্ছু হতে পারে না। কিন্তু কী জানেন—।"

'কী?'

'আমাদের পেশাটা তো জানেন—। দিনরাত্তির শুধু অপরাধীদের ধাওয়া করতে হয়। মানে, মানুষের অন্ধকার দিকটা আমরা এত দেখেছি যে—আমি কী বলতে চাইছি, বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই—।'

কমলেশ সত্যিই কিছু বুঝতে পারেনি, দুদিকে মাথা নাড়িয়ে সেটা উনি সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দিলেন।

ইঙ্গিত ব্যর্থ হলে প্রত্যেকে বোধহয় একটু দমে যায়। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে মুখার্জিবাবু বললেন, 'আমি বলছিলাম কি, এত তাড়াহুড়ো করে আপনার ভাগ্নির বিয়ে এখন না দিলেই কি হত না?'

বেশ অবাক হলেন কমলেশ। 'কেন তাড়াহুড়ো করতে হচ্ছে—আপনি তো গোড়া থেকেই জানেন। আমি কাজকর্ম ফেলে ভদ্রক থেকে ছুটে এসেছি এখানে। ক্লাস কামাই করিয়ে পুণে থেকে শ্রবণাকে নিয়ে এসেছি। ধরতে গেলে রাতারাতি পাত্র ঠিক করা হয়েছে। অনেক বলে কয়ে শ্রবণার মত করিয়েছি বিয়েতে। বিয়ে মানে শুধুমাত্র বিয়েটা এখন রেজিস্ট্রি করা। আমার ভাগ্নির বিয়ে তো এ ভাবে হওয়ার কথা নয়। পরে অবশ্য ঘটা করে হিন্দুমতে বিয়ে হবে। বিস্তর হইচই হবে। কিন্তু এখন তো জামাইবাবুকে বাঁচানো দরকার সবার আগে।'

একটু অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন মুখার্জিবাবু। 'না-না, আপনি যা করেছেন তা ঠিকই করেছেন, কিন্তু আমি বলছিলাম কি—।'

'কী?'

সামান্য দোনামনা করার পরে এবার বেশ খোলামেলা গলাতেই মুখার্জিবাবু বললেন, 'পাত্র সম্পর্কে আরও একটু খোঁজখবর নিলে হত না?'

'নিয়েছি তো।'

'না, আমি বলছিলাম কি, আরও ভাল ভাবে, একটু সময় নিয়ে, আরও পাঁচটা সোর্স থেকে! আমার দুশ্চিন্তাটা কোত্থেকে আসছে জানেন? আমাদের হাতেই তো এখন এই ধরনের দু-তিনটে কেস ঝুলছে। মিথ্যে পরিচয় দিয়ে বিয়ে করে পাত্র হাওয়া। প্রথম মেয়েটাকে তো বিয়ের রাতে খুনই করে ফেলল। টাকাপয়সা, গয়নাগাটি হাতানো, একটা মেয়েকে বিয়ের পরে বেপাত্তাই করে দিল একজন। শুনেছেন তো আপনার বন্ধুর কাছে। এই যখন অবস্থা—তখন আরও ভালভাবে, আর কিছুটা সময় নিয়ে পাত্রের, পাত্রপক্ষের খোঁজ নেওয়া উচিত নয় কি?'

বেশ থমথমে দেখাচ্ছিল কমলেশের চোখমুখ। 'এই ঘটনাগুলোর কথা এক-আধবার নয়, বারবারই আমার মাথায় এসেছে। এসেছে বলেই যত দূর সম্ভব আমি খোঁজখবর নিয়েছি। ওদের বাজিয়ে দেখেছি বারবার, কিন্তু সন্দেহ করার মতো কিছুই তো দেখিনি এখন পর্যন্ত। এমনকী ওদের স্পষ্ট বলে দিয়েছি এই মুহূর্তে মেয়ের গয়নাগাটি কিছুই দিতে পারব না, কোনও খাতে কোনও টাকাপয়সাও নয়। এ ভাবে বলার পরে ওরাই আমাকে লজ্জায় ফেলে দিয়েছিল। ছেলের বাবা বলেছেন: ছি-ছি, এ কী বলছেন আপনি! মেয়ের বাবা ক্রিটিক্যালি ইল্। ওঁদের যাতে তাড়াতাড়ি সুস্থ করে তোলা যায়, সেটাই তো আমাদের দেখা উচিত সবার আগে। আমরা আপনার মনের অবস্থা বুঝতে পারছি। টাকাপয়সা, ম্যানপাওয়ার কিংবা অন্য কোনও ব্যাপারে যদি কোনওরকম সাহায্যের দরকার হয়, নিজের লোক ভেবে আমাদের বলবেন। কোনওরকম সঙ্কোচ করবেন না। বেফাঁস কথাগুলো বলে ফেলার জন্যে আমি তখন লজ্জায় মরি।'

কমলেশের কথা শুনতে শুনতে মুখার্জিবাবুর চোখমুখ ঝলমলে হয়ে উঠেছিল আবার। 'আরে, এই কথাগুলো তো আপনি আগে আমাকে বলেননি। যাক, এবার আমি অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করছি।'

মুখার্জিবাবু নিশ্চিন্ত হওয়ার একটু বাদেই বেশ ঝকঝকে রোদ উঠল। আকাশের মেঘ কেটে গেছে অনেকখানি। নীল আকাশ। চমৎকার হাওয়া ছেড়েছে। কলকাতা এখন পরিচ্ছন্ন হওয়ার ব্যাপারে প্রকৃতির ওপর অনেকখানি নির্ভরশীল। বৃষ্টিতে রাস্তার গাছপালার ধুলো ধুয়ে যায়। পাতার সবুজ আভা পথচারীদের চোখে আরাম আনে খানিকটা।

বিরল প্রজাতির প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে আসা পশুদের জন্যে পশুপ্রেমিকরা চোখের জল ফেলেন প্রায়ই। আর কলকাতার মানুষদের চোখের জল প্রায় শুকিয়ে এসেছে সরকারি বাসের জন্যে কান্নাকাটি করে করে। ভারতের অন্য কোনও মেগাসিটি তো দূরের কথা, মাইনর সিটিতেও সরকারি বাস নামক প্রজাতিটি লুপ্ত হয়নি। বরং পরিবহণ ষষ্ঠীর কৃপায় সেখানে ওদের সংখ্যা বেশ বেড়ে গেছে। কলকাতার অফিসবাবুরা এখন অফিস-শ্রমিক। প্রতিদিন অদ্ভুত উপায়ে সংগ্রাম চালিয়ে চারচাকাওয়ালা টিনের বাক্সে ঢোকেন। বাক্স সব সময়ই ঠাসা। প্রাণায়াম, যোগব্যায়ামের সাহায্যে নিঃশ্বাস বন্ধ করে পনেরো মিনিটের পথ পাড়ি দেন পঁয়তাল্লিশ মিনিটে।

এখন কেউ যদি বলে—সারাদিনে সে দশটা সরকারি বাস নিজের চোখে দেখেছে, লোকে তাকে মিথ্যেবাদী বলে। জরাজীর্ণ বেসরকারি টিনের বাক্সগুলো একটানা দশ গজের বেশি ছুটতে পারে না। হাঁপায়। আর হাঁপালেই গলগল করে ছাড়া কালো ধোঁয়ায় সূর্যগ্রহণ হয়ে যায়।

দূষণ প্রতিরোধ সংস্থার মানুষজনের দয়ার শরীর। সঙ্গত কারণেই এই সব চারচাকাগুলোকে তাঁরা বকাঝকা করেন না। ফলে মহানগরী কলকাতার পথের দুদিকের সবকিছুই ধোঁয়াকালিতে লেপটে থাকে। এদের কিছুটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব নেয় প্রকৃতি। আচমকা জোর বর্ষণে চারদিক একটু ধোওয়াধুয়ি হয়ে গেলে বোঝা যায় কলকাতা এখনও মরেনি।

কাল ভোররাতে জোর বৃষ্টি হওয়ায় কলকাতায় এখন একটু তাজা ভাব ফিরে এসেছে। এদিকের ওই থানাটার সামনে দুটো ঝাঁকড়া গাছ আছে। ওই গাছদুটোয় যে শুধু পাতা নয়, কিছু ফুলও আছে—এই মরসুমে তা এই প্রথম বোঝা গেল। থানার সামনে অ্যাম্বাসাডর থেকে নামলেন অধ্যাপক মৃদুল ভট্টাচার্য, তারপর হনহন করে ঢুকে গেলেন থানার ভেতরে।

ইন্সপেক্টর অবনী ঘোষরায় বেশ একটু আপ্যায়নের ভঙ্গিতেই বললেন, 'আসুন-আসুন প্রফেসর ভট্টাচার্য। আপনাদের মতো গুণী মানুষদের দেখলেও ভাল লাগে। বসুন।'

অধ্যাপক গম্ভীর মুখে সামনের চেয়ারটায় বসলেন। কিন্তু উনি কিছু বলার আগেই ইন্সপেক্টর ভারী গলায় বললেন, 'প্রায় তিরিশ বছর পুলিশের চাকরিতে আছি। আমাদের চোখ এখন এক্স-রে আইয়ের মতো হয়ে গেছে। কারও দিকে একবার চাইলেই বুঝতে পারি তার ভেতরে কী আছে। একদম প্রথমদিকে প্রসেনজিতের দিকে সে ভাবে তাকাইনি, পরে একদিন ভাল করে তাকাতেই খটকা লাগল। ব্যস্, সঙ্গে সঙ্গে ওর পেছনে লোক ফিট করে দিলাম। ওর গুণের অন্ত নেই। বহুদিন ধরে কুকর্ম করে বেড়াচ্ছে। সেদিন ওর

কাছে ওই পেপারকাটারটা দেখেই সন্দেহ হয়েছিল আমার। মনে মনে বলেছিলাম, তুমি তো বাবা পড়াশুনো লাইনের লোক নও, এটা দিয়ে কী করবে? ঘোড়ার বই, সাট্টার বই ওলটাতে গেলে তো আর পেপারকাটারের প্রয়োজন হয় না। তবে? এটা কার জিজ্ঞেস করতেই ফোঁস করে উঠে জবাব দিয়েছিল প্রসেনজিৎ, হোয়াট ডু ইউ মিন? আমার কাছে যখন আছে তখন এটা আমারই। আমি মনে মনে বলেছিলাম—ঠিক আছে, জবাব দিচ্ছি। মুখে বলেছিলাম: বাহ্! বেশ তো দেখতে এটাকে। জুয়েলটুয়েল লাগানো আছে। বিলিতি বলে মনে হচ্ছে। দেখি একবার। পুলিশের চোখ তো, একটু খুঁটিয়ে দেখতেই চোখে পড়ল—একধারে খুদে খুদে হরফে প্রফেসর এম. ভট্টাচার্য এমবস্ করা আছে। সঙ্গে সঙ্গে দুয়ে দুয়ে চার বানিয়ে ফেললাম। আপনার শালার সঙ্গে ওর একসময় খুব ভাব ছিল। সেই সুবাদে আপনাদের বাড়িতে মাঝেমধ্যে ঢুঁ মারা অসম্ভব নয়। আপনি চব্বিশ ঘণ্টা পড়াশুনো নিয়ে থাকেন। কখন কোথায় কী রাখলেন—খেয়াল রাখা সম্ভব নয়। পার্টি তাল বুঝে ওটা ঝেড়ে দিয়েছে। বাঙ্গালোরে এসব শৌখিন জিনিসের অনেক খদ্দের আছে। তেমন খদ্দের পেলে চড়া দামে ওটা বেচে দিতে পারত। আপনাকে ফোন। আপনি এলেন। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধার হয়ে গেল একটা অমূল্য জিনিস। আপনার কাছে এর আবার একটা বাড়তি দাম আছে। ওই যে কী বলে—মেমেন্টো। না?'

গড়গড় করে নিজের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির বাসি কাহিনী শুনিয়ে বেশ চড়া গলার একটা বাহবা আশা করেছিলেন ইন্সপেক্টর। কিন্তু অধ্যাপক ও লাইনে গেলেন না। বরং ওঁর মুখ বোধ হয় একটু গম্ভীর হয়ে উঠেছিল। কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু আবার ওঁকে থামিয়ে দিয়ে ইন্সপেক্টর বললেন, 'আপনার ইম্পরট্যান্ট ডকুমেন্টসের কথা বলবেন তো? না, ওগুলো এখনও পাইনি। তবে ও যদি সরিয়ে থাকে, আমি ঠিক বার করে ছাড়ব। লক-আপে রেখে দিয়েছি এখনও।' হঠাৎই উঁচু গলা খাদে নামিয়ে ঘোষরায় বললেন, 'সেদিনই ভোররাতে চুল ধরে একটানে দাঁড় করিয়ে দিয় কিছু থার্ড ডিগ্রি অ্যাপ্লাই করেছি। বিষদাঁত ভেঙে গেছে, ফণা তুলে কথা বলার আর সাধ্যি নেই। এখন শুধু গর্ত খুঁজে বেড়াচ্ছে পালাবার জন্যে। আজ আর একবার তুলব। মনে হচ্ছে, আর এক দফা পেটাই খেলে সব কথাই বেরিয়ে আসবে হুড়হুড় করে। আমার মনে হচ্ছে, আপনার মূল্যবান এমন আরও কিছু-কিছু জিনিস বার করে দেব যেগুলোর কথা আপনার খেয়ালই নেই।'

অধ্যাপকের এবারও কোনও ভাবান্তর হল না। মানুষটিকে আর একবার দেখে নিয়ে ইন্সপেক্টর বললেন, 'আপনার তো এখনও বাইরে থাকার কথা। কনফারেন্স কি তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল?'

'না, একটা জরুরি ফোন পেয়ে আজ সকালের ফ্লাইটেই ফিরে এসেছি আমি।'

'জরুরি ফোন। বাড়ির খবরাখবর সব ভাল তো?'

অধ্যাপকের চোখমুখ বেশ থমথম করছিল। 'না, ভাল নয়। আমি আপনার কাছে এখন একটা কমপ্লেন লজ করতে এসেছি।'

'কমপ্লেন। কার বিরুদ্ধে?'

'একজন ডাক্তারের নামে। রেলের ডাক্তার। নাম সৌমিত্র ঘোষ।'

'আপনার অভিযোগটা কী?'

'সামথিং ভেরি ভেরি গ্রেভ। আমি ওই লোকটার নামে কিডন্যাপিংয়ের কমপ্লেন লজ করতে চাই।'

প্রকাণ্ড শরীরটা নিয়ে একটু নড়েচড়ে বসলেন ইন্সপেক্টর। 'কিডন্যাপিং! কাকে অপহরণ করেছে লোকটা?'

'আমার স্ত্রী সুনেত্রাকে।'

একটা ঢোক গিললেন ইন্সপেক্টর ঘোষরায়। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনাকে এটা কে বলল? কোনও আই-উইটনেস আছে?'

'না, কেউ দেখেনি। আমাকে বাড়ি থেকে ফোন করে জানিয়েছে, সুনেত্রাকে সকাল থেকে পাওয়া যাচ্ছে না।'

আর একবার ঢোক গিললেন ইন্সপেক্টর। 'এমনও তো হতে পারে উনি কোথাও গেছেন। হয়তো ওঁর আত্মীয়স্বজনের কেউ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন হঠাৎ। কিংবা কোনও খারাপ খবর——।'

'না, ওর তেমন কোনও আত্মীয়স্বজনই নেই।'

'কিন্তু কিডন্যাপিংয়ের কথাটা আপনার মাথায় আসছে কেন?'

'কারণ, কিডন্যাপার কাল রাত্তিরে আমাদের বাড়িতে ছিল।'

'বাড়িতে ছিল! কে দেখেছে?'

'সবাই দেখেছে। কাল রাত্তিরে ওদের নেমন্তন্ন ছিল আমাদের বাড়িতে।'

'নেমন্তন্ন! ওদের মানে? ডাক্তারের সঙ্গে আর কে ছিল?'

'ডাক্তারের স্ত্রী। আমার স্ত্রী বাড়িতে একটা কিন্ডারগার্টেন চালায়, সেই স্কুলের একজন শিক্ষিকাও ছিলেন।'

ইন্সপেক্টর ঘোষরায় একটু খুঁটিয়ে দেখে নিলেন অধ্যাপককে, তারপর বললেন, 'বাড়িতে সস্ত্রীক নেমন্তন্ন, রাত্রে ছিল, তার মানে ধরা যেতে পারে——ওরা আপনার স্ত্রীর অনেকদিনের পরিচিত।'

'ওরা সবাই নয়, ডাক্তারের বউ অবশ্য আমার স্ত্রীর ছোটবেলার বান্ধবী।'

ইন্সপেক্টর ওঁর চেয়ারের হাতলে-রাখা হ্যান্ড-টাওয়েল দিয়ে চোখমুখ একবার মুছে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার স্ত্রীকে পাওয়া যাচ্ছে না—— এই খবরটা আপনার বাড়ি থেকে ফোন করে আপনাকে কে জানিয়েছে?'

'ডাক্তারের স্ত্রী রিমি।'

'ডাক্তার তো তাহলে——।'

'না, ডাক্তার আজ সকালে স্ত্রী ছাড়াই জব্বলপুরে চলে গেছে। জব্বলপুরে ওর পোস্টিং।'

একটু যেন ধাঁধায় পড়ে গিয়েছিলেন ইন্সপেক্টর। অধ্যাপক সেটা দূর করার জন্যেই বোধহয় হাতের খামটা ইন্সপেক্টরের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'এর মধ্যে ওদের দুজনের কিছু চিঠিপিত্তর আছে। ইউ মে কল দিজ লাভ লেটার্স।'

একটা বিন্দুর মতো হাসি ইন্সপেক্টরের ঠোঁটে ফুটে উঠেই মিলিয়ে গিয়েছিল। একটু কেশে গলা পরিষ্কার করে উনি বললেন, 'ওদের মধ্যে যদি কোনও ঘনিষ্ঠতা থেকে থাকে, আর আপনার প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রী যদি স্বেচ্ছায় চলে গিয়ে থাকে——তবে এটাকে আপনি কিডন্যাপিং বলতে পারেন না।'

অধ্যাপক ভট্টাচার্যের চোখমুখ অসম্ভব থমথম করছিল। একটু যেন কেটে কেটে উনি বললেন, 'আইন অল্পস্বল্প আমারও জানা হচ্ছে। ডাক্তারের একটা চিঠিতে পরিষ্কার লেখা আছে—তুমি না এলে আমি তোমাকে জোর করে ধরে নিয়ে আসব। আমার স্ত্রীর সঙ্গে ডাক্তারের বহু পুরনো একটা অ্যাফেয়ার ছিল, কিন্তু আমার মধ্যবয়স্কা স্ত্রী সেই টানে এখন তো আর ঘর ছাড়তে পারে না। সুনেত্রা পাগল নয়, তাছাড়া ও একটু টিমিড নেচারের। আপনি যদি আমার কমপ্লেন নিয়ে আপত্তি করেন, আমি ডি সি ডি ডি ওয়ানের কাছে যাব। হি ইজ পার্সোন্যালি নোন টু মি।'

একটু আগে মুখ মোছা সত্ত্বেও বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠেছিল ইন্সপেক্টরের মুখে। উনি লম্বা খাতা আর কলম টেনে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কিডন্যাপিংয়ের মোটিভ কী? মানে, আপনার কী মনে হয়? অপহরণের কারণ কী হতে পারে?'

জবাবে অধ্যাপক স্পষ্ট করে বললেন, 'খুব পরিষ্কার। লিখুন—মার্ডার. অর সাম ইভিল ডিজাইন।'

॥ কুড়ি ॥

কেউ-কেউ বাঙ্গালোরকে শীতাতপনিয়ন্ত্রিত শহর বলে থাকেন। সারা বছরের আবহাওয়ায় বড় ধরনের রকমফের নেই এখানে। গরমকালে খুব একটা গরম পড়ে না, শীতকালেও বিশেষ শীত নেই। শীতের সন্ধেয় পথে বেরুলে শীত তাড়াবার জন্যে হাফহাতা পাতলা একটা সোয়েটারই যথেষ্ট। অন্য সময় ঝুপঝুপ করে একটু বৃষ্টি হয়ে গেলে শীতের মৃদু হাওয়া ছাড়ে।

বৃষ্টিপাতের ধরনের মধ্যে কেমন যেন একটু পশ্চিমী ভাব আছে। ধনী শহরটির জীবনযাত্রার মধ্যেও পশ্চিমের ছাপ আছে কিছুটা। শহরের কেন্দ্রে বেশ কয়েকটি পাব্। সন্ধেয় পাবের সামনে-ভেতরে তরুণ-তরুণীদের ভিড় জমে যায়। চড়া তালের নাচগানের শব্দ আলোকমালায় সাজানো শহরের বেশ কয়েকটি জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। পাব্ থাকলেই 'পাব্ ক্রলিং' হয়, তবে সেটা একটু বেশি রাতের দিকে।

যাকে হালের ভাষায় বলে ডাউনটাউন এরিয়া, তেমন একটি এলাকাতেই শহরের সবসেরা হোটেলের একটি—দি তাজ ওয়েস্ট এন্ড। রেসকোর্স রোডের এই হোটেলটিকে এক কথায় স্বপ্নপুরী বলা যায়। স্বপ্নপুরীতে ঘরের সংখ্যা শ'দেড়েক। নানা দামের ঘর। সব চাইতে বেশি ভাড়া স্যুইটের। আরবের দুই শেখ দুটি সেরা স্যুইট ভাড়া নিয়েছেন। ওঁদের কাছে অবশ্য ঘর ভাড়া সামান্যই। এই হোটেলের সবসেরা একটি স্যুইটের ভাড়া মার্কিন ডলারের হিসেবে ৬০০। তার মানে প্রতি চব্বিশ ঘন্টার জন্য ভারতীয় মুদ্রায় ভাড়া দাঁড়াচ্ছে

মাত্র চব্বিশ হাজার টাকা। ঘণ্টাপিছু হাজার টাকা। সামান্য কিছু ট্যাক্সও যোগ করা হবে আবার এই ভাড়ার সঙ্গে।

আজ সন্ধেয় হোটেলের সবচেয়ে বড় ব্যাঙ্কোয়েট হলটি বেহেস্তের ফুলবাগিচা হয়ে উঠেছে। দুই শেখ বিয়ে করছে দুই ভারতীয় সুন্দরীকে। বিয়ের অনুষ্ঠান বলতে কিছুই নেই তেমন, রেজিস্ট্রি করে বিয়ে হবে শুধু। তারপর জব্বর খানাপিনা। পার্টি গড়াবে মাঝরাত্তির পর্যন্ত। কালকেই দুই শেখ দুই ভারতীয় বউ নিয়ে উড়ে যাবে নিজের দেশে।

পৃথিবীতে সবকিছুরই প্রদর্শনী হয়। তবে সব চাইতে চোখধাঁধানো প্রদর্শন বোধহয় সম্পদেরই হয়ে থাকে। দুই শেখ নিমন্ত্রিতদের জন্যে যে খানাপিনার আয়োজন করেছেন, তা দেখে বা তার কথা শুনে হোটেলের কর্মীরাও রোমাঞ্চিত।

নিমন্ত্রিতদের সংখ্যা মাত্র শতখানেক। মূল নিমন্ত্রিত অবশ্য বিশজন, বাকি আশিজন তাঁদের ইয়ারদোস্ত। একটা কথা নিয়ে জোর কানাকানি চলছে হোটেলে। দুই শেখ নাকি অসম্ভব দামি শ্যাম্পেনে বাথটাব ভর্তি করে স্নান করাবে দুই নববধূকে।

সন্ধের মুখ থেকেই দু-চারজন করে শেখদের অতিথি আসতে শুরু করেছিল হোটেলে। একজন এলেন একেবারেই একা। দামি গাড়ি হোটেলের সামনে থামতেই শেখদের রিসেপশন পার্টি মহা সমাদরের সঙ্গে আপ্যায়ন করল। সব নিমন্ত্রিতের জন্যই সমান সমাদর। তবে এই মানুষটি একা ছিলেন বলে আপ্যায়নের চাপ এঁকে একটু বেশিই সহ্য করতে হয়েছিল।

দুই কনে এসে গেছে দুপুরেই। এখন ওরা হোটেলের ক্লাবরুমে। বিউটি পার্লারের মেয়েরা ওখানেই ওদের মেক-আপ দিচ্ছে। সন্ধে সাতটায় ম্যারেজ রেজিস্ট্রি করার জন্যে ওদের নির্দিষ্ট একটি ঘরে নিয়ে যাওয়া হবে। শুভবিবাহ সুসম্পন্ন হওয়াব পরেই শুরু হবে পার্টি।

যে যুবকটি এইমাত্র এলেন তিনি বোধহয় লখনউয়ের একজন সম্ভ্রান্ত মুসলিম। পরনে পাজামা আর লম্বা ঝুলের কুর্তা। মুখে কুচকুচে কালো চাপদাড়ি, মাথায় টুপি, চোখে আবছা নীল রঙের চশমা। দোহারা চেহারার যুবকটি ব্যাঙ্কোয়েট হলে একবার উঁকি মেরেই সরে এলেন। পার্টি শুরু হতে এখনও মিনিট-পঁয়তাল্লিশ বাকি। যুবকটি এই হোটেলে আজকেই প্রথম এসেছেন, ঠিক করলেন—এই সময়ের মধ্যে হোটেলেব যতটা সম্ভব ঘুরে দেখে নেবেন।

সেন্ট্রালি এয়ারকন্ডিশন্ড হোটেল। লবির কার্পেট প্রতিবার পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে আধ ইঞ্চি মতো পা ডুবে যাচ্ছিল। নানা রঙের দেয়াল উজ্জ্বল হয়ে আছে লুকনো জায়গার মৃদু আলোয়। উঁচু সিলিং থেকে ঝোলানো ঝাড়লণ্ঠন, মোমদানের ছায়া, দেয়ালে বিখ্যাত ছবির প্রিন্ট, তিন-মানুষ-প্রমাণ ঝকঝকে আয়না, নতুন-নতুন ডিজাইনের ফার্নিচার ইত্যাদি স্বপ্নপুরীর বারমহলের একটিমাত্র অংশকে ধরে রেখেছে।

যুবকটি লবি ধরে আরও এগোতে লাগলেন। এদিকে কফি শপ, বার, ফিটনেস সেন্টার, বুক শপ, শপিং আর্কেড আর কারেন্সি এক্সচেঞ্জ এরিয়া। খুব নিচু ভলিয়ুমে চ্যানেল মিউজিক বাজছিল।

ওদিকে সুইমিং পুলে নীল টলটলে জল। দুজন সুন্দরী গায়ে দু-টুকরো কাপড় লাগিয়ে মাছের মতো সাঁতার কাটছে পুলে। তীরে রঙিন ছাতার নীচে ছড়ানো চেয়ারে স্বল্প বাসের এক পুরুষ ও মহিলা শুয়েছিল। হঠাৎ ওরা উঠে পড়ে ওদিকের ঘরের দিকে হাঁটা দিল।

ওদের চলায় আলস্য। শরীরে কড়া ধাঁচের পানীয়র প্রভাবও আছে বোধহয় কিছুটা। সুদীর্ঘ সময়ের স্নানপর্ব সারার পরে ওরা এবার ঘরে ফিরে নির্ঘাত ডিনারের পোশাক পরে বেরুবে।

ক্যুজিনে ইন্ডিয়ান, কন্টিনেন্টাল, চাইনিজ, ওরিয়েন্টাল, অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান—সব কিছুরই ব্যবস্থা। পুলসাইড বার বি কিউয়ের আয়োজনও আছে। আপ রুচিত খানার ঢালাও বন্দোবস্ত স্বপ্নপুরীতে।

লবির একধারে কাচেমোড়া চমৎকার একটা টেলিফোন বুথ। বুথে ঢুকে পড়ে চটপট টেলিফোনের একটি লাইন ধরলেন যুবকটি। তারপর নিচু গলায় বললেন, 'মধুসূদনবাবু, আমি কৌশিক। ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় অপেক্ষা করছেন বলে ধন্যবাদ। কাজ ঠিক ভাবে এগোচ্ছে তো ? বাহ্! শুনুন, ওই বাগানবাড়িতে একা যাবেন না ? বিপদের আশঙ্কা আছে। আপনাকে সাহায্য করার জন্য খালেককে বলা আছে আমার। ওকে আপনি সঙ্গে নিয়ে যাবেন। কী বললেন, খালেক নেই। জঙ্গলপুরে! কেন ? কাল ফিরছে ? ঠিক আছে, ফেরামাত্তর যোগাযোগ করবেন। আর যে ভাবে যা বলেছি—। ফেরার পরে দেখা হবে। সাবধানে থাকবেন। ছাড়ছি—।'

কৌশিক যখন ব্যাঙ্কোয়েট হলের ফুলবাগিচায় ফিরে এল তখন ওর ঘড়িতে আটটা বাজতে দশ। জমে ওঠার মুখে পার্টি। চারদিকে ঝলমলে আয়োজন। পৃথিবী থেকে কিংডম লোপাট হয়ে যাওয়ার মুখে, কিন্তু যা চোখে পড়ার মতো বেড়ে উঠেছে তা হল শেখডম। হাতে স্কচের গ্লাস সাঙ্গোপাঙ্গো সমেত কয়েকজন শেখের চোখেমুখে ফুর্তির রাত শুরু করার আভাস। এই শেখরা বোধহয় কুয়েত, ওমান, সৌদি আরব আর কাতারের। ওদের গল্পের ফাঁকে ফাঁকে ওই সব দেশের নামগুলো কেমন যেন ছিটকে উঠছিল সিলিংয়ের দিকে।

ঝকঝকে পোশাকের দক্ষ ওয়েটাররা ড্রিংক্সভর্তি ট্রে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল সর্বত্র। যে-কেউ তার গ্লাসে শেষ চুমুক মারার পরেই তার পাশে ওয়েটারকে দেখতে পাচ্ছে। কৌশিক ও রসের খুব একটা রসিক নয়, কিন্তু স্রোতে গা ভাসাতে না পারলে কাজের অসুবিধে। হাতে একটা গ্লাস তুলে নিয়ে কপালে ফোঁটা-কাটা এক শেঠের সঙ্গে হিন্দিতে গল্প জুড়েছিল ও। গল্প করতে করতে সিলিং থেকে অর্কিড-ঝোলানো পিলারের পাশে গিয়ে চাপা গলায় কৌশিক বলল, 'গাঙ্গুলি, সব ঠিক আছে তো ?'

ফোঁটা-কাটা শেঠের আওয়াজও চাপা। 'না, একটু গোলমাল হয়েছে মনে হয়। আমার এজেন্সির রিটাকে মিসেস সাজিয়ে এসেছি। ও ওদিকের ক্লাবরুম থেকে ঘুরে এসে বলল, দুই কনেই অসুস্থ হয়ে পড়েছে। একজন একটু বেশিই। বোধহয় স্ট্রেন থেকে। ম্যারেজ রেজিস্ট্রারকে রাত্তিরে থেকে যেতে বলা হয়েছে। কনেরা একটু সুস্থ হলেই বিয়ে হবে।'

'আমাদের সবাই তো এসে গেছে, না ?'

'হ্যাঁ, সবাই। কয়েকজন মাত্র ভেতরে আছে। বাকি সবাই বাইরে। তুমি যেমন বলেছিলে—।'

'ও কে। চলো আমরা ভিড়ে মিশে যাই। তোমার সঙ্গে পরে কথা হবে আবার।'

ভিড় আর একটু বেড়েছে। একটা-দুটো গ্লাস শেষ হওয়ার পরে অতিথিদের গলার স্বরও আর একটু চড়েছে। ড্রিংক্সের সঙ্গে গলাগলি করে চলতে পারে ট্রে-ভর্তি এমন

সব মুখরোচক স্ন্যাক্স নিয়ে বেশ কয়েকজন ওয়েটার ঘুরছিল। কৌশিকের পাশে একজন থামতেই ও টুথ-পিকে গাঁথা একটা মিট বল তুলে নিল।

বলটা মুখে ফেলতেই নিখুঁত সাহেবি-পোশাক-পরা বড়সড় চেহারার এক ভদ্রলোক 'হাই আহ্‌মেদ' বলে হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এলেন কৌশিকের কাছে। কৌশিক দাঁতে চাপে মিট বলটাকে একটু থেঁতলে নিয়ে ভরাট গলায় বলল, 'হাই চাওলা।'

যে-সব কথা পৃথিবীর যে-কারও সামনে অক্লেশে বলা যায়, সেই ধরনের কিছু কথা উঁচু গলায় বলতে বলতে ওরা ভিড় থেকে বেরিয়ে এল। আরব দেশের মানুষের বিয়ে, তাই বোধহয় ওদিকে ছোট্ট একটা মরূদ্যান বানানো হয়েছে। নকল মরূদ্যানে নকল খেজুর গাছ। আলো-আঁধারি এখানে জল আর মরুভূমির আভাস তৈরি করেছে।

খেজুর গাছের ছায়ায় আসতেই দুজনের উঁচু গলার কুইক অ্যাকসেন্ট ইংলিশ চাপা গলার বাংলা হয়ে গেল। 'মিলনদা, আপনার অপারেশন প্ল্যানটা ছকা হয়ে গেছে তো?'

কৌশিকের প্রশ্নের উত্তরে সাহেবি-পোশাক বললেন, 'হ্যাঁ, পাক্কা। আচ্ছা, ওই দুটো তো এসে গেছে।। তিন নম্বরটা আসেনি এখনও?'

"এসেছে। জব্বর মেক-আপ। আমি একটু বাদেই ওর পিঠে টোকা মারব। ঘুরলেই 'সরি' বলব, আপনি চিনে নেবেন তখন। এদিকে ডিল্‌টা মনে হয় আর একটু বাদেই লবির ধারের লাক্সারি রুমে হবে। তারপরেই বাকি কাজটা। চলুন আবার ভিড়ে মিশে যাই।"

নকল খেজুরগাছের গোড়ায় একটা টব। কৌশিক হাত আড়াল করে গ্লাসের অবশিষ্ট পানীয়টুকু টবের গোড়ায় ঢেলে দিল। কিন্তু এদিকে আসতে না আসতেই হার্ড ড্রিংক্‌সের ভর্তি ট্রে নিয়ে ওয়েটার এসে হাজির হল ওর পাশে। শূন্য গ্লাস রেখে স্কচের আর একটা গ্লাস তুলে ওয়েটারকে 'থ্যাংক্‌স' জানাল কৌশিক, আর মনে মনে বলল—আর একটু পরে এলেও তো পারতিস। স্ন্যাক্‌সওয়ালা এসে গিয়েছিল, মশলাদার দুটো প্রন তুলে নিয়ে মুখে ফেলল ও।

হবু বর দুই শেখ যোগ দিয়েছে পার্টিতে। ওদের দেখেই চঞ্চল হয়ে পড়েছিল অতিথিরা। দুই শেখের পরনে শাটিনের জোব্বা। জোব্বার হাতে, বুকে সোনার সুতোর চোখধাঁধানো কাজ। আঙুলে মস্ত বড় হিরের আংটি। দুই শেখের একজনকে সুদর্শনই বলা যায়, অন্যজনের চলনসই চেহারা। তবে চেহারা যেমনই হোক না কেন, উপস্থিত অতিথি-অভ্যাগতদের সবাই জানেন—এই দুই শেখের দুটি টাকার পাহাড় আছে। পাহাড়ের নীচে তেলের কুয়ো।

মান্যগণ্য অতিথিরা দুই শেখের কাছে ঝুঁকে পড়ে যে ভাবে কৃতার্থ হওয়ার হাসি হাসছিলেন তাতে বোঝা যায়, টাকার কুমির শেখ দুজনের কাছে এখানকার কেউই সে-অর্থে মানী নন। রকমভেদে ছোট কিংবা বড় পারিষদ।

কৌশিক জোর পায়ে হেঁটে গিয়ে মস্ত এক পাগড়িবাঁধা এক সর্দারজির পিঠে টোকা মারল। সর্দারটি ফিরতেই জড়ানো গলায় 'সরি' বলে সরে গিয়েছিল একধারে। ওদিক থেকে সাহেবি পোশাক-পরা একজন তীক্ষ্ণ চোখে সর্দারজিকে দেখে নিলেন।

হঠাৎই এক দক্ষিণী ভদ্রলোক এগিয়ে এসে দরাজ গলায় কৌশিককে বললেন, "ইউ আর মুভিং অ্যারাউন্ড উইত্‌ আ ফুল গ্লাস, ইট'স নট আ গুড সাইট টু সি।"

লাজুক হেসে আহ্‌মেদবেশী কৌশিক বলল, 'আই অ্যাম এ স্লো ডিংকার।'

তাই শুনে দক্ষিণী ভদ্রলোক প্রায় অট্টহাস্য করে উঠলেন। "দ্যাট্'স ভেরি ব্যাড। আই হ্যাভ আলরেডি টেকেন থ্রি। ড্রিংক ফাস্টার অর মাচ ফান ইজ লস্ট।"

এ দিকের ভিড়টা বেশ পাতলা হয়ে গিয়েছিল। দক্ষিণী ভদ্রলোক হঠাৎই গলা নামিয়ে বললেন, 'আই পাস্‌ড অন ইওর মেসেজ টু দ্য পার্লার গার্লস অন টাইম।' তারপরেই গলা তুলে 'ও, কে, ক্যারি অন' বলেই ও দিকের দঙ্গলের মধ্যে মিশে গেলেন।

মদের আসর জমে উঠলে সময় বোধহয় একটু বেশি তরতর করে গড়িয়ে যায়। পার্টির অনেকেই বুঝি টের পাননি দেড় দু-ঘণ্টা কী ভাবে কেটে গেছে। ও দিকের সারবাঁধা টেবিলজুড়ে লোভনীয় খাবারের মস্ত প্রদর্শনী। খাবারগুলোর চেহারা যা-- ওদিকে তাকালে ভরপেট-খাওয়া মানুষেরও বুঝি খিদে পেয়ে যাবে। আর, আইটেম তো অন্তহীন। যতজন নিমন্ত্রিত, পদের সংখ্যা বুঝি তার চাইতেও বেশি।

হবু বর শেখ দুজন মাঝেমধ্যে উধাও হয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু ফিরে আসছেন একটু বাদেই। ওঁদের চোখেমুখে উদ্বেগের মৃদু ছাপ। ওই উদ্বেগের কারণ ওই পার্টির অল্প দু-চারজন জানেন। দুই কনের একজন আগেই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, এখন বাকিজনও। এই অবস্থায় বিয়ের আসরে বসা যায় না। সইসাবুদ দরকার।

ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অবস্থা অনেকটা বোধহয় ছাড়া গরুর মতো। এমন পার্টিতে উনি এর আগে কখনও আসেননি। ঢকঢক করে কয়েকটা পাত্তর চড়িয়ে দিয়ে প্লেটভর্তি পছন্দসই খাবার নিয়ে বসেছেন। বাড়ি ফেরার তাড়া নেই। এই হোটেলের আরামপ্রদ একটি ঘরে ওঁর থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। শেখসাহেবরা দয়ালু, মহানুভব। ওঁর প্রাপ্য দক্ষিণার বিশ গুণ বেশি টাকা দিয়ে দিয়েছেন। একটিই কাজ—রাতের যে-কোনও সময় কনেরা একটু সুস্থ হলে বিয়েটা রেজিস্ট্রি করিয়ে দেওয়া। কাল সকালে শেখদের ফ্লাইট। দুই নববধূকে নিয়ে ওরা দুবাইয়ে উড়ে যাবেন। সব ঠিকঠাক, কিন্তু বিয়ে না হলে ফ্লাইট ক্যানসেল করতে হতে পারে।

অতিথিদের কয়েকজন মাতাল হয়ে পড়েছেন। ওঁরা আর খাবার টেবিলের দিকে না গিয়ে শেখদের 'গুড নাইট' জানিয়ে বিদায় নিলেন। পানাহারে যাঁরা শৃঙ্খলাপরায়ণ, তাঁরা পান সেরে আহারের দিকে গেছেন। কিছু মানুষ পানীয়ের চাইতে খাদ্যবস্তু ভালবাসেন, বুফে ডিনার টেবিলের আশেপাশে তাঁদের অনেকক্ষণ ধরেই দেখা যাচ্ছে।

মাঝরাত্তির নাগাদ ভিড় পাতলা হয়ে গিয়েছিল। ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের নেশা বেশ একটু চড়ে যাওয়ায় তাঁকে তাঁর ঘরে পৌঁছে দিয়েছে একজন ওয়েটার।

হবু বর দুই শেখের চোখেমুখে উদ্বেগের ছাপ আর একটু বোধহয় চেপে বসেছে। ব্যাঙ্কোয়েট হলে ওঁদের এখন আর বেশিক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। আসছেন মাঝেমধ্যে, কিন্তু একটু বাদেই উধাও হয়ে যাচ্ছেন।

রাত সওয়া বারোটা নাগাদ সাহেবি পোশাক-পরা ধারালো চেহারার প্রৌঢ় মানুষটি হাতে গ্লাস নিয়ে কৌশিকের কাছে এসে নিচু গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'শুড উই স্ট্রাইক নাউ?'

হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে কৌশিক জবাব দিল, 'ইয়েস।'

সঙ্গে সঙ্গে সাহেবি পোশাকের সঙ্গে চোখে চোখে কথা হয়ে গেল দক্ষিণী ভদ্রলোক, কপালে ফোঁটা-কাটা শেঠ আর এক সাফারি স্যুটের।

এই অপারেশনটার কোনও নাম নেই, কিন্তু নিখুঁত অপারেশন। হোটেল ম্যানেজারের লোক এসে মাস্টার-কি দিয়ে একটা লাক্সারি রুমের দরজা খুলে দিল আস্তে আস্তে। তারপরেই হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে পড়ল পাঁচজন। পাঁচজনের হাতেই পিস্তল। দুজন শেখের একজন এইমাত্র একটা অ্যাটাচি কেস তুলে দিয়েছে একটু আগে পার্টিতে ঘোরা ওই সর্দারের হাতে।

সাহেবি-পোশাক পিস্তল নাচিয়ে সর্দারের হাত থেকে ওটা ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে কৌশিকেব দিকে ছুড়ে দিয়ে বললেন, "সি হোয়াট'স উইদিন।"

কৌশিক দ্রুত হাতে অ্যাটাচি খুলে বলল, "ইট'স ফুল অফ ইউ এস ডলার্স।"

সাহেবি-পোশাকের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠেছিল। 'আই সাপোজ দিস ইজ দি ডিল মানি।' দুই শেখ আর তার তিন ভারতীয় শাগরেদ বোধহয় ঘটনার আকস্মিকতায় হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল একেবারে। ওদের দিকে পিস্তল দোলাতে দোলাতে সাহেবি-পোশাক বললেন, 'নাও লিসেন, ইউ অল লিসেন ভেরি কেয়ারফুলি—দ্য এনটায়ার হোটেল ইজ সারাউন্ডেড বাই পোলিসমেন। নান ক্যান এসকেপ। সো ডোন্ট ট্রাই টু প্লে এনি ট্রিক্স। সুব্রহ্মনিয়ম, সার্চ দেম।'

শেখ দুজনের কাছ থেকে দুই ভারতীয় সুন্দরীর দুটি পাশপোর্ট, দুবাইয়ের এয়ার টিকিট আর কিছু আপত্তিকর কাগজপত্র পাওয়া গেল। ওদের তিন শাগরেদের কাছ থেকে পাওয়া গেল দুটো পিস্তল আর একটা ছুরি।

সাফারি স্যুট-পরা শক্তসমর্থ সঙ্গীব দিকে তাকিযে সাহেবি পোশাক বললেন, 'রেড্ডি, গো আন্ড আস্ক দ্য মেডিক্যাল ইউনিট টু টেক কেয়ার অব দ্য গার্লস লক্‌ড ইন দ্য ক্লাব রুম। টেক রিটা উইথ ইউ। কুইক।'

'রাইট স্যার।' রেড্ডি ছুটে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

সর্দারের পাগড়ি, দাড়ি দুই নকল। ওগুলো টান মেরে সরিয়ে দিতেই কুখ্যাত এক মাফিয়া ডনকে দেখা গেল। সাহেবি-পোশাক চমকে উঠে বললেন, 'শর্মা তুম্!'

শর্মাও কম অবাক হয়নি। যে লোকটি ওকে এ ভাবে চেনে, তাকে ও কখনও দেখেইনি!

শর্মাকে অবাক হতে দেখে সাহেবি-পোশাক একটু মজা পেয়েছিলেন। উনি একটানে নিজের নকল দাড়ি ওপড়ালেন, তবু শর্মা ওঁর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল। এবার উনি আর এক টানে মাথার পরচুলাটা খসিয়ে দিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে কুখ্যাত অপরাধীর চোখমুখ অবিকল বাচ্চাদের মতো খুশি-খুশি হয়ে উঠেছিল। 'আরে! ডি সি ডি ডি সাহাব আপ! আপ খুদই মুঝে স্বোয়াগত করনে কি লিয়ে হাজির হো গয়ে।'

রিটা ছুটে এসে খবর দিয়ে গেল—'দি গার্লস আর অলরাইট স্যার।'

বিনা রক্তপাতে দু-চার মিনিটের মধ্যে মস্ত এক অপারেশন সম্পন্ন হল। ধরা পড়ল আন্তর্জাতিক চোরাচালান চক্রের দুই খুঁটি—দুই আরব। দুজন স্যাঙাতসমেত এ দেশের কুখ্যাত এক মাফিয়া ডন। পাচার করার মুখে উদ্ধার করা হল সম্ভ্রান্ত ঘরের দুই সুন্দরীকে। আটকে গেল লক্ষ-লক্ষ টাকার বেআইনি লেনদেন।

পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের প্রধানের নির্দেশে সিল্ হল ডলার-ঠাসা অ্যাটাচি কেস। হাতকড়া পড়ল দেশি-বিদেশি পাঁচ অপরাধীর হাতে। রেড্ডি আর সুব্রহ্মনিয়ম—এই দুই অফিসার লোকগুলোকে ভ্যানে চাপিয়ে নিয়ে গেলেন হেডকোয়ার্টার্সের লক-আপে।

মেডিক্যাল চেক-আপের জন্যে পুলিশ-পাহারায় মেয়ে দুটিকে পাঠানো হল সরকারি হাসপাতালে।

হোটেলের ম্যানেজার এসে বিনীতভাবে জিজ্ঞেস করলেন পুলিশ সাহেবকে—'স্যার, ক্যান আই সার্ভ ইউ সাম কফি?'

সাহেব গলা বেশ একটু তুলে বললেন, 'ই-য়ে স, ইউ ক্যান। উই ব্যাডলি নিড সাম গুড কফি।'

হাই শুধু আলস্য নয়, মাঝেমধ্যে বুঝি মস্ত সাফল্য থেকেও উঠে আসে। মাথার দু পাশ দিয়ে দু হাত শূন্যে তুলে ওইরকম একটা হাই তুললেন বাঙ্গালোরের গোয়েন্দা প্রধান মিলন চৌধুরী। তারপর বললেন, 'শোনো ইয়ং ডিটেকটিভ কৌশিক, আই পি এস-এ আমার থার্ড চয়েস ছিল কর্নাটক। তা, ট্রেনিংয়ের পরে কর্নাটকেই পাঠানো হল আমাকে। সেই থেকে সাতাশ বছর এই রাজ্যে কেটে গেছে। কিন্তু আই মাস্ট অ্যাডমিট, আমি এত স্মুদলি এত বড় অপারেশন এর আগে আর একটাও করিনি। অল ক্রেডিট গোজ টু ইউ।'

লজ্জায় চোখমুখ লাল হয়ে উঠেছিল কৌশিকের। 'ছি-ছি, এ কী বলছেন! সব কৃতিত্ব আপনার আর গাঙ্গুলির। আমি উটকো প্রবাসী, আপনারা না থাকলে জাল ফেলে এদের এ ভাবে ছেঁকে তোলা যেত না।'

'আমার জায়গায় অন্য পুলিশ অফিসার থাকলে সেও তোমাকে এই ভাবেই হেল্প করত। আচ্ছা, এবার বলো, বিয়ের নামে মেয়ে পাচারের এই চক্রটার কথা তুমি জানতে পারলে কী ভাবে?'

কৌশিককে বেশ বিব্রত দেখাচ্ছিল। একটু ইতস্তত করে বলল, 'সব কিছুই তো আপনাকে বলেছি মিলনদা।'

'হ্যাঁ বলেছ, কিন্তু এখন স্বীকার করতে দোষ নেই—তোমার ওই গল্পে আমি তখন খুব-একটা কান দিইনি। কিন্তু যেহেতু তুমি অত্যন্ত গুণী গোয়েন্দা, আমার পুলিশি ব্যবস্থায় কোনও ফাঁকও রাখিনি। যেমন বলেছ তেমনি করেছি। আর একবার শোনাও না তোমার পার্টটা। ঠিক আছে, একটু ছোট করেই বলো না হয়—।'

কফি এসে গিয়েছিল। কফির কাপে ছোট্ট একটা চুমুক দিয়ে কৌশিক বলল, 'ওই তো—অপূর্বর বাড়িতে মাঝরাত্তিরে হানা দিলাম। কোণের দিকের ঘরটায় শুয়েছিল শুভলক্ষ্মী আর ঝিমলি। খুব নিচু গলায় ইংরেজিতে কথা বলছিল ওরা। ঝিমলির গলাটা চিনতে পারলাম কিছুক্ষণ পরেই। হাওড়া স্টেশনে বেশ কয়েকবার শুনেছি। কিছুক্ষণ কথা শোনার পরে বুঝতে পারলাম, ওদের জন্যে মস্ত একটা ফাঁদ পাতা হয়েছে।'

'ফাঁদ! কী রকম?'

'লোকাল এজেন্টের অ্যাসিস্ট্যান্ট সাবিত্রী ওদের বুঝিয়েছে—ওদের মতো দুই সুন্দরীকে ঘটনাচক্রে দেখে ফেলার ফলে এক ফিল্ম প্রোডিউসার বায়না ধরেছে—তার একটা বিগ-বাজেট ফিল্মে ওদের ধরে রাখবে। দুই আরবের খোঁজ পাওয়া গেছে। এখানকার একটা হোটেলে উঠেছে। পরশু সকালের ফ্লাইটে তারা দুবাইয়ে ফিরে যাবে। ফিল্মের সিকোয়েন্সও মিলে গেছে জব্বরভাবে। দুই আরবের সঙ্গে দুই ভারতীয় সুন্দরীর বিয়ে। সাবিত্রী এই বলে ওদের বুঝিয়েছিল—সিনেমার কিছু-কিছু ধনী প্রযোজক অসম্ভব

কুসংস্কারগ্রস্ত হয়। ওর ধারণা হয়েছে, এই শটটা ধরতে পারলে ওর ছবি সুপারহিট হবে। এই কাজের জন্যে প্রযোজক ওদের এত টাকা দেবে যে, কিডন্যাপাররা দুটি মেয়ের মুক্তিপণ বাবদ যে টাকা দাবি করবে বলে ভেবেছিল—তার দশ গুণ আপসে এসে যাবে। সুতরাং সসম্মানে ওদের দুজনকে বাড়িতে ফেরত পাঠানো হবে শুটিং হয়ে যাওয়ার পরেই।'

'বাহ্! বেশ ভাল গল্প। তা তুমি ওটা অবিশ্বাস করলে কেন?'

"মাঝরাত্তিরে ওই ঘরের পাশের ছ'টি ঘরে পেনসিল টর্চ মেরেছিলাম। দেখলাম—অল্পবয়সী বেশ কয়েকটি মেয়ে ঘুমোচ্ছে। বুঝলাম, এদের সবাইকে ধরে আনা হয়েছে। আমি নির্ঘাত এমন একটা দলের ডেরায় হাজির হয়েছি—যে দলের প্রধান কাজ হল মেয়ে পাচার করা।"

'ওই বাড়িটা তো অপূর্ব চক্কোত্তির। ওই তা হলে গার্ল রানিংয়ের ব্যবসা চালায়।'

'সোজা হিসেব তো সেই কথাই বলে, কিন্তু—।'

'কিন্তু কী?'

'অপূর্ব এখন পুরোমাত্রায় ড্রাগ অ্যাডিক্ট। ওর পক্ষে কি মাথা ঠাণ্ডা রেখে এই ব্যবসা চালানো সম্ভব?'

'কী সম্ভব আর কী অসম্ভব—আগে থেকে কিছু বলা যায় না। ঠিক আছে, এবার বলো—এই হোটেলের ঠিকানা আর শেখদের বিয়ের খবর তমি কী ভাবে জোগাড় করলে?'

কফিটা সত্যিই খুব ভাল। ডিসিডিডি আর গাঙ্গুলি প্রথম কাপ শেষ করে দ্বিতীয় কাপ ঢেলে নিয়েছে। কৌশিকের প্রথম কাপই চলছে। কাপে পর-পর দুটো বড় চুমুক মেরে ও বলল, 'দুই আরব এখান থেকেই দুবাই যাবে জেনে কাজটা সহজ হয়ে গিয়েছিল কিছুটা। ধরে নিয়েছিলাম, বিয়েটা সেরে নিতে পারলে শেখ দুজনের সঙ্গে ওদের দুই ভারতীয় বউও যাবে। একজন শুভলক্ষ্মী, অন্যজন ঝিমলি। তবে বেগমসাহেবাদের নাম পাল্টে মুসলমানি নামও হয়ে যেতে পারে।'

ডিসি হেসে বললেন, 'নাম তো অলরেডি পাল্টে গেছে। পাশপোর্টে ওদের নামের নীচে পেল্লায় দুটো আরবি নাম। পাশপোর্ট দুটো যে জাল, সে বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নেই। বেশ, তারপর?'

'কালকের দুবাই ফ্লাইট। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কয়েকজন ট্রাভেল এজেন্টকে নক্ করতেই শেখদের এই হোটেলের ঠিকানা পেয়ে গেলাম।'

ডিসি থেমে বললেন, "এই পর্যন্ত ঠিক আছে, কিন্তু বাকিটুকু? শেখ দুজন সত্যি-সত্যি বিয়ে করছে কি না, করলে কখন, পার্টি বসবে কোন্ ব্যাঙ্কোয়েট হলে, ক'টায়, নিমন্ত্রিত ক'জন—এই তথ্যগুলো তুমি বার করলে কী ভাবে? এই সব হোটেলে তো প্রতিটি ব্যাপারেই দারুণ গোপনীয়তা মেনে চলা হয়।"

মৃদু হেসে কৌশিক বলল, 'আমি আজ সকালে এসে হোটেলের রিসেপশনে পুরোপুরি সারেন্ডার করলাম।'

'সারেন্ডার! মানে?'

'রিসেপশনে তখন এক মহিলা আর দুই ভদ্রলোক ছিলেন। কাঁদো-কাঁদো মুখ করে বললাম—আমি দু-বছর হল বিয়ে করেছি, এখন বউ-বাচ্চা নিয়ে আমাকে না খেয়ে মরতে হবে।'

'হ্যাঁ! কেন?'

'রিসেপশনের তিনজনে অবাক হয়ে এই এক প্রশ্নই করেছিল। বললাম, আমি ছাবারিয়ার সেক্রেটারি। কাল বিকেলে এখান থেকে এক শেখ ফোন করে ওঁকে চেয়েছিলেন, উনি তখন অফিসে ছিলেন না৷ আমি আমার পরিচয় দিয়ে বললাম, আপনার কোনও মেসেজ থাকলে আমাকে দিতে পারেন, মিস্টার ছাবারিয়া এলেই খবরটা দিয়ে দেব। শেখসাহেব তখন ওঁর বিয়ের খবর জানিয়ে ম্যারেজ পার্টি অ্যাটেন্ড করার জন্যে আমার বস্‌কে নেমন্তন্ন করলেন। সব পার্টিকুলার্স দিয়েছিলেন, আমি কেয়ারফুলি নোট করেছিলাম, তারপর আরও কেয়ারফুলি নোটবইটা কোথায় যে রাখলাম—এখন আর কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছি না। ছাবারিয়া কাল আর অফিসে ফেরেননি, কিন্তু আজ আসবেন। ইন ফ্যাক্ট, আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই এসে পড়বেন—অথচ আজকের পার্টির ব্যাপারে কোনও কারেক্ট ইনফর্মেশন ওঁকে আমি দিতে পারব না। বিষয়টা অত্যন্ত ডেলিকেট, শেখসাহেবকে তো আর ফোন করে বলা যায় না—আপনার মেসেজটা হারিয়েছি, আপনি কাইন্ডলি আর একবার রিপিট করবেন কি? তার মানে এই ব্যাপারে ছাবারিয়াকে আমি কিছুই জানাতে পারছি না। কিন্তু এত বড় খবরটা তো আর গোপন থাকবে না। বস্ আজ হোক কাল হোক জানতে পারবেন ঠিক। আর জানা মানে দায়িত্বজ্ঞানহীন এই সেক্রেটারিটির চাকরি যাওয়া। আপনারা বিশ্বাস করুন—আমি ঠিক দু-বছর হল বিয়ে করেছি, আমার মেয়ের বয়েস তিন মাস। ব্যাস্, আর কিছু বলতে হয়নি আমাকে। রিসেপশনের তিনজন পালা করে সব তথ্য জানিয়ে দিলেন আমাকে। কোথায় কখন বিয়ে, কতজন নিমন্ত্রিত, মেনু কী কী, এমনকী বাথটাব শ্যাম্পেনে ভর্তি করে নববধূকে স্নান করানোর উড়ো খবর পর্যন্ত জেনে গেলাম। আমি ওদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে আপনার কাছে ছুটেছিলাম।"

ডিসি হেসে বললেন, 'ফাইন। তবে তোমার মনে হয় একটু বাড়তি ঝুঁকি নেওয়া হয়ে গিয়েছে।'

'কেন, বাড়তি ঝুঁকি কোথায়?'

আমরা পাঁচ-পাঁচটা উটকো লোক পার্টির মধ্যে ভিড়ে গেলাম—এটা বাড়তি ঝুঁকি নয়?'

'এক্ষেত্রে নয়, একেবারেই নয়। আমি রিসেপশন থেকে খবর পেয়ে গিয়েছি আসল নিমন্ত্রিতের সংখ্যা মাত্র বিশ। কিন্তু পার্টির আয়োজন করা হয়েছে একশোজনের জন্যে। তার মানে প্রত্যেকেই ইচ্ছেমতো ইয়ারদোস্ত নিয়ে আসবে। একেই বলে বোধহয় আমিরি চাল। পারিষদ ছাড়া আমির-ওমরাহরা চলতে-ফিরতে পারে না। টাকার কুমিরদের পারিষদরা তো আর হেলাফেলার বস্তু নয়। তাদের পোশাক-আশাক, চাল-চলনও তো আমিরঘেঁষা হবে। আমরা জনাপাঁচেক স্বচ্ছন্দে ওই খাতে পড়ে যাব। ইন ফ্যাক্ট, নিজেদের লুকিয়ে রেখে নজরদারি করার ওটাই ছিল সেরা জায়গা।'

আর এক পট কফি এসে গিয়েছিল, সঙ্গে হালকা স্ন্যাক্স। নতুন ট্রে নামিয়ে পুরনো ট্রে তুলে নিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে গিয়ে আরও নিঃশব্দে ঘরের দরজা টেনে দিয়েছিল ওয়েটার।

পট থেকে কিছুটা কফি কাপে ঢেলে নিয়ে ডিসি বললেন, 'হ্যাঁ, এ ভাবে দেখলে অবশ্য বলা যায় তুমি ঠিক কাজই করেছ। এক বড়লোক আর এক বড়লোকের সাইকোফ্যান্টদের

মানুষ বলেই ধরে না। সুতরাং ওদের মধ্যে ভিড়ে গেলে দিব্যি গা ঢাকা দিয়ে থাকা যায়। তবে ইউ হ্যাড এ বিট অব লাক অলসো। ট্রেন থেকে মেয়েদুটি কিছুটা অসুস্থ না হয়ে পড়লে বিয়ের আসর আগেই বসত। বিয়েটা তো আমরা আর হতে দিতাম না, তার ফলে তাড়াহুড়ো করে অপারেশন শুরু করতে হত। সেই সুযোগে দু-একটা অপরাধী পালাতে পারত। চেজ করতে গিয়ে গুলি চলতে পারত। বামাল ধরতে পারতাম কি না কে জানে!'

কৌশিক কফির কাপে আর একটা চুমুক দিয়ে বলল, 'ঠিক , একশো ভাগ ঠিক। এটা আন্দাজ করেই আমি বিউটি পার্লারের মেয়েগুলোর সাহায্য নিয়েছিলাম।'

কৌশিকের মিলনদা অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'পার্লারের মেয়েদের সাহায্য! মানে?'

'এ-ব্যাপারে আপনার অফিসার সুব্রহ্মনিয়ম হেল্প করেছেন আমাকে। ওঁকে দিয়ে আজ বিকেলে পার্লারের মেয়েদের কাছে খবর পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। পুলিশ অফিসারের পাঠানো গোপন খবর। সুতরাং খবরটা ওরা সঙ্গে সঙ্গে পাস করে দিয়েছিল।'

'কাকে? কী খবর?'

'সাজাবার মেয়েরা কনেদের কানে কানে বলে দিয়েছিল—বিয়ের আসরে যাওয়ার আগেই তোমরা অসুস্থ হয়ে পড়ার ভান করবে। একজন আগে, একজন পরে। রাত সাড়ে-বারোটার আগে কোনও মতেই সুস্থ হবে না।'

এবার ডিসির চাইতে ঢের বেশি চমকাল গাঙ্গুলি। চোখ বড়-বড় করে বলল, 'আমি পার্টিতে এক ফাঁকে তোমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলেছিলাম—রিটা খবর এনেছে, কনে অসুস্থ হয়ে পড়েছে—শুনে তুমি তো কিছু বললে না।'

মৃদু হেসে জবাব দিল কৌশিক, 'তখন আসল ব্যাপারটা ভেঙে বলতে গেলে তো অনেক কথা বলতে হত। আড়ালে আমাদের বেশিক্ষণ গুজগুজ ফুসফুস করতে দেখলে কেউ হয়তো সন্দেহ করে বসত। তাই ও নিয়ে আর কথা বাড়াইনি। তবে তোমার কাছ থেকে ওই খবরটা পেয়ে আমি কিছুটা নিশ্চিন্ত বোধ করেছিলাম।'

'মাফিয়া ডন শর্মা আর ওর দুই স্যাঙাত এর মধ্যে আছে—এটা কী করে জানলে আগে থেকে?'

ডিসির প্রশ্নের উত্তরে কৌশিক বলল, 'আমার একজন সহকারী আছেন—মুখার্জিবাবু। কলকাতার অফিসে বসেন। কিছুদিন আগে ওকে এখানে পাঠিয়েছিলাম। অপূর্বর বাড়ির ওপর নজর রেখেছিলেন তখন। ফিরে গিয়ে তিনটে সন্দেহজনক গাড়ির নম্বর দিয়েছিলেন আমাকে। গাড়ি-তিনটের মালিকানা কাদের খোঁজ নিতে বলেছিলাম গাঙ্গুলিকে। গাঙ্গুলিই ট্রেস করেছে ওদের। তখন বুঝে গিয়েছিলাম—এরাই মেয়েদুটিকে বেচে দিচ্ছে শেখদের কাছে।'

গাঙ্গুলি একটু ইতস্তত করে কৌশিককে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, শেখ দুজন বিশাল টাকা খরচ করে মেয়েদুটিকে দুবাইয়ে নিয়ে গিয়ে কী করত? নিশ্চয়ই সংসার করত না—।'

'না।'

'এরা এজেন্ট। যে টাকা খরচা করেছে তার একশো গুণ বেশি টাকায় বিক্রি করত ওদের।'

'একশো গুণ! অ্যাটাচিভর্তি ডলার। ওই টাকার একশো গুণ বেশি টাকা মানে তো অসম্ভব ব্যাপার। অত টাকা দিয়ে কে কিনত?'

'ক্রেতা হয়তো পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি—ব্রুনেইর সুলতান। এই মাফিয়া ডন শর্মার সঙ্গে ব্রুনেইর কিছু এজেন্টের যোগাযোগের কথা কানে এসেছে আমার।'

ডেপুটি কমিশনার টানটান হয়ে বসে বললেন, 'হতে পারে। শেখদের কাছ থেকে সিজ করা ওই কাগজগুলোর মধ্যে ব্রুনেইর নাম দেখলাম বলে মনে হচ্ছে। পরে খুঁটিয়ে দেখতে হবে।'

গাঙ্গুলি একটু থতমত খাওয়ার ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, ব্রুনেই ঠিক কোথায়?'

'দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়।'

'শেখরা তাহলে দুবাই যাচ্ছিল কেন? তাও আবার মুম্বই হয়ে!'

'সেটাই তো ওরা করবে। নতুন বউকে নিয়ে নিজের জায়গায় ফিরছে। এখান থেকে সরাসরি ব্রুনেই গেলে পুলিশ তো সন্দেহ করতে পারত। অযথা ঝুঁকি নেবে কেন ওরা?'

একটু ইতস্তত করে গাঙ্গুলি বলল, 'ধরা যাক তোমার অনুমানই ঠিক। সুলতানই না হয় মেয়েদুটিকে কিনল; কিন্তু সুলতান কি প্রায়ই এইরকম মেয়ে কেনাবেচা করে?'

'কেনাটা আছে, বেচাটা নেই। তুমি বোধহয় ব্রুনেইর হালের খবরাখবর খুব একটা রাখোনি। পরে কোনও এক সময় মিলনদার কাছ থেকে শুনে নিও।'

ডিসির কপালে দু-একটা ছোটখাটো ভাঁজ পড়েছিল। 'না-না, তুমি এখনই বলো কৌশিক। আই অ্যাম সার্টেন, আই উইল গেট সাম নিউ পয়েন্টস। পরে ব্রুনেইর রেফারেন্স, ক্লিপিংস একটু ঘাঁটাঘাঁটি করতে হবে বলে মনে হচ্ছে। বলো—।'

পট থেকে কাপ প্রায় ভর্তি করে কফি ঢেলে নিল কৌশিক, তারপর একটা চুমুক মেরে গাঙ্গুলির দিকে তাকিয়ে বলল, 'মিলনদার কাছে এসব বলার কোনও মানে হয় না। ধরে নাও আমি সব কথা তোমাকেই বলছি। ব্রুনেইর সুলতান পৃথিবীর সব চাইতে ধনী মানুষ। ধনী তেলের টাকায়। ছোট্ট দেশ ব্রুনেই। জনসংখ্যা আড়াই লাখের মতো। তা, এই সুলতানের প্রাসাদটি স্বপ্নের প্রাসাদকেও হার মানায়। প্রাসাদে ঘর আছে প্রায় আঠারোশোর মতো। প্রতিটি ঘরই হিরে-জহরত-সোনায় মোড়া। প্রাসাদের স্থাপত্য তো তুলনাহীন। পৃথিবীর সেরা-সেরা আর্কিটেক্টকে দিয়ে বানানো। সামনে বিশাল লন। এই যে আঠারোশো ঘর, এর অনেকগুলিই ব্যবহার করা হয় হারেম হিসেবে। হারেমের কথা হালের দুটো বড় এক্সপোজারে গোটা পৃথিবীর লোক জেনে গেছে। তিন নম্বর এক্সপোজারটা আজ থেকে মাত্র মাস-দুই আগের। এই কেচ্ছাটা সুলতানের নয়, ওর ছোট ভাই প্রিন্স জেফ্‌রির। লন্ডন টাইম্‌স্-এ খুব বড় করে বেরিয়েছিল। লন্ডনেরই ঘটনা।'

'কীরকম?'

'প্রিন্স জেফ্‌রি লন্ডনে মস্ত একটা বাড়ি কিনেছে বিশাল টাকা খরচা করে। বাড়ির যে দাম হওয়া উচিত, বাড়িওয়ালা তার কয়েক গুণ বেশি টাকায় বাড়িটা বেচেছে জেফ্‌রিকে। যদ্দুর মনে পড়ছে, জেফ্‌রি বাড়ি কিনেছে একুশ মিলিয়ন পাউন্ডে। বিরাট টাকা। এত টাকা দিয়ে অত বড় বাড়ি কেন কেনা হয়েছে জানো? ওখানে নাকি প্রস্টিটিউটদের লুকিয়ে রাখা হত। পৃথিবীর নানা জায়গা থেকে সুন্দরীদের জোগাড় করা হত প্রথমে। তারপর

একসঙ্গে জনাপঞ্চাশ মেয়েকে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হত ব্রুনেইতে। বিমানবন্দর থেকে প্রাসাদে। তারপর ইয়ারদোস্ত নিয়ে প্রিন্স রাত্তিবেলায় সেক্সপার্টি বসাত। ইরোটিক টেস্টের জন্যে প্রিন্স কুখ্যাত। কোটি কোটি টাকা খরচা করে গোটা পৃথিবী থেকে ওই ধরনের বিস্তর আর্ট অবজেক্ট কেনে। পৃথিবীর সব চাইতে ধনী মানুষের ছোট ভাইয়ের দাপটও দাদার মতো। টাকা থাকলে সব হয়। প্রভাবের অন্ত নেই এই প্লেবয়টির। প্রিন্স অব ওয়েলস্-এর সঙ্গে ইনি নিয়মিত পোলো খেলেন।'

'কিন্তু এত সব খবর জানাজানি হল কীভাবে?'

'বন্ধু শত্রু হলে যা হয়। প্রিন্স জেফ্রির দুই পুরনো বন্ধু-কাম-ব্যবসায়ী আশি মিলিয়ন পাউন্ডের ক্ষতিপূরণ দাবি করে প্রিন্সের নামে মামলা ঠুকে দিয়েছে লন্ডন হাইকোর্টে। মামলার শুনানিতে ভেতরের এইসব খবর বেরিয়ে এসেছে।'

'সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার! তা, এই প্রিন্স জেফ্রির বয়েস কত? বিয়েটিয়ে করেনি?'

'বয়েস চুয়াল্লিশ। দেশের প্রাসাদে চারটি বৈধ বউ আছে প্রিন্সের।'

গল্প শুনতে গিয়ে কফি ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল। কাপটা মুখে তুলেই সরিয়ে রাখল গাঙ্গুলি। 'প্রিন্সের দাদা, মানে সুলতানও কি এইরকম?'

'হ্যাঁ, সুলতানেরও গুণের ঘাটতি নেই। ওই যে বলছিলাম না—দুটো রিসেন্ট এক্সপোজারে সুলতানের হারেমের কথা পৃথিবীর লোক জেনে ফেলেছে। একজন প্রাক্তন মিস ইউ এস এ দশ মিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ চেয়ে সুলতানের বিরুদ্ধে মামলা আনতেই হইচই পড়ে গিয়েছিল চারধারে। কী ব্যাপার? সুলতান নাকি চুক্তি ভঙ্গ করে এক মাস ওই সুন্দরীকে হারেমে বন্দি করে রেখেছিল। শুধু তাই নয়, সুন্দরীকে নাকি বলাৎকারও করেছে। হলিউডের এক নামকরা অভিনেত্রী শিলা কেনেডি কয়েকটি সাক্ষাৎকার দিয়েছে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়। হারেমের রোমহর্ষক নানা খবর আছে ওই সব সাক্ষাৎকারে। শিলা অবশ্য সুলতানের নামে কোনও অভিযোগ আনেনি, বরং প্রশংসায় পঞ্চমুখ। শিলা নাকি এক মাস তোফা আরামে কাটিয়েছে সুলতানের হারেমে। ওই একটি মাস হারেমবাসের জন্যে দক্ষিণাবাবদ গয়নাগাটি ও নগদ মিলিয়ে পেয়েছে দেড় কোটি টাকা। ফিলিপাইনসের এক সুন্দরী চোদ্দো মাস কাটিয়েছে সুলতানের হারেমে। সে পেয়েছে দশ মিলিয়ন ডলার। তার মানে ভারতীয় টাকায়—।'

গাঙ্গুলি হাত তুলে কৌশিককে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'থাক-থাক, ওই হিসেবের মধ্যে আর যেও না। দু-একটা পাওনা মেটানোর বহর দেখেই বোঝা যাচ্ছে—সুলতান পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী মানুষ।'

মুচকি হেসে কৌশিক বলল, 'সুলতানের রোজগারের একটা রিপোর্ট বেরিয়েছিল কাগজে। সেটা তোমাকে বলছি। সুলতানের মাসিক আয় হল চল্লিশ বিলিয়ন ডলার। অকল্পনীয় আয়! ওই টাকার সামান্য একটা অংশ, আলাদাভাবে এটাও অকল্পনীয়, দশ মিলিয়ন ডলার—সুলতান প্রতি মাসে খরচ করে হারেমের পেছনে। সুতরাং অল্প কিছুদিন হারেমবাস করার জন্যে একটি সুন্দরীর হাতে দু-পাঁচ কোটি টাকা তুলে দেওয়া সুলতানের কাছে কোনও ব্যাপার নয়। সুন্দরী কিন্তু এক-আধটি নয়—শয়ে শয়ে। সবাই হারেমে থাকে। দু-তিন বছর আগে ব্রুনেই রয়াল এয়ারলাইন্সের একটা বিমান নেমেছিল কলকাতায়। সেটা

দেখার জন্যে শুনেছি হুড়োহুড়ি পড়ে গিয়েছিল বিমানবন্দরে। বিমানের ভেতরের অনেক ফিটিংস নাকি সোনা দিয়ে মোড়া ছিল।'

'এ তো দেখছি অনেকটা আরব্য রজনীর গল্পের মতো।'

'অনেকটাই তাই। সুলতানের হারেমের জন্যে সুন্দরী। সংগ্রহের ব্যাপারে গোটা পৃথিবীতেই নাকি অনেকগুলো ফাঁদ পাতা আছে। বিদেশের নানা জায়গায়, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে, যে মিউজিক্যাল বা ফ্যাশান শোগুলো হয় তার অনেকগুলোই আসলে সুন্দরী ধরার ফাঁদ। এই ফাঁদের কথা এখন জানাজানি হয়ে গেছে। হারেম তো একটা নয়, এই ধরনের অনেক হারেম আছে। একটা জবরদস্ত নেটওয়ার্ক মেয়ে ধরার জন্যে কাজ করে যাচ্ছে নানা জায়গায়। নেটওয়ার্কে বেশ কিছু মহিলাও এজেন্ট হিসেবে কাজ করে। হলিউডের ওই অভিনেত্রী তার সাক্ষাৎকারে জানিয়েছে—জানিয়েছে—মাঝবয়সী এক মহিলা ওর সঙ্গে দেখা করে মোটা টাকার বিনিময়ে সুলতানের হারেমে থাকার প্রস্তাব দেয়। অভিনেত্রী রাজি হতেই এজেন্ট এক লাখ টাকা অ্যাডভান্স হিসেবে হাতে তুলে দিয়ে চুক্তি সই করিয়ে নিয়েছিল। এজেন্ট সুন্দরী যোগান দেওয়ার জন্যে মোটা টাকা কমিশন পেয়ে থাকে।'

'এটা বরং মন্দের ভাল।'

'ঠিক। কিন্তু বেশির ভাগ মেয়েই তো টাকার লোভে নিজেকে বেচবে না। তখনই শুরু হয় নানা ধরনের প্রতারণা, অপহরণ, আন্ডারগ্রাউন্ড কেনাবেচা।'

'আচ্ছা, সুলতানের হারেমে ওই যে অত মেয়ে—ওদের ওখানকার লাইফস্টাইল নিয়ে রিপোর্টটিপোর্ট বার হয়নি?'

'বেরিয়েছে। যে সব মেয়ে হারেমবাস করে এসেছে তাদের কেউ-কেউ জানিয়েছে। এগুলোই তো একেবারে হালের খবর। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সংগ্রহ-করা সুন্দরীদের ঝাঁক নিয়ে বিমান নামল ব্রুনেই বিমানবন্দরে। তারপব ওখান থেকে দামি গাড়িতে চাপিয়ে ওদের নিয়ে যাওয়া হল প্রাসাদে।'

'প্রাসাদের হারেমে?'

'না-না, প্রথমেই ওদের দাঁড়াতে হবে সুলতানের মেডিক্যাল বোর্ডের সামনে। মেডিক্যাল টেস্ট হবে। পরীক্ষা করে দেখা হবে, কারও এড্‌স বা অন্য কোনও খারাপ অসুখ আছে কি না—। কেউ অসুস্থ থাকলে ফেরত পাঠানো হবে তাকে। সুস্থ মেয়েদের তোলা হবে হারেমে। প্রতি দুজনের জন্যে একটি করে ঘর। হাতের কাছে সব রকমের সুযোগসুবিধে। সন্ধে আটটায় সেজেগুজে ডিস্‌কোতে যেতে হবে সবাইকে। সেখানে শুধু নাচ আর গান। সুলতান কিংবা তার ভাইরা ইয়ারদোস্ত নিয়ে হাজির হবে। ওখানে অবশ্য কেউ মেয়েদের বিরক্ত করবে না। ডিস্‌কো চলবে রাত দুটো পর্যন্ত। তারপব যে যার ঘরে ফিরে যাবে। একটু বাদে কোনও-কোনও মেয়ের ঘরে টেলিফোন বাজবে। টেলিফোনে ডাক। হয় সুলতান, নয় তার ভাই, কিংবা ইয়ারদোস্তদের শয্যাসঙ্গিনী হওয়ার ডাক। কোনও অবস্থাতেই ওই সব ডাক অগ্রাহ্য করা চলবে না। সুলতানের এক ভাই জারিফের নাকি প্রতি রাতে একটি করে নতুন মেয়ের প্রয়োজন। একবার একটি মেয়ে জারিফের ঘর থেকে ফিরে এসে কাঁদতে কাঁদতে হলিউডের ওই অভিনেত্রী শিলাকে জানিয়েছিল, প্রিন্স ওর সঙ্গে বর্বরের মতো ব্যবহার করেছে। হি টর্চার্ড দ্য গার্ল হোয়াইল হ্যাভিং সেক্স উইথ হার।'

গাঙ্গুলির চোখমুখ কঠিন হয়ে উঠেছিল। 'কী জঘন্য কাণ্ড!' গোয়েন্দাপ্রধান মিলন চৌধুরীর কপালে মাঝেমধ্যেই ভাঁজ ফুটে উঠছিল। কৌশিকের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় উনি বললেন, 'তোমার অনুমান পুরোটা মিলে গেলেও আমি অবাক হতাম না। আমি রিটার কাছ থেকে শুনেছি ঝিমলি আর শুভলক্ষ্মী দুজনেই পরমাসুন্দরী। দে আর রিয়েল বিউটিজ। তোমার জন্যে ওরা বেঁচে গেল।'

'না-না, এ কী বলছেন আপনি!'

মৃদু একটা ধমক লাগালেন ডেপুটি কমিশনার। 'ঠিকই বলছি। অত বিনয়টিনয় দেখাবার দরকার নেই। আমি ব্যাপারটাকে এখন একটু অন্য দিক থেকে দেখছি। এই যে ধরো ঝিমলি নামের মেয়েটি। বাবা-মায়ের আদরযত্নে বড় হয়েছে, লেখাপড়া শিখেছে। তারপর বাবা-মা উদ্যোগ নিয়ে সুপাত্রে বিয়ে দিয়েছেন মেয়ের। কিন্তু সুপাত্রটি যে দু-নম্বরি—তাঁরা তো তা আর দুঃস্বপ্নেও ভাবতে পারেননি—! জামাই বউকে বেচে দিল সঙ্গে সঙ্গে। তারপর হাত বদল হয়ে ওই মেয়েটি কোনও শেখ বা সুলতানের হারেমে বাকি জীবনটা বন্দিদশায় কাটাতে বাধ্য হল। বাবা-মা কিচ্ছু টের পেলেন না। পুলিশ রিপোর্টে মেয়ে বরাবরের জন্যে মিসিং হয়ে থেকে গেল। কী ভয়ঙ্কর ব্যাপার বলো তো! শর্মাদের এই র‍্যাকেটটাকে একেবারে শেকড়সমেত উপড়ে ফেলার চেষ্টা করতে হবে।'

'ঝিমলিকে এখন কলকাতায় নিয়ে যাওয়া যাবে না মিলনদা?'

'মনে হয় অসুবিধে হবে না। কাস ফার্স্ট আওয়ারেই ওদের কোর্টে প্রোডিউস করব।'

একটু ইতস্তত করে কৌশিক বলল, 'মিলনদা, একটা বাজে। ওরা বোধহয় রিসেপশানে আপনার জন্যে অপেক্ষা করছে।'

অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন ডেপুটি কমিশনার, 'কারা?'

'ওই যাদের কথা তখন আপনাকে বলেছিলাম—। খবরের কাগজের রিপোর্টাররা—।'

বিরক্ত হয়ে ডিসি বললেন, 'ওদের তুমি এত তাড়াতাড়ি ভেড়াতে গেলে কেন বলো তো! এতে তদন্তের ক্ষতি হয়।'

'না, আমার তদন্তের স্বার্থেই আপনার নাম করে ওদের ডেকে পাঠিয়েছি।'

'কারা এসেছে?'

'আসার কথা তো ডেকান হেরাল্ড, ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস, হিন্দু আর পি টি আই-এর চারজন রিপোর্টারের।'

'ঠিক আছে, আমি কিন্তু সব সত্যি কথা বলব।'

'না, প্লিজ মিলনদা; উপস্থিত একটু মিথ্যে কথা বলতেই হবে আপনাকে। আমার নাম ওদের সামনে উচ্চারণও করবেন না। আর খবরটা যে ভাবে টুইস্ট করতে বলেছি, সেই ভাবেই করবেন। আমি চাই কাল অনেকগুলো কাগজে ওই ভাবেই খবরটা বার হোক। আমি ম্যানেজারকে বলে ওদের এখানে পাঠিয়ে দেওয়ার কথা বলে কেটে পড়ছি। গাঙ্গুলি থাকুক।'

'তুমি এখন বাঙ্গালোরে থাকছ তো?'

'না, কালকের প্রথম ফ্লাইট ধরে কলকাতায় ফিরে যাচ্ছি। পরে আবার আসব। চলি তাহলে। গুড বাই।'

।। একুশ ।।

বেলা দশটা। জোর এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে, কিন্তু আকাশের মেঘ তেমন কাটেনি। যে-কোনও মুহূর্তে নামতে পারে আবার। থানায় গম্ভীর মুখে নিজের চেয়ারে বসে আছেন ইন্সপেক্টর অবনী ঘোষরায়। ওঁর উলটোদিকের চেয়ারে উদ্বেগ আর দুর্ভাবনায় বিপর্যস্ত হয়ে-যাওয়া দুটি মানুষ। একজন বিশিষ্ট প্লাইউড মার্চেন্ট প্রিয়ব্রত সিন্‌হা। অপরজন ওঁর স্ত্রী তমালিকা। ভদ্রমহিলার ফর্সা গালে চোখের জলের শুকনো দাগ। মাথাভর্তি চুলে চিরুনি চালাননি ভাল করে। কোঁকড়ানো কিছু চুল পাখার হাওয়ায় উড়ছিল।

টেবিলের ওপর খবরের কাগজের মস্ত এক তাড়া। কাগজের তাড়াটা ইন্সপেক্টর টেনে নেওয়ার মুখে একজন কনস্টেবল ঢুকে বলল, 'এই যে স্যার, দৈনিক প্রদীপন পেয়েছি। আমার এক চেনা হকার তার এক বাঁধা খদ্দেরের জন্যে একটু লুকিয়ে রেখেছিল, আমি সেটাই নিয়ে এসেছি।'

আগ্রহের সঙ্গে হাত বাড়িয়ে দিলেন ইন্সপেক্টর। 'দাও-দাও, বড় কোনও খবর থাকলে দেখেছি এই কাগজটা বাজার থেকে উধাও হয়ে যায় চটপট। কী লিখেছে দেখি প্রদীপন—।'

কনস্টেবল হাতের কাগজটা ইন্সপেক্টরের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

ভাঁজ-করা খবরের কাগজের প্রথম পাতাটা টেবিলের ওপর টানটান করে মেলে ধরে গলা খাঁকারি দিয়ে ইন্সপেক্টর বললেন, 'প্রদীপন কী লিখেছে শুনুন এবার। কুখ্যাত আন্তর্জাতিক মেয়ে-পাচারকারী চক্র ধৃত বাঙ্গালোরে। উদ্ধার-করা মেয়েদের মধ্যে আছে কলকাতার সম্ভ্রান্ত পরিবারের এক তরুণী। পাচারকারী চক্রের সঙ্গে পুলিশের দশ রাউণ্ড গুলি বিনিময় হয়েছে, তবে কেউ হতাহত হয়নি। প্রচুর বিদেশি মুদ্রা ও সোনার বিস্কুট ভর্তি দুটি ব্যাগ পুলিশ আটক করেছে। ধৃতদের মধ্যে আছে কয়লাখনি এলাকার আতঙ্ক শর্মা, যোগিন্দর ও মধু সিং। তিনজন বেদুইন দস্যুও ধরা পড়েছে। বাঙ্গালোরের গোয়েন্দাপ্রধান চৌধুরী জানিয়েছেন, শহরের বিভিন্ন নিষিদ্ধ এলাকায় হানা দিয়ে চক্রের বাকি সদস্যদেরও গ্রেফতার করা হয়েছে। এক একান্ত সাক্ষাৎকারে চৌধুরী এই পত্রিকার বিশেষ সংবাদদাতাকে জানিয়েছেন, শীঘ্রই অপহৃত আরও অন্তত পঞ্চাশটি মেয়েকে উদ্ধার করা যাবে। এদের বিয়ে করে কিংবা চাকরির লোভ দেখিয়ে এনে চক্রের কাছে বিক্রি করে দিয়েছে দুষ্কৃতীরা। উদ্ধার-করা মেয়েদের অনাথ আশ্রমে পাঠানো হবে।'

আঁতকে উঠে তমালিকা জিজ্ঞেস করলেন, 'ঝিমলিকেও কি অনাথ আশ্রমে পাঠানো হবে?'

প্রশ্নের স্পষ্ট কোনও জবাব জানা নেই ইন্সপেক্টর ঘোষরায়ের। উনি প্রিয়ব্রতর দিকে

তাকিয়ে জিগ্যেস করলেন, 'মিস্টার সিনহা, আপনি তো আজ সকালেই বাঙ্গালোরের ডি সি সাহেবের সঙ্গে এসটিডি-তে কথা বলেছেন, উনি এই বিষয়ে কিছু বলেছেন কি?'

'না, মানে এই অনাথ আশ্রমের ব্যাপারটা তো অন্য কোনও কাগজে লেখেনি। মেয়ে কেমন আছে জানতে চেয়েছিলাম—। তা, উনি বললেন, একটু আগেই হাসপাতাল থেকে খবর এসেছে, মেয়ে সুস্থ আছে। হাসপাতাল থেকে ওকে কোর্টে প্রোডিউস করা হবে, তারপর কোর্ট যা বলে—। তো, আমি রিকোয়েস্ট করেছিলাম—মেয়েকে আপনি কাইন্ডলি আজকেই কলকাতায় পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। এয়ারে পাঠান। শুধু মেয়ে নয়, মেয়ের এসকর্টদের খরচখরচাও আমি দিয়ে দেব।'

'উত্তরে কী বললেন ডিসি?'

'না, এই ব্যাপরে উনি কোনও কমেন্ট করেননি। শুধু বলেছেন—এই ধরনের ঘটনায় যে-কোনও বাবা-মাই উদ্বিগ্ন হন। সেটা স্বাভাবিকও। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন—এই বিষয়ে আমার পক্ষে যতটা যা করা সম্ভব, আমি অবশ্যই করব।'

বেশ জোর দিয়ে সমর্থনের ভঙ্গিতে ঘোষরায় বললেন, 'ঠিকই বলেছেন, যাঁরা ল অ্যান্ড অর্ডার দেখাশোনা করেন তাঁরাও তো ব্যক্তিগত জীবনে বাবা-মা। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন—এ ব্যাপারে অফিসাররা কর্তব্যের অতিরিক্ত করবেন। আমি তো বাঙ্গালোরের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি—ওই এন্ডে কোনও খবর থাকলে ওঁরা সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জানাবেন। আচ্ছা—শহরের সবকটা ইংরিজি, বাংলা খবরের কাগজই তো দেখলাম— কিন্তু প্রদীপনের মতো এত বেশি খবর আর কোনও কাগজ দিতে পেরেছে কি? আসলে প্রদীপনের নেটওয়ার্ক অত্যন্ত পাওয়ারফুল। কাগজটা সেই জন্যেই এত বেশি চলে। এই যে ধরুন, মাফিয়াদের সঙ্গে পুলিশের যে দশ রাউন্ড গুলি এক্সচেঞ্জ হয়েছে, সেটা কই—আর কোনও কাগজ তো দিতে পারেনি। তারপর ধরুন, শুধু করেন এক্সচেঞ্জ নয়, অনেকগুলো সোনার বিস্কুটও পাওয়া গেছে—এটাও এদের এক্সক্লুসিভ খবর। অন্যান্য কাগজ লিখেছে আরবের দুই শেখ—এদিক থেকেও প্রদীপন মেরে বেরিয়ে গেছে—। পরিষ্কার লিখেছে, তিনজন বেদুইন দস্যু। বেদুইন দস্যুরা একটা সময় মরুভূমির অসম্ভব তেতে- ওঠা বালির মধ্যে ডাকাতি করত। এখন ওরা আর অত কষ্ট করতে যাবে কেন? লাইন পালটে দিব্যি মাফিয়াদের দলে ঢুকে পড়েছে। আর একটু চা বলি?'

সামনের দুজন কোনও জবাব দেওয়ার আগেই ঘণ্টা বাজালেন ইন্সপেক্টর। একজন কনস্টেবল ঢুকতেই সামনের দিকে তাকিয়ে আবার একটা প্রশ্ন করলেন, 'লেবু চা বলি?'

এবারও উত্তর আসার আগে ইন্সপেক্টরই সিদ্ধান্ত নিলেন, 'হ্যাঁ, তিনটে লেবু চা বলে দাও।'

কনস্টেবল ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই টেলিফোন বেজে উঠল। রিসিভার তুলে কানে লাগিয়েই টানটান হয়ে বসলেন ইন্সপেক্টর। 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, ইয়েস।' 'হ্যাঁ-হ্যাঁ ও কে।' 'ঠিক আছে, শিওরলি। থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি ম্যাচ। বাই।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে সামনের উদ্বিগ্ন বাবা-মায়ের দিকে তাকিয়ে ইন্সপেক্টর বললেন, 'বাঙ্গালোর থেকে ফোন এসেছিল। ভাল খবর। আপনাদের মেয়ে ঝিমলি সুস্থ আছে। তবে মস্ত বড় শক্ তো, পুরোপুরি সামলে নেওয়ার জন্য আরও কয়েকটি দিন হাসপাতালে

থাকতে হবে ওকে। না-না, ঘাবড়াবার কিছু নেই। তেমন কিছু হলে ওরা তো আমাকে

ইন্সপেক্টরের অভয়বাণী একেবারেই কাজে এল না। তমালিকার মুখ কাগজের মতো সাদা হয়ে গিয়েছিল। 'হাসপাতাল মানে কোথাকার হাসপাতাল? বাঙ্গালোরের না কলকাতার?'

'কলকাতার। মেয়ে এয়ারে আসছে। আজকেই। এয়ারপোর্ট থেকে ওকে সোজা পি জি-তে নিয়ে যাওয়া হবে। ইন্সপেক্টর নাইডু ফোন করেছিলেন। ডিসি ওকে জানিয়ে দিয়েছেন—খবরটা যেন মেয়ের বাবা-মায়ের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। বলেছেন, ওঁরা ইচ্ছে করলে এয়ারপোর্টে গিয়ে মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে পারেন। এসকর্টদের বলা আছে, কোনও অসুবিধে হবে না।'

উদ্বেগ, উত্তেজনা আর আনন্দে তমালিকার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এসেছিল। প্রিয়ব্রত জিজ্ঞেস করলেন, "বাঙ্গালোরের ওই ফ্লাইটটার এখানে অ্যারাইভাল ক'টায়? কিছু জানিয়েছেন কি?"

"হ্যাঁ, সেকেন্ড ফ্লাইটে আসছে। অ্যারাইভ্যাল টাইম রাত ন'টা নাগাদ। তবু একটু চেক-আপ করে নেবেন।"

উত্তরটা শোনার পরেই চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছিলেন ঝিমলির বাবা-মা।

ওদের উঠতে দেখে হাঁ-হাঁ করে উঠলেন ইন্সপেক্টর। 'আরে! প্লেন আসবে তো সেই রাত্তিরে। বসুন, লেবু চা'টা খেয়ে যান অন্তত।'

হাতজোড় করে প্রিয়ব্রত বললেন, 'না, আজ থাক। আমরা সাতসকালেই বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছি। নমস্কার।'

ওঁরা বেরিয়ে যাওয়ার মিনিট-পাঁচেক বাদে যে মানুষটি এসে ঘরে ঢুকল তাকে দেখেই ছেলেমানুষের মতো খুশি হয়ে উঠেছিলেন ইন্সপেক্টর। কিন্তু এই খুশির ভাবটি এক মুহূর্তের বেশি টিকে থাকেনি। দেখতে দেখতে অসম্ভব রকমের গম্ভীর হয়ে উঠলেন ইন্সপেক্টর ঘোষরায়।

টেবিলের উলটোদিকের চেয়ারের পেছনে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকার পরে কৌশিক বলল, 'কী অবনীদা, বসতে বললেন না?'

একটা ফাইল টেনে নিয়ে গম্ভীর মুখে জবাব দিলেন ইন্সপেক্টর, 'আমি তো কাউকে বসতে নিষেধ করিনি।'

সামনের চেয়ারটায় বসে পড়ে কৌশিক বলল, 'আপনি কি আমার ওপর চটে আছেন অবনীদা?'

ফাইলের মধ্যে মুখ প্রায় ডুবিয়ে দিয়েছেন ইন্সপেক্টর। 'তুমি তো আমার দফতরে চাকরি করো না, রাগ করার কোনও প্রশ্নই উঠছে না। আমি আমার কাজ নিয়ে নাস্তানাবুদ হওয়ার সময় তোমার যদি দূরে কোথাও গিয়ে মাছ ধরার শখ চাপে—আমার কি তাই নিয়ে কিছু বলার হক আছে?'

ইন্সপেক্টরের কথায় রীতিমত অবাক হয়ে গিয়েছিল কৌশিক। 'মাছ ধরা! আমার তো এই ধরনের শখ কোনও কালেই ছিল না!'

'মাছ না ধরে যদি জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে ফড়িং ধরো, কিংবা গ্রামের পল্লীপ্রকৃতি দেখে

বেড়াও—আমার কাছে ব্যাপারটা একই থাকছে। মোদ্দা কথা, আমি আমার বিপদের সময় তোমাকে পাশে পাইনি।'

লাজুক মুখে একটু হেসে কৌশিক বলল, 'আপনি আমাব কথাটা শুনবেন ?'

'না, তোমার নিখুঁত অজুহাত শুনে আমার কোনও লাভ নেই। তাছাড়া এখন তো আমার কাঁধ থেকে সব বোঝা নেমে গিয়েছে। দি কেস ইজ ক্লোজ্‌ড।'

'কীরকম ?'

কৌশিকের প্রশ্নের উত্তরে ধারালো একটি ব্যঙ্গের হাসি খেলে গিয়েছিল ইন্সপেক্টরের ঠোঁটে। একটু কেটে-কেটে উনি বললেন, 'ওহ্! তুমি তো আবার ছুটিতে কিংবা ছুটির মুডে থাকলে খবরের কাগজ পড়ো না। আজকের কোনও একটা কাগজ পড়া থাকলে এই প্রশ্নটা তুমি আমাকে নিশ্চয়ই করতে না।'

রাস্তার মোড়ের টি স্টলের ছোকবাটি তিন গ্লাস লেবু চা নিয়ে হাজির হয়ে গিয়েছিল। দু'জনের সামনে দুটি গ্লাস নামিয়ে রেখে বড়বাবুকে জিজ্ঞেস করল, 'এই গ্লাসটা কাকে দেব ?'

বড়বাবু বাজখাঁই গলায় বললেন, 'এখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে তুই খাবি। আর যদি খেতে ইচ্ছে না করে, ঠাণ্ডা করে মাথায় ঢালবি। যা পালা এখান থেকে।'

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকার পরে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল ছেলেটি।

ইন্সপেক্টর চায়ের গ্লাস হাতে তুলে নিলেন, তারপর কয়েকটি চুমুকে লেবুমেশানো কালো পদার্থটুকু গলার মধ্যে নামিয়ে দেওয়ার পরে নিজের মনে কথা বলার ভঙ্গিতে বললেন, 'এই কেসের মাথাগুলো যখন ধরা পড়ে গিয়েছে বাঙ্গালোরে, বাকিগুলোও ধরা পড়বে। মোট কথা, আমি আর এই ব্যাপারে ধকল নেওয়ার মধ্যে নেই। প্রসেনজিতের জামিন আর আটকাব না।'

একটু চমকে উঠে কৌশিক প্রশ্ন করল, 'কোন্ প্রসেনজিৎ ?'

'বুলা নামের যে মেয়েটি বিয়ের রাতে খুন হয়েছে, সেই বুলার কাকা প্রসেনজিৎ, প্রসেনজিৎ রায়।'

'ওর জামিন! মানে ?'

'এদিককার কোনও খবরই তো রাখো না। প্রসেনজিৎকে তো কয়েক দিন হল তুলে এনে লক-আপে ভরেছি। এই কেসে ও একজন সাসপেক্ট। আগে ধরতে পারিনি, পরে পেরেছি। কয়েকবার রগড়েছি লক-আপে, সব খবর এখন বেরিয়ে আসার মুখে; কিন্তু তার আর বোধহয় দরকার হবে না। বাঙ্গালোরের ওই ধরপাকড়ের পরে আমি এ-ব্যাপারে হাত ধুয়ে নিচ্ছি। বড় সাহেবরাও তাই চায় মনে হয়। যা করার এখন ওরাই করবে।'

'কিন্তু প্রসেনজিৎকে আপনি লক-আপে ঢোকালেন কেন ?'

'তার কারণ লোকটা পুরো দু-নম্বরি। গুণের আর শেষ নেই। প্রফেসর মৃদুল ভট্টাচার্যের সাতটা জুয়েল-বসানো খুব দামি একটা পেপারকাটার ঝেড়ে দিয়ে বাঙ্গালোরে পালাচ্ছিল—। নজরে রেখেছিলাম অনেক আগে থেকেই, পালাবার মুখে ধরে এনে লক-আপে ঢুকিয়েছি। কিন্তু এখানে ঠাণ্ডা মাথায় ইনভেস্টিগেশন চালানো ক্রমশই কঠিন হয়ে পড়ছে। তার ওপর আবার প্রফেসর ভট্টাচার্যের মতো খ্যাপা লোক জুটলে তো কথাই নেই। রীতিমত তড়পে আমাকে দিয়ে আজগুবি একটা কমপ্লেন লজ করিয়ে নিল।'

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল কৌশিক, 'কী কমপ্লেন?'

'ভারী বিদঘুটে। এই ধরনের লোকগুলো আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার কাজে খামোখা এসে বাগড়া দিয়ে যায়। আরে বাবা, তোর তো পাগলামো করার আরও অনেক জায়গা আছে—সেখানে গিয়ে কর না! না হলে যা করছিস তাই কর—বই মুখে দিয়ে পড়ে থাক চব্বিশ ঘন্টা। আসলে এই বইমুখো লোকগুলো নিষ্কর্মার ঢেঁকি হয়। ছাপার জগৎ আর বাস্তব জগতের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত। কিন্তু বই-পড়া লোকগুলো এই দুটো জগৎকে একেবারে গুলিয়ে ফেলে। তার ফলে বিদ্‌ঘুটে সব ঝঞ্ঝাট-ঝামেলা তৈরি হয়। আচ্ছা, তুমিই বলো—পড়াশুনোটা কেন? লার্নিং ইজ ফর আর্নিং। সোজা কথা, সার কথা, স্কুল-কলেজে মন দিয়ে পড়াশুনো করা দরকার। কেন দরকার? না—ভাল করে পড়লে, ভাল ফল করলে—তুমি একটা ভাল চাকরি পাবে। এই জন্যেই পড়াশুনো। একজন বড় ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে আমার খুব হৃদ্যতা আছে, তার বাড়িতে একটাও বই নেই; কিন্তু কেউ কি তাকে অশিক্ষিত বলবে?'

'ওই প্রফেসর কী নালিশ কবেছে আপনার কাছে?'

''শুনলে তুমি হাসবে। প্রফেসারের বউ মিডল-এজেড, পঞ্চাশের আশেপাশে বয়েস। খোঁজ নিয়ে জেনেছি একটা পা ডিফেকটিভ। পোলিও-ভিকটিম। এঁর সঙ্গে এঁর পুরনো এক বান্ধবীর বরের একটু ইয়ে ছিল বোধহয় এক সময়। তা, এখনও বুঝি মাঝেমধ্যে দু-চারটে চোয়া ঢেকুর ওঠে। দু-চারটে নির্দোষ চিঠিপত্রের লেনদেনও হয়। ওই যেমন পুরনো দিনগুলো আমাদের কী সুখের ছিল! এই গোছের চিঠি। তাই নিয়ে খেপেছে প্রফেসর। নির্ঘাত আজেবাজে কথা শুনিয়েছে বউকে। বউ চটে গিয়ে হয়তো কোনও আত্মীয়ের বাড়িতে উঠেছে। কিন্তু খ্যাপার ধারণা হয়েছে—ওর বউকে কিডন্যাপ করেছে ওই বান্ধবীর বর। না-না, দাঁড়াও, আরও আছে—। আমি প্রফেসরকে বললাম, আপনার স্ত্রী প্রাপ্তবয়স্ক মহিলা। তিনি যদি কাউকে ভালবেসে তার সঙ্গে চলে যান—তাকে অপহরণ বলে না। আপনি ইচ্ছে করলে ডিভোর্স স্যুট ফাইল করতে পারেন। তার বেশি কিছু করার নেই আপনার। তা, লোকটা গোঁয়ারগোছের। চোখ পাকিয়ে বলল—আমাকে আইন শেখাতে আসবেন না, কিছু আইন আমারও জানা আছে। ইট'স এ কেস অব কিডন্যাপিং। আমি নালিশ করছি, আপনি লিখুন। যদি না লেখেন—আমার অমুক জানা আছে, তমুক চেনা আছে, এট্‌সেটরা এট্‌সেটরা। এই লোকগুলো ভাল করতে না পারুক, ক্ষতি করতে পারে।''

'কমপ্লেনটা নিলেন?'

'না নিয়ে উপায় কি? সবচেয়ে ফানি ব্যাপাটা বলছি এবার তোমাকে। বললাম—ঠিক আছে লিখে নিচ্ছি। কিন্তু অপহরণের পেছনে একটা উদ্দেশ্য তো থাকে। এখানে সেটা কী? তখন বলল—খুন। ওর স্ত্রীকে অপহরণ করে ওই ডাক্তার-প্রেমিক খুন করবে। কেন খুন? তখন ম্যা-ম্যা করে আবোলতাবোল কিছু কারণ দেখাল। বান্ধবীর বর নামকরা ডাক্তার। জব্বলপুরে পোস্টিং। খোঁজ নিয়ে জানলাম, অত্যন্ত ক্লিন ম্যান। পরিষ্কার রেকর্ড। পরোপকারী ডাক্তার। কোনওরকম নেশা-ভাঙ পর্যন্ত করে না।'

'এসব কথা জানিয়েছেন প্রফেসরকে?'

'না, কী করে জানাব? উনি তো আবার সেমিনার করতে চলে গেছেন পণ্ডিচেরিতে।

কাজের কাজ কিচ্ছু হচ্ছে না। তারপর আবার এইসব পাগলছাগলকে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হওয়া আছে। বিশ্বাস করো, আজকাল আমি প্রায়ই কর গুনি। মানে মানে চাকরির মেয়াদটা ফুরোলে বাঁচি।'

কৌশিক একটু মজা করার ভঙ্গিতে বলল, 'উপস্থিত ঝক্কিঝামেলার হাত থেকে বেঁচেছেন, এটাই এখন সবচেয়ে বড় খবর।'

'হ্যাঁ, একটা রহস্যেরও কিনারা করতে পারিনি। রুটিন করে বড় সাহেবদের কাছে গালমন্দ খেয়েছি। একজন তরুণ গোয়েন্দার ওপর নির্ভর করেছিলাম, তিনি আমাকে কলা দেখিয়ে পল্লীপ্রকৃতি দেখে বেড়িয়েছেন। এখন সব ঝক্কিঝামেলা কাঁধ থেকে নেমে গিয়েছে। হ্যাঁ, একে তো বাঁচাই বলে, বাঁচার মতো বাঁচা!'

কৌশিক হঠাৎই ঝলমল করে হেসে উঠে বলল, 'ও অবনীদা, আপনাকে তো আসল খবরটাই দেওয়া হয়নি। আমার অ্যাপার্টমেন্টে এখন গ্রামবাংলার সেরা উপহার এসে হাজির হয়েছে।'

অনেকক্ষণ বাদে ইন্সপেক্টর অবনী ঘোষরায়ের স্বাভাবিক গলা বার হল—'কীরকম?'

ঝকঝক করছিল কৌশিকের চোখমুখ। 'এমন কালারফুল অতিথি এর আগে আর কখনও পাইনি। মহামান্য অতিথির নাম রাধাগোবিন্দ গিরি।'

ইন্সপেক্টরের কপালে ভাঁজ পড়ল। 'কে সে?'

'উনি কয়েকদিন আগে মাত্র একাশি বছর বয়েসে ওঁর জীবনের পঁচাশি নম্বর বিয়েটি সুসম্পন্ন করেছেন। বউয়ের বয়েস ষোলো থেকে উনিশের মধ্যে কোনও এক জায়গায়। ইন দ্য ট্রুয়েস্ট সেন্স অব দ্য ওয়ার্ড বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা। এদের সম্মানে একটা পার্টি থ্রো করব ভাবছি।'

'পার্টি! বুড়োটা তো ক্রাইম করে বেড়াচ্ছে। এক্ষুনি ওটাকে লক-আপে ভরা উচিত।'

'না না অবনীদা, চালু আইনে এঁর বিচার চলে না। প্রণম্য মানুষ। এমন উঁচু মনের পরোপকারী মানুষ আমি খুব একটা দেখিনি। ওর গুণের ফিরিস্তি দিতে গেলে অনেকটা সময় লেগে যাবে, পরে আমি সব বলব আপনাকে। উপস্থিত একটা ব্যাপারে অনুরোধ করছি। কাল সন্ধে-রাত্তিরের জন্যে আপনি আপনাকে একটু ফ্রি রাখবেন। আমার এক বন্ধু আসবে আপনাকে নেমন্তন্ন করতে—।'

'নেমন্তন্ন, কিসের?'

'কাউকেই বলা হচ্ছে না। আমরা দু-চারজন শুধু। একটু ঘরোয়াভাবে বসে ভাল-মন্দ খাব। কাছেই, মিন্টোপার্কের একটা গেস্টহাউসে।'

'কিন্তু উপলক্ষটা কী?'

'উপলক্ষ তেমন কিছু নয়। আমার এক বন্ধুর ভাগনির বিয়ে। রেজিস্ট্রি করে বিয়ে। বর-কনে, আর আমরা দু-চারজন থাকব শুধু।'

'বুঝতে পেরেছি—খাওয়াটাই উপলক্ষ। পাশাপাশি, বোধহয় বাড়তি কিছুটা জায়গা পাওয়া গিয়েছে বলে, একটা বিয়েও হয়ে যাবে। তাই তো?'

ঘর ফাটিয়ে হেসে উঠল কৌশিক। 'যাক, আপনার ঘাড় থেকে যে বাড়তি ঝক্কিঝামেলা নেমে গেছে—এবার সত্যিই বোঝা গেল। শুনুন অবনীদা, কেন এভাবে বিয়ে হচ্ছে—সে

এক লম্বা বৃত্তান্ত। পরে সব বলব আপনাকে। এখন শুধু দু-চারটে কথা বলে নিই। কিছুদিন আগে আমার এই বন্ধুর দিদি-জামাইবাবু কাঠমাণ্ডু থেকে ফেরার পথে বিচ্ছিরি এক কার-অ্যাকসিডেন্টে ইনভল্‌ভ্‌ড হন। দিদি স্পটেই মারা যান। জামাইবাবু মারাত্মক ইন্‌জুরি নিয়ে এখন দিল্লির এক নার্সিংহোমে। জামাইবাবুর ধারণা, উনিও মারা যাবেন। মারা যাওয়ার আগে একমাত্র মেয়ের বিয়ে দিয়ে যেতে চান। ওঁর এই ধারণাটা এখন প্রায় অবসেশানের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। ডাক্তাররা বলছে, সত্যি-সত্যি বিয়ে দিতে পারলে রোগী মানসিক দিক থেকে তৃপ্তি পাবে। ওই তৃপ্তি ওঁকে সুস্থ হতে সাহায্য করতে পারে অনেকখানি।'

ইন্সপেক্টর সায় দিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ এইরকম দু-একটা কেসের কথা শুনেছি আমি। মনের জোরই আসল জোর। মনের জোর বাড়লে দেহের জোরও বাড়ে। সে জন্যেই কি তাড়াহুড়ো করে বিয়ে?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই। তবে নতুন একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে।'

'কী সমস্যা?'

'কথা ছিল—সই করে বিয়ে হবে। তারপর সকালের ফ্লাইটেই বর-বউ দিল্লি গিয়ে সোজা নার্সিংহোমে যাবে। ওখানে গিয়ে বাবাকে প্রণাম করবে।'

'হ্যাঁ, তা আটকাচ্ছে কোথায়?'

'না, আটকাচ্ছে না কোথাও। তবে গতকাল আমার বন্ধুর জামাইবাবু লোক মারফত স্ত্রীর একটা বেনারসী আর একগাদা গয়না পাঠিয়ে দিয়ে জানিয়েছেন, মেয়ে যেন অতি অবশ্য বিয়ের আসরে মায়ের শাড়ি আর গয়না পরে। এটা মেয়ের মায়ের শখ ছিল বহুদিনের।'

'বেশ তো, পরলেই তো ঝামেলা মিটে যায়।'

'আসলে আমার বন্ধু ভয় পাচ্ছে। জামাইবাবু অসম্ভব ধনী। ওই সব পুরনো দিনের গয়নার দাম কম করে লাখ দশেক টাকা হবে। ফাঁকা গেস্টহাউসে অত টাকার গয়না! যদি বিপদটিপদ হয়! তখন ছেলের বাবাই পরামর্শ দিলেন—আপনারা পুলিশকে জানান একজন আর্মড এসকর্ট দিতে। তাহলে আর ডাকাতির ভয় থাকবে না।'

ইন্সপেক্টর সমঝদারের মতো ঘাড় নেড়ে বললেন, 'খুব বুদ্ধিমানের মতো পরামর্শ। তোমার বন্ধুকে আমাকে অ্যাড্রেস করে একটা দু-লাইনের চিঠি দিতে বলো। আমি এসকর্ট পাঠিয়ে দেব।'

'যাক, নিশ্চিন্ত। কিন্তু আপনাকে তো আসতে হবে। আমার বন্ধু আজকেই আসবে আপনাকে নেমন্তন্ন করতে।'

'ঠিক আছে, সে দেখা যাবে।'

'এখন তাহলে চলি অবনীদা।'

ইন্সপেক্টরের মুখে রহস্যমাখা এক চিলতে হাসি ফুটে উঠেছিল। 'দাঁড়াও-দাঁড়াও, আমি তো বরাবরই তোমার সব কথা শুনি। তুমি কি এবার আমার একটা কথা শুনবে?'

চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছিল কৌশিক। 'কী কথা?'

'তোমার ঘরে নব-দম্পতি, কাল বাইরেও নব-দম্পতি দেখবে। তা, তুমি আর কত কাল পায়ে কাঁচি মেরে কদমতলায় দাঁড়িয়ে বাঁশি বাজাবে? দুর্গা বলে তুমিও কালকেই ঝুলে পড়ো। পাত্রী ঠিক করা আছে? না আমি দেখব?'

কৌশিক একটু লাজুক হাসি হেসে বলল, 'আপনার পরামর্শটা দারুণ! কিন্তু উত্তরটা তো এই মুহর্তে আমার জানা নেই। জানতে পারলেই আপনাকে জানাচ্ছি। এখন তাহলে আসি অবনীদা।'

।। বাইশ ।।

এইমাত্র বাঙ্গালোরের সেকেন্ড ফ্লাইট এসে কলকাতা বিমানবন্দরের রানওয়ে ছুঁয়েছে। আলো-ঝলমলে লাউঞ্জে যাঁরা আছেন তাঁদের মধ্যে দুজনের চোখেমুখে গভীর উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার ছাপ। এঁদের দিকে চোখ পড়লে যে-কেউ বুঝতে পারবেন, ভয়ঙ্কর এক অস্বস্তির মধ্যে আছেন এঁরা। বাঙ্গালোরের ফ্লাইট পৌঁছবার খবর শুনেই প্রিয়ব্রত আর তমালিকা উঠে গিয়ে ভেতর দিকের গেটের পাশে দাঁড়ালেন। যাত্রীরা এই পথ দিয়েই আসবেন।

একটু পরেই বাঙ্গালোরের যাত্রীরা আসতে শুরু করলেন। গেটের কাছে ভিড় বেড়ে উঠেছিল। হঠাৎ তমালিকা চেঁচিয়ে উঠলেন—'ওই তো ঝিমলি!'

ঝিমলির গায়ের রঙ বেশ ফর্সা। কিন্তু ওর ফর্সা রঙয়ের মধ্যে যে সতেজ লালচে ভাবটা আগে ছিল, সেটা এখন আর নেই। ওর দিকে এই মুহূর্তে তাকালে মনে হবে অসম্ভব ফ্যাকাশে মেয়েটি রক্তশূন্যতায় ভুগছে। একজন শক্তসমর্থ দক্ষিণী মহিলা ওর হাত ধরে ছিলেন। মাঝেমধ্যে ওই মহিলার কাঁদে মাথা নেমে আসছিল ঝিমলির।

গেটের বাইরে আসতে না আসতেই তমালিকা প্রায় ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরেছিলেন মেয়েকে। ঝিমলির আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেছে মাকে পেয়ে। দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরেছে গভীরভাবে। অঝোর ধারায় জল গড়িয়ে পড়ছিল দুজনের চোখ দিয়েই। মাঝেমধ্যে কেঁপে উঠছিল শরীরদুটো।

প্রিয়ব্রত ওদের দিকে এগোতেই মজবুত গড়ন, সাফারি স্যুট-পড়া এক ভদ্রলোক ওঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'প্লিজ ডোন্ট গো। লেট দেম ক্রাই ফর সাম টাইম। আপনি ইদিকে আসেন।'

ভদ্রলোক আত্মপরিচয় দিলেন, 'আমি রঙ্গনাথন। আপনার মেয়ের এসকর্ট। আমি অনেকদিন কলকাতায় ছিলাম। আমি কুছু-কুছু বাংলা জানে। আপনার মেয়ের মেডিক্যাল রিপোর্ট খুব ভাল। দি রিপোর্ট সেজ, শি হ্যাজ নট বিন সেক্সুয়ালি এক্সপ্লয়েটেড।'

মা-মেয়ে কিছুক্ষণ কাঁদার পরে দক্ষিণী মহিলা দুজনের পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, "নাউ লেট্'স মুভ্।"

কিন্তু দু-পা এগোতে না এগোতেই বাবাকে দেখে আর একবার কেঁদে ফেলল ঝিমলি।

বাবার বুকে মেয়ের মুখ। গভীর মমতায় মেয়ের চুলে, মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন প্রিয়ব্রত। ওঁর চোখও জলে ভরে গিয়েছিল।

কান্নার বোধহয় নিজের একটা ভাষা আছে। মুখে কিছু বলার দরকার নেই। চোখের জল সবকিছু বুঝিয়ে দেয়, সব কিছু বুঝে নেয়। আরও কিছুক্ষণ ওই ভাবে থাকার পরে রঙ্গনাথন এগিয়ে এসে বললেন, 'এবার তো আমাদের যেতে হবে হসপিটালে। অ্যাম্বুলেন্স এসে গিয়েছে।'

লাউঞ্জ থেকে বেরুতেই অ্যাম্বুলেন্সের দেখা মিলল। রঙ্গনাথন প্রিয়ব্রতর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমাদের ডি সি চাউডুরি সব অ্যারেঞ্জমেন্টই পাক্কা করে রেখেছেন। উনি বলেছিলেন, নিজে একবার আসতে পারেন ক্যালকাটায়। মনে হয় কাজে আটকে গেছেন। এনি ওয়ে, আমরা এখন পি জি হসপিটালে মুভ করছি। ইওর ডটার নিড্স এ ফিউ মোর ইনভেস্টিগেশন্স। ডোন্ট ওয়ারি। দিস, আই সাপোজ, এ রুটিন চেক-আপ। এর পর ওর একটু রেস্ট দরকার। কাল আপনারা ভিজিটিং আওয়ার্সে চলে আসেন। ইনকুয়ারিতে জিজ্ঞেস করলে ওয়ার্ড নম্বর, বেড নম্বর জেনে যাবেন। গুড নাইট।'

দক্ষিণী মহিলা ঝিমলিকে সঙ্গে নিয়ে অ্যাম্বুলেন্সের পেছনে বসলেন। রঙ্গনাথন বসলেন ড্রাইভারের পাশে। অ্যাম্বুলেন্স কেমন যেন একটা তীক্ষ্ণ সুরের আওয়াজ বার করে ছুট লাগাল সামনের দিকে। অ্যাম্বুলেন্সের মাথার আলোটা লাল রশ্মির একটা বৃত্ত তৈরি করে ঘুরেই চলেছিল।

অ্যাম্বুলেন্স চলে যাওয়ার পরে নিজেদের গাড়িতে উঠলেন প্রিয়ব্রত ও তমালিকা। ড্রাইভার সুবল মুখ ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'বাড়ি তো?'

একদিকে মাথা কাত করলেন প্রিয়ব্রত।

ইঙ্গিত পেয়েই গাড়িতে স্টার্ট দিয়েছিল ড্রাইভার। একটু পরেই এসে গেল ভি আই পি রোড। ওয়ান-ওয়ে। প্রতিটি গাড়িই বেশ জোরে ছুটে চলেছিল। জোরালো হাওয়া ঢুকছিল জানালা দিয়ে। দু'দিকে আলো-আঁধারি। শুধুমাত্র চোখের জল নয়, স্পর্শেরও নিজস্ব একটা স্পষ্ট ভাষা আছে। সেই ভাষাতেই এখন বুঝি কথা বলছিলেন স্বামী-স্ত্রী। তমালিকার একটা হাত প্রিয়ব্রত নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিয়েছিলেন।

রাতের ভি আই পি রোড। গাড়ির সংখ্যা দিনের তুলনায় বেশ কম। সুতরাং খুব অল্প সময়ের মধ্যেই রাস্তাটা ফুরিয়ে এল প্রায়। আচ্ছন্নের মতো বসে ছিলেন স্বামী-স্ত্রী। প্রিয়ব্রত হঠাৎই চাপা গলায় বললেন, 'এসকর্ট রঙ্গনাথন একটা ভাল খবর দিয়েছে।'

স্বামীর দিকে মুখ ফেরালেন তমালিকা।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে প্রিয়ব্রত বললেন, 'ঝিমলির মেডিক্যাল টেস্টের রিপোর্ট খুব ভাল। রিপোর্ট বলছে, মেয়ের চূড়ান্ত ক্ষতিটা হয়নি।'

কথাটা কানে যেতেই প্রিয়ব্রতর হাত শক্ত করে চেপে ধরেছিলেন তমালিকা। স্ত্রীর শরীরের রক্তচাপ বেড়ে যাওয়ার স্পন্দন টের পাচ্ছিলেন প্রিয়ব্রত। টের পাচ্ছিলেন স্পন্দনের ভাষাও। এই মুহূর্তে তমালিকা বোধহয় অনেকখানি আশ্বস্ত।

৫

কর৫ কলকাতার ধারেকাছে দু-চারটে বাগানবাড়ি আছে যেখানে এখনও পর্যন্ত হাউসবিল্ডার,

প্রোমোটাররা ঢুকতে পারেনি। এই বাগানবাড়িগুলো কলকাতার দেড়শো-দুশো বছরের স্মৃতি বুকের মধ্যে আগলে রেখে দাঁড়িয়ে আছে। বেশ কিছু প্রাচীন গাছ এইসব বাগানে ডালপালা ছড়িয়ে বেড়ে উঠেছে নিজেদের মতো করে। আগাছা আর বুনো ঘাসের বাড়বাড়ন্ত বেশ কিছু জায়গাকে একেবারেই দুর্ভেদ্য করে রেখেছে। এ সব বাগানে বুঝি সন্ধের পরেই মাঝরাত নেমে আসে।

উত্তর শহরতলির পাঁচিশ-ত্রিশ বিঘের এমন একটি বাগান কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা। রাত দশটা নাগাদ এই বাগানের বেড়া ফাঁক করে লম্বা, ছিপছিপে চেহারার একটি মানুষ বেরিয়ে এল সন্তর্পণে। আবছা অন্ধকার চারদিকে। সবকিছুই আশ্চর্য রকমের শান্ত। বাগান থেকে মাঠ। মাঠ কিছুটা ভাঙার পরে মেঠো পথ। মেঠো পথের শেষে খোয়াওঠা রাস্তা। ওই রাস্তা এসে থেমেছে পিচের রাস্তায়। পিচের রাস্তার একধারে একটা অ্যাম্বাসাডার গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। গাড়ির সামনের সিটের দু'জনের একজন চাপা গলায় বলে উঠল, 'ওই তো কৌশিকবাবু এসে গেছেন।'

গাড়ির সামনের সিটের দু'জনেই পুলিশের ইনফর্মার। একজন মধুসূদন পুরকাইত, অন্যজন খালেক মিঞা।

লম্বা পায়ে এগিয়ে এসে গাড়ির পেছনের সিটে বসে পড়ে কৌশিক বলল, 'চলো।'

গাড়ি চালাচ্ছিল খালেক। একটুখানি যাওয়ার পরে ও জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাব স্যার?'

'কাছেই একটা পাঞ্জাবি ধাবা আছে, চলো ওখানে গিয়ে আমরা রাত্তিরের খাবারটা খেয়ে নিই। বেশ খিদে পেয়ে গিয়েছে।'

সাত-আট কিলোমিটার ছোটার পরে ধাবা মিলল। হাইওয়ের ধারে ধারে এ এক মরূদ্যান, ধরতে গেলে সারা ভারতেই ছড়িয়ে আছে। পূর্ব আর উত্তর ভারতে ধাবার চেহারাগুলো মোটামুটি একই ধরনের। দোকানের ভেতরে কয়েকটা চেয়ার-টেবিল, বেঞ্চি আর সামনে বেশ কয়েকটা খাটিয়া।

হাইওয়ের ট্রাক-ড্রাইভারদের দিকে তাকিয়ে ধাবা বানানো। দশ-বিশ দিন, কখন-কখনও মাসখানেকের সফরে বেরিয়ে পড়ে অসংখ্য ট্রাক। ধাবার পাশেই আছে টিউবওয়েল, কুয়ো কিংবা তোলা জলের ব্যবস্থা। ট্রাক থামিয়ে হাতমুখ ধুয়ে ধাবায় ঢোকো অথবা সামনের খাটিয়ায় বসে পড়ো। অনেক রকমের গরমগরম সুস্বাদু খাবার আছে ধাবায়। তবে বেশির ভাগ ড্রাইভারই রুটি-তড়কা বা রুটি-মাংস পছন্দ করে। খাওয়ার পরে ওই খাটিয়াতেই সামান্য বিশ্রাম কিংবা ছোট্ট একটা ঘুম। তারপর আবার পথে। লম্বা সফর। ধাবা মানেই এইসব ড্রাইভারের কাছে কয়েক ঘণ্টার ঘরবাড়ি।

ইদানীং এইসব পথের ছোটখাটো বা মাঝারি সফরের গাড়িবাবুদের কাছেও ধাবা মুখ বদলাবার চমৎকার একটি জায়গা হয়ে উঠেছে। কেউ-কেউ আবার শহর ছেড়ে ধাবায় আসে খাওয়ার জন্যে। খাওয়া-দাওয়া, সেই সঙ্গে ছোট্ট একটা আউটিং। এক ঢিলে দুই পাখি।

খাটিয়ায় নয়, ধাবার ভেতরে একটি টেবিলে মুখোমুখি বসেছে কৌশিকরা। অর্ডার দেওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে এসেছে ধোঁয়াওঠা খাবার। রুটি, কাবাব, তড়কা আর মস্ত এক।

প্লেটভর্তি স্যালাড। এক জাগ জল আর তিনটে গ্লাস এসেছিল। ওগুলো সরিয়ে দিয়ে কোল্ডড্রিঙ্কসের তিনটে বোতল নেওয়া হয়েছে।

খাওয়ার ধরন দেখে বোঝা যায়, তিন জনেরই বেশ খিদে পেয়ে গিয়েছিল। নিঃশব্দে কিছুক্ষণ খাওয়ার পরে কৌশিক বলল, 'বাহ্! চমৎকার রান্না!'

বাকি দু'জন ওর কথায় খেতে খেতেই সায় দিল।

'আজ তো সকাল থেকেই আপনাদের ছোটাছুটি করতে হচ্ছে।'

মৃদু প্রতিবাদের গলায় মধুসূদন পুরকাইত বললেন, 'ছোটাছুটি তো সবচেয়ে বেশি করতে হচ্ছে আপনাকে। শুধু আজ বলে নয়, বেশ কয়েক দিন ধরেই চলছে। আমরা তো আপনার ছোটখাটো কয়েকটা হুকম তামিল করেই খালাশ।'

'না-না, এ কী কথা বলছেন! আপনি আমাকে অনেক খবর এনে দিয়েছেন। তার ওপর এই টানা নজরদারি। এই ভাবে দিনরাত্তির নজরদারি না চালালে এ খবরটা পেতাম না কিছুতেই।'

মধুসূদন মানুষটির বিনয়ের ঘাটতি হয় না কখনও। লাজুক মুখে বললেন, 'আমি আর বাড়তি কী করেছি! নজরদারি করা আমার কাজের মধ্যে পড়ে। যেমনটি বলেছেন, তেমনটি করেছি।'

'না-না, আপনার প্রতিটি কাজই নিখুঁত। আজকেরটা তো দারুণ। আচ্ছা, ওই ড্রাইভারকে বাগে আনতে আপনার কোনও অসুবিধে হয়নিতো?'

'না। আসলে ড্রাইভারের সঙ্গে গল্পে গল্পে একটু চেনাজানা বেরিয়ে যাওয়ায় আমার কাজের কিছুটা সুবিধে হয়েছিল।'

টম্যাটোর একটা টুকরো মুখে ফেলে কৌশিক বলল, 'ওহ্! এই ব্যাপারে তো পুরোটা শোনা হয়নি। আপনার প্রস্তাব শুনে কী বলেছিল ওই ড্রাইভার?'

'প্রথমে কিছুতেই রাজি হতে চায়নি। বলছিল, মালিক অত্যন্ত রগচটা স্বভাবের। পরে কোনও ভাবে যদি এই চালাকিটার কথা জেনে যায়, ওর চাকরি চলে যাবে। তখন খালেক খুব করে বোঝাল; খালেক না থাকলে মনে হয় রাজি করাতে পারতাম না কিছুতেই।'

পুলিশ মহলে গুপ্তচর খালেকের খুব সুনাম। ওর প্রধান কাজের জায়গা হল পার্ক স্ট্রিট, এলিয়ট রোড, সদর স্ট্রিট ইত্যাদি এলাকা। বাইশ-চব্বিশ বছর বয়েসের এই ছেলেটির মগজ খুব সাফ, চোখ-কান খোলা রেখে চলতে পারে সব সময়। ভাল হিন্দি-উর্দু-বাংলা আর কাজ চালাবার মতো ইংরেজি বলতে পারে।'

রুটির একটা টুকরো ছিঁড়ে তড়কায় মাখাতে মাখাতে কৌশিক তারিফ করার ভঙ্গিতে খালেকের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কী বলে রাজি করালে ড্রাইভারকে?'

খালেক হাসতে হাসতে বলল, 'বললাম—ভাই, তুমিও ড্রাইভার আমিও ড্রাইভার। মেহনতি লোক। মালিকরা আমাদের কথা থোড়াই বুঝবে!'

কৌশিক হাসতে হাসতে বলল, 'এ তো একেবারে পার্টি লাইন! তারপর?'

খালেকও হাসল। বলল, 'বললাম— আমার বুখার হলে তুমি আমার পাশে থাকবে, তোমার বুখার আমি তোমার পাশে। মালিক কি থাকবে? না, থাকবে না। মালিক কী করবে? না, তংখা কেটে নেবে।'

কৌশিক হেসে উঠে বলল, 'তুমি সামনের বার ইলেকশনে দাঁড়িয়ে যাও। ঠিক জিতে যাবে। তা, কাজ হল তোমার বক্তৃতায় ?'

খালেকও হাসছিল। 'না, তখনও হয়নি। তবে বুঝলাম, হবে। পাঁচটা দশ টাকার নোট হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললাম, এটা এখন রাখো। বাকি টাকা ট্রিপটা খেটে এসে দেব। আমরা সওয়ারি নিয়ে ওখানেই যাচ্ছি। সওয়ারি নেমে গেলে ওখানেই থাকব। আমাদের গাড়ির নম্বরটা দেখে নাও ভাল করে। ভেতরের রাস্তায় গাড়ি ঢুকিয়ে জোর একটা ব্রেক কষে গাড়ি দাঁড় করিয়ে দেবে। তারপর গাড়ির বনেট খুলে একটু উলটা-সিধা করে বলে দাও, গাড়ি খারাব, আর যাবে না।'

রুটির টুকরোটা মুখে পুরে দিয়ে কৌশিক বলল, 'তারপর ? রাজি হল ?'

'হবে না ? ও তো আগেই নোট খেয়ে নিয়েছে। রাজি তো ওকে হতেই হবে।'

'তারপর ?'

এবার আবার মুখ খুললেন মধুসূদন। 'বাগানবাড়ির পাঁচ কিলোমিটার আগে একটা শর্টকাট পথ আছে। খোয়াবাঁধানো পথ। ওখানে গাড়িটাড়ি বিশেষ চলে না। ওই পথে এক কিলোমিটার যাওয়ার পরে ইটভাটার পাশে এসে ওদের গাড়ি বিগড়ে গেল। একটু পরেই আমবা গিয়ে হাজির হলাম ওখানে। খালেক নেমে গিয়ে বলল—কলকাতায় ফিরছি, যদি যেতে চান তো নিয়ে যেতে পারি, তবে চারশো টাকা লাগবে। আমাদের দেখে হাতে স্বর্গ পেয়েছিল ওই মালিক। বলেছিল, ওই চারশো টাকাই দেব, তবে সামনে একটা বাগানবাড়ি আছে, ওখান থেকে ঘুরে যাব একবার। পনেরো-বিশ মিনিটের বেশি দাঁড়াতে হবে না। আমরা বাজি হয়ে গিয়েছিলাম।'

কৌশিকের খাওয়া থেমে গিয়েছিল। 'তারপরেই ওই কথাগুলো শুনলেন ?'

'হ্যাঁ।'

'পরশু ভোরে যে ওরা ওখানে যাবে, সেটাও কি তখনই শুনলেন ?'

'না, তখন নয়। ফেরার পথে।'

'সব কথা কি পরিষ্কার ভাষায় নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিল ?'

'না, কোথাও-কোথাও ঠারেঠোরে। তবে বুঝতে কোনও অসুবিধে হচ্ছিল না। আসলে আপানর পরামর্শমতো খালেক ওদের সঙ্গে হিন্দিতে কথা বলছিল। আমি আর মুখ খুলিনি। মাথায় একটা গামছা বেঁধে নিয়েছিলাম। আমাদের দুজনকে হিন্দুস্থানি ভেবে নেওয়ায় ওরা বোধহয় একটু বেশিই খোলামেলা ভঙ্গিতে কথাবার্তা চালিয়েছিল।'

'নামল কোথায় ?'

'এসপ্লানেডে।'

'নেমে কি ট্যাক্সিস্ট্যান্ডের দিকে গিয়েছিল ?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'ঠিক কাজই করেছে। যদিও ধরে নিয়েছে আপনারা এই ব্যাপারে নিরীহ, তবুও বাড়ি চেনাবার ঝুঁকি নেয়নি।'

খালেক বলল, 'গাড়ির ওই মালিকের মুখ খুব গন্দা। কথায় কথায় খিস্তি করছিল। জওয়ান ছোকরাটাও বহোত্ ঢৌঁটিয়া।'

কৌশিক জিজ্ঞেস করল, 'এদের কি তুমি আগে কোথাও দেখেছ?'

'না স্যার, আমার এলাকায় ধান্দা করে না। ওখানে কিছু করলে আমার কাছে ঠিক খবর চলে আসত।'

খাওয়া-দাওয়া সেরে মিনিট-কুড়ি বাদে ধাবা থেকে বেরিয়ে পড়েছিল তিনজন। রাতের হাইওয়ে ধরে গাড়ি ছুটে চলেছিল কলকাতার দিকে। গাড়ি চালাচ্ছিল খালেকই। প্রশংসা করার গলায় কৌশিক বলল, 'বাহ্! তোমার হাত তো বেশ পাকা খালেক। গাড়ি ভাড়া করলে কোত্থেকে?'

'আমাদের মহল্লা থেকে স্যার, ওয়েলেসলি।'

'গাড়ি ভাড়া, তেলের হিসেব, অন্যান্য সব খরচখরচা—লিখে রাখছ তো?'

'ও নিয়ে আপনি একদম ভাববেন না স্যার, আপনার সঙ্গে কি আমরা নতুন কাজ করছি!'

কৌশিক হেসে বলল, 'তোমাদের পেমেন্টের ব্যাপারে উপস্থিত আমি না ভাবলে আর কে ভাববে? যাক, কাল-পরশু গাড়িটা তো লাগছেই। ভুল করে আবার ছেড়ে দিও না।'

'না স্যার।'

'পরশুদিন যেখানে যে ভাবে চলে আসতে বলেছি, চলে আসবে কিন্তু তোমরা।'

'ঠিক আছে স্যার।'

ব্যস, আর কোনও কথা নয়। ব্যাক সিটে হেলান দিয়ে চোখ বুজল কৌশিক। ওকে এখন দেখলে যে-কেউ ধরে নেবে, রাতের সওয়ারি দিব্যি একটা ঘুম মারছে। কিন্তু গাড়ির সামনের সিটের দুজন খুব ভালভাবেই জানে—ঘুম এখন এই মানুষটার চোখের ত্রিসীমানার মধ্যে নেই। মাথার মধ্যে নানান কঠিন অঙ্ক কষা চলছে একটার পরে একটা।

কপাল ভাল, রাস্তার কোথাও কোনও জ্যাম ছিল না। গাড়ি যথাসময়ে ঢুকে পড়ল কলকাতায়। খালেক জিজ্ঞেস করল, 'আপনাকে কোথায় নামাব স্যার? বাড়িতে তো?'

'না-না, অবনীদার কোয়ার্টার্সে।'

মিনমিন করে মধুসূদন বললেন, 'বেশ রাত হয়ে গেছে, তারপর সারাদিনে পরিশ্রমও তো কম হয়নি—। আমি বলছিলাম কি, এখন বাড়ি ফিরে ঘুমিয়েটুমিয়ে কাল ভোর-ভোর গেলে হত না কি—!'

একটু হেসে জবাব দিল কৌশিক, 'আমার সঙ্গে অবনীদার কথা হয়ে আছে, যত রাতই হোক না কেন—একবার যেতে হবে। আপনারা আমাকে নামিয়ে দিয়ে চলে যান। আমার বাড়ি ফেরার ব্যবস্থা অবনীদাই করবে।'

'আমি কিন্তু আমাদের বাড়ি ফেরার কথা ভেবে কথাটা বলিনি স্যার।'

'কী আশ্চর্য! আমি কি তাই বলেছি! আমি আধ ঘণ্টার মধ্যেই অবনীদার ডেরা থেকে কেটে পড়ব। আপনারা বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম নিন।'

আধ ঘণ্টা নয়, পাক্কা পঁয়তাল্লিশ মিনিট বাদে ইন্সপেক্টর অবনী ঘোষরায়ের কোয়ার্টার্স থেকে বেরিয়ে সাহেবের জিপে চেপে নিজের ফ্ল্যাটের দিকে রওনা দিল গোয়েন্দা।

অন্যান্য সময় বেশি রাতে বাড়ি ফিরলে ঘুমকাতুরে নিমোর ঘুম চটপট ভাঙাবার জন্যে

কৌশিক ডোরবেলের বোতামে বেশ কিছুক্ষণ আঙুল চেপে রাখে। কিন্তু আজ ও খুব আস্তে আস্তে বার-চারেক আঙুল ছোঁয়াল বোতামে।

নিমোর ঘুম খুব একটা গাঢ় হয়নি—এটাই বাঁচোয়া। ওই চারবারের সামান্য ছোঁয়াতেই চোখ রগড়াতে রগড়াতে দরজা খুলল নিমো, তারপর একটু অভিভাবকগিরি ফলাবার গলায় বলল, 'আজ ফিরতে যে এত রাত্তির হল!'

কৌশিক সঙ্গে সঙ্গে ওর মুখ চেপে ধরে বলল, 'মাঝরাত্তিরে ষাঁড়ের মতো চেঁচাস না। পাশের ঘরে অতিথি ঘুমোচ্ছে। দাদু-দিদিমার খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেছে তো ঠিকমতো?'

'হ্যাঁ; দাদুকে অনেকক্ষণ আগে খাইয়ে দিয়েছি।'

'আর দিদিমা?'

নিমো কেমন যেন একটু গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, 'হ্যাঁ, বৌদিও খেয়ে নিয়েছে।'

অনেক কষ্টে হাসি চাপল কৌশিক। একাশি বছর বয়সের রাধাগোবিন্দকে দাদু বলে মেনে নিতে নিমোর কোনও আপত্তি নেই; কিন্তু রোগা ছিপছিপে প্রায় সমবয়সী মেয়েটিকে কিছুতেই ও দিদিমা বলবে না। উনি দাদু আর এ হল গিয়ে বৌদি।

নিজেকে সামলে নিয়ে কৌশিক জিজ্ঞেস করল, 'বৌদির সঙ্গে গল্প হয়েছে তোর?'

'হ্যাঁ, অনেক গল্প। আমরা আজ লুডো খেললাম অনেকক্ষণ ধরে।'

'লুডো! লুডো পেলি কোথায়?'

'বৌদি নিয়ে এসেছে।'

'নিয়ে এসেছে! কার সঙ্গে খেলবে বলে?'

'দাদুর সঙ্গে।'

'দাদু খেলেছিল?'

'না, দাদু রাত্তিরে রঙ চিনতে পারে না বলে খেলেনি। তোমার খাবার কি গরম করে দেব?'

'না, খাবার ফ্রিজে তুলে রেখে শুয়ে পড়, আমি বাইরে থেকে খেয়ে এসেছি।'

দু হাত ওপরে তুলে লম্বা একটা হাই তুলল কৌশিক, তারপর শোবার ঘরের দিকে পা বাড়াল।

।। তেইশ ।।

সারাদিন ধরে খুব ধকল গেলে বিছানায় পড়ামাত্তরই ঘুম এসে যায়। তার ওপর কাল আবার শুতে শুতে একটু রাত্তিরও হয়ে গিয়েছিল গোয়েন্দার। কিন্তু প্রগাঢ় ঘুম যথারীতি ভেঙে গেল ভোরবেলায়।

একটু-আধটু করে অন্ধকার সরে গিয়ে আস্ত একটা ভোর হওয়ার দৃশ্য দেখতে কৌশিকের খুব ভাল লাগে। এ দৃশ্য বোধহয় কখনওই পুরনো হওয়ার নয়। কিন্তু জানলার সামনে দাঁড়িয়ে কিংবা ঝুলবারান্দায় চেয়ার টেনে নিয়ে গিয়ে বসে এ সব দেখার মতো সময় এখন ওর হাতে থাকে না। প্রকৃতির এই রূপান্তর ঘটার সময় ওর ব্যায়াম চলে।

ব্যায়ামের ফাঁকে ফাঁকে জানলা বা বারান্দা দিয়ে বাইরে চোখ চলে যায় ওর। লালচে ভোর আস্তে আস্তে হলুদ হয়ে ওঠে। দূরের অস্পষ্ট সব দৃশ্য আস্তে আস্তে স্পষ্ট হতে থাকে। তবে মগজের নিয়মটা ভারী অদ্ভুত। কখনও থেমে থাকে না। নিজের মতো ঠিক কাজ করে যায়। আজ গোয়েন্দার মগজ বোধহয় একটু বেশিই কাজ করছিল। সব দিক থেকেই আজকের দিনটা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

ব্যায়াম শেষ হওয়ার পরে সওয়া-ছটার সময় বাঙ্গালোর পুলিশের ডি সি ডি ডি ওয়ানকে টেলিফোনে ধরল কৌশিক। "গুডমর্নিং মিলনদা, ঘুম ভাঙিয়ে দিলাম না তো?'

মিলন চৌধুরী হেসে বললেন, 'গুডমর্নিং। আমি যে ক'টা মোরাল টেক্সটবুক লেসনস মেনে চলার চেষ্টা করি, তার একটা হল—আর্লি টু বেড আর্লি টু রাইজ—। কাজের চাপ পড়লে অবশ্য এই নীতিশিক্ষার প্রথম দিকটা মানতে পারি না, কিন্তু শেষের অংশটা মেনে চলার ব্যাপারে খুব একট অসুবিধে হয় না। তা, তোমার কী খবর বলো?'

'এদিককার খবর সব ঠিক আছে, পরিকল্পনা অনুসারেই চলছে। আপনার ওদিককার খবরাখবর বলুন—। শর্মাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন?'

'হ্যাঁ করেছি। ইন্টারোগেশনের গোড়ার দিকে ও খুব রেজিস্ট করছিল। কিন্তু তোমার দেওয়া লাইনে যেতেই খুব কাজ হয়েছে। তুমি যা অনুমান করেছিলে সেটা ঠিক। প্লাস কিছু বাড়তি ইনফর্মেশনও পেয়েছি। ঠিক সময়ে জানিয়ে দেব।'

'আপনার প্রোগ্রাম ঠিক আছে তো?'

'হ্যাঁ, পাক্কা।'

'গাঙ্গুলির?'

'হ্যাঁ। কাল তুমি ফোন করার পরেই ও ফোন করে কনফার্ম করেছে।'

ও দিকে আর একটা লাইনে টেলিফোন বাজার শব্দ এ দিকে ভেসে আসতেই কৌশিক বলল, 'ঠিক আছে, এখন ছাড়ছি তা হলে মিলনদা।'

'ও কে। বাই!'

টেলিফোন নামিয়ে রেখে চটপট তৈরি হয়ে ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে গেল কৌশিক।

ওদিকে সকাল থেকেই তৎপরতা শুরু হয়ে গিয়েছিল মুখার্জিবাবু আর কমলেশের মধ্যে। নিছকই রেজিস্ট্রি-ম্যারেজ। লোকজন বলতে দশ-বারোজন মাত্র। এটুকু সামলানো কঠিন কাজ নয়। কিন্তু উদ্যোগ-আয়োজন যত কমই হোক না কেন—এটা তো একটা বিয়ে। আর 'বিয়ে' শব্দটা মাথায় খেলে যেতেই অতিমাত্রায় দায়িত্বশীল কন্যাকর্তা মুখার্জিবাবু নড়েচড়ে বসেছিলেন। মেয়ের বিয়ে বলে কথা, তা সে যে ভাবেই হোক না কেন।

একজন বয়স্ক মানুষ নিজেকে দায়িত্বশীল আর অল্পবয়সীদের অর্বাচীন ভেবে একধরনের আত্মপ্রসাদ পেয়ে থাকেন। এই ব্যাপারটাও মুখার্জিবাবুর মধ্যে খেলে যাচ্ছিল বারবার। মা-মরা মেয়ে শ্রবণা, বাবা অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে নার্সিংহোমে। তার মানে মেয়েটির

মাথার ওপরের আসল ছাতটাই তো নেই এখন। মামা ভদ্রকের কাজকর্ম ফেলে রেখে ছুটে এসেছে কলকাতায়, কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে ভাগনির বিয়ে ঠিক করে ফেলেছে চটপট। বিরাট কাজ, কোনও সন্দেহ নেই; কিন্তু কোথায় যেন কেমন একটু ছাড়া-ছাড়া ভাব। আসলে এটাকেই বলে বোধহয় অনভিজ্ঞতা।

ওটা দূর করার জন্যে মনে মনে নিজেকে বেশ একটু গুছিয়ে নিলেন মুখার্জিবাবু। কিন্তু গুছিয়ে নিয়েও খুব একটা লাভ হল না। শরীরের মধ্যে অকারণ ব্যস্ততা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিল বারবার। একই কথা বললেন বেশ কয়েকবার।

সাতসকালেই চলে এসেছেন মিন্টো পার্কের গেস্টহাউসে। গেস্টহাউসটা বেশ বড়। পাঁচটা লিভিং রুম, সিটিং-কাম-ডাইনিং তো পেল্লায়। দোতলায় অ্যাপার্টমেন্ট। সামনে প্রধান দরজা। পেছনে খিড়কি, সঙ্গে লাগানো ঘোরানো সিঁড়ি। পেছনের পথটা ধরেই সুইপার যাতায়াত করে।

আজ সুইপার আসতেই বেশ একটু হাঁকডাক শুরু করে দিলেন মুখার্জিবাবু: ইহা থোড়া বঢ়িয়া করকে সাফা করো। কেয়া বাত্। ইহা সাফ্ কিয়া, তব্ ভি গর্দা! নাহ্! আসলে বাত্ এহি হায় কি—তোমাদের কাজ দেখার লোক নেই, আর তোমরা তার অ্যাডভান্টেজ লেতা। জলদি করো, আজ বাড়িতে ফাংশান হ্যায়।

হম্বিতম্বি করতে করতে অ্যাপার্টমেন্ট সাফসুফ করিয়ে নিলেন মুখার্জিবাবু। একটু চেঁচামেচি করার ফলে শরীরের উদ্বেগ-উত্তেজনা কিছুটা বেরিয়ে গেল। এর ফলে একটু স্বস্তি বোধ করলেন, কিন্তু কাজের বাড়িতে উদ্বেগ-উত্তেজনা একটানা থামিয়ে রাখার কোনও উপায় নেই। নানা পথেই ওটা বেড়ে ওঠে।

মুখার্জিবাবু হঠাৎ গম্ভীর মুখে বললেন, 'কমলেশবাবু, একটা কথা—।'

ওঁর কথা বলার ভঙ্গিতে কমলেশ একটু অবাকই হয়েছিলেন। 'কী কথা?'

'রেজিস্ট্রি করে বিয়ে, বাইরের নিমন্ত্রিত বলে আজ তেমন কেউ থাকছে না। জানি ভবিষ্যতে আপনারা এই উপলক্ষে মস্ত বড় পার্টি দেবেন, কিন্তু—।'

'কিন্তু'টা কী নিয়ে, কিছুই বুঝতে পারলেন না কমলেশ। তার ফলে অবাক চোখে মুখার্জিবাবুর দিকে তাকিয়েই রইলেন।

মুখার্জিবাবু ভারিক্কি চালে বললেন, 'যত সামান্য ভাবেই সব কিছু সারা হোক না কেন, আফটার অল এটা একটা বিয়েবাড়ি তো—। আমি বলছিলাম কি—এর জন্যে অবশ্য আপনাকে কোনও ঝক্কিঝামেলা নিতে হবে না, সব দায় আমার—।'

মুখার্জিবাবু কী বলতে চান বা করতে চান তার কিছুই বিন্দুমাত্র পরিষ্কার হয়নি কমলেশের কাছে।

কেশে গলা পরিষ্কার করে মুখার্জিবাবু বললেন, 'আমি একটু আসছি।'

'কোত্থেকে?'

'কাছেই ডেকরেটারের একটা দোকান আছে, সেখানে একবার যাব। লিন্ডসে স্ট্রিটে গ্লোব নার্সারির দোকান—সেখানেও যাব একবার।'

'কেন?'

এ বার একটু বিরক্ত হয়ে উঠে মুখার্জিবাবু বললেন, 'শ্রবণার বিয়ে উপলক্ষে এই ফ্ল্যাটের পাঁচটা ঘরের দরজায় যদি পাঁচটা লাল মখমলের পর্দা টাঙানো হয়, পাঁচটা ঘরের দেয়ালে যদি কয়েকটা ফুলের তোড়া ঝোলে, ফুলদানিতে যদি কিছু ফুল থাকে---আপনার আপত্তি আছে কি ?'

লজ্জা পেয়ে কমলেশ বললেন, 'কী আশ্চর্য! আমার আপত্তি থাকবে কেন ?'

'ব্যস, তা হলে আমি আসছি।' লম্বা-লম্বা পা ফেলে অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে গেলেন মুখার্জিবাবু।

ফিরে এলেন ঘন্টাদেড়েক বাদে হাসিখুশি মুখে। 'যাক নিশ্চিন্দি, দুটো জায়গাতেই অর্ডার প্লেস করে দিয়েছি, ওরা সময়মতো চলে আসবে। আচ্ছা—।'

ব্যস্ত মানুষটির দিকে তাকিয়ে কমলেশ জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ?'

'আপনি কেটারারকে কজনের খাবার দিতে বলেছেন ?'

'পনেরোজন।'

'পনেরোজন! কুলোবে ?

'সব মিলিয়ে আমাদের লোক হবে দশ-বারো, আমি পনেরোজনের খাবারের অর্ডার দিয়েছি।'

'আমি বলছিলাম কি— ।'

'কী ?'

'কাজের বাড়ি বলে কথা—। নানা কারণে দু-পাঁচজন বাড়তি লোক এসে যেতে পারে। পনেরোটার জায়গায় কুড়িটা, কুড়িটা ফুল ডিশের কথা বলা যায় না কি ?'

'কেন যাবে না! কেটারারের টেলিফোন নাম্বার আছে আমার কাছে, এক্ষুনি ফোন করে বলে দিচ্ছি।'

মুখার্জিবাবুর মুখে হাসি ফুটল আবার, কিন্তু পরক্ষণেই একখণ্ড মেঘ। 'আচ্ছা —।'

'আবার কী ?'

'না, এটা অবশ্য মেয়েলি ব্যাপার, তবু—।'

'কোন্‌টার কথা বলছেন আপনি ?'

'শ্রবণার তো দুপুরে পার্লারে সাজতে যাওয়ার কথা —। ওর সঙ্গে ওর একজন বান্ধবীটান্ধবি থাকলে ভাল হত না কি ?'

'হত, কিন্তু এখানে তো ওর কোনও বন্ধু-বান্ধবী নেই। তবে এ নিয়ে আপনি ভাববেন না—। এইটুকুন বয়েস থেকে ও হস্টেলে-হস্টেলে মানুষ, একা-একা চলাফেরা করে কাজকর্ম সারার সব দায়িত্বই ও নিতে পারে।'

গলা নামিয়ে মুখার্জিবাবু বললেন, 'কিন্তু মায়ের ওই ভারী-ভারী গয়না পরার ব্যাপারটা তো বাড়িতেই হচ্ছে—।'

'অবশ্যই। ও শুধু মায়ের দেওয়া বেনারসিটা পার্লার থেকে পরে আসবে।'

'খুব ভাল কথা। ছোটবেলায় শেখা ওই ইংরেজি কথাটা কিন্তু সব ব্যাপারেই খেটে যায়। ওই যে বলে না— প্রিভেশান ইজ বেটার দেন কিউয়োর। এখানে পুলিশ পোস্টিং হওয়ার কথা বেলা সাড়ে-তিনটেয়, শ্রবণা যেন গয়নাগাটি তার পরেই পরে। লাখ-দশেক টাকার গয়না বলে কথা!'

মুখার্জিবাবুর কথায় সায় দিলেন কমলেশ। 'ঠিক বলেছেন। আসলে এই গয়নাটয়না পরার ব্যাপারটা আজ না থাকলেই ভাল হত।'

আবার একবার দায়িত্বশীল অভিভাবকের মতো চোখমুখ হয়ে উঠল মুখার্জিবাবুর। 'আপনার দিদির শেষ ইচ্ছে—। আপনার জামাইবাবু সেটা যদি মানতে চান— তার ওপর উনি এখন আবার অসুস্থ—অসুস্থ হলে মানুষ একটু বেশি মাত্রায় সেন্টিমেন্টাল হয়ে ওঠে। যাকগে, আমরা যথেষ্ট সাবধানতা তো নিয়েছিই। গয়না পরে শ্রবণা তো আর বাইরে যাচ্ছে না। কাল এয়ারপোর্টে যাওয়ার আগে ওগুলো হ্যান্ডব্যাগে ভরে নিলেই হল। তা হলে আর কী কাজ বাকি থাকল ? আমি বরং ম্যারেজ-রেজিস্ট্রারকে আর একটা তাগাদা দিয়ে আসি—।'

'কী দরকার! কাল বিকেলেই তো ভদ্রলোককে মনে করিয়ে দিয়েছেন। তার ওপর টাকা অ্যাডভান্স করা আছে।'

'ঠিকই। কিন্তু অ্যাপয়েন্টমেন্টের কথা মনে করিয়ে দেওয়া তো কোনও অপরাধ নয়।'

'মনে করিয়ে দেওয়ার কাজটা তা হলে টেলিফোনে সেরে নিন।'

'না-না, রেজিস্ট্রার মনে হয় একটু কানে খাটো। টেলিফোনে বলব এক, বুঝবেন আর এক। হয়তো ধরে নেবেন বিয়ের তারিখ পিছিয়ে যাওয়ার কথা জানাবার জন্যেই ফোন করছি। অকারণ ঝুঁকি নেওয়ার কোনও দরকার নেই। কতটুকুই বা পথ। আমি চট করে একবার ঘুরেই আসি।'

রেজিস্ট্রারের অফিস এখান থেকে একটু নয়, অনেকটা পথ, কিন্তু কমলেশ এটা পরিষ্কার বুঝে গিয়েছিলেন; যুক্তিতর্ক দিয়ে মানুষটিকে এই মুহূর্তে আটকানো অসম্ভব। বেশ চড়া রোদ উঠেছে, কিন্তু মুখার্জিবাবু এই রোদের পরোয়া না করে পথে বেরিয়ে হনহন করে হাঁটতে শুরু করে দিলেন বাস-রাস্তার দিকে।

এ বার ফিরলেন বেশ কিছুটা সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরে—তিনটের সময়। ওঁর পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি। একটু লাজুক-লাজুক মুখে বললেন, 'ওদিকের কাজকর্ম সেরে একেবারে তৈরি হয়েই চলে এলাম। এখান থেকে কখন ছাড়া পাব কে জানে!'

জবাবে কমলেশ বললেন, 'আপনাকে আজ আর ছাড়া হচ্ছে না। ধুতি-পাঞ্জাবিতে বেশ লাগছে কিন্তু আপনাকে। আপনিই আসল কন্যাকর্তা।'

গলা ছেড়ে হেসে উঠলেন মুখার্জিবাবু। 'যা বাজার পড়েছে, এই বাজারে নকলরাই আসল। আপনারা সাহেবসুবো লোক, বাঙালির এত সুন্দর পোশাকটা এখন আর পালাপার্বণেও ছুঁয়ে দেখেন না।'

কথাটা শেষ করেই উনি চঞ্চল হয়ে উঠলেন আবার। 'আচ্ছা, ডেকরেটার আর নার্সারির লোকেদের তো এসে যাওয়ার কথা। আসেনি ?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, এসে গেছে, ভেতরের ঘরে কাজ করছে।'

'যাক। ম্যারেজ-রেজিস্টার আসছেন পাঁচটায়। পাত্রপক্ষের কখন আসার কথা ?'

'ওই তো, সাড়ে-চারটে পাঁচটার মধ্যে।'

'কে কে আসছেন ওরা ?'

'তিনজন। পাত্র আর পাত্রের বাবা-মা। আমি পাত্রের বাবা-মাকে রাত্তিরটা থেকে যাওয়ার ব্যাপারে মত করিয়েছি। বলেছি, সকাল সাতটায় দিল্লির ফ্লাইট। রিপোর্টিং ছটায়। তার

মানে মেয়ে-জামাইকে নিয়ে আমাকে বেরুতে হচ্ছে ভোর পাঁচটায়। আপনারা আপনাদের ছেলে আর ছেলের বউকে রওনা করিয়ে দিয়ে যাবেন। বুঝতেই পারছেন, আমি এখানে একেবারে একা—। তো, রাজি হয়েছেন শেষ পর্যন্ত। এখানে এসে গাড়িটা ছেড়ে দেবেন। সেই গাড়ি ওঁদের আবার নিতে আসবে কাল ভোর পাঁচটায়। ফ্লাটে তালা লাগিয়ে বেরিয়ে পড়ব একসঙ্গে।'

'বাহ্! এটাস ভাল ব্যবস্থা। পুলিশ গার্ড এসেছে?'

'না, এখনও—।'

কমলেশের কথাটা শেষ হওয়ার আগে দপ করে জ্বলে উঠলেন মুখার্জিবাবু—'এদের সত্যি কথার কোনও ঠিক নেই!'

'না-না, ব্যস্ত হবেন না। আসার সময় হয়নি তো এখনও। আসার কথা সাড়ে-তিনটেয়, এখনও তো মোটে তিনটে দশ।'

'মোটে তিনটে দশ! তিনটে দশ থেকে সাড়ে-তিনটেয় পৌঁছতে ঘড়ির কাঁটার বেশিক্ষণ সময় লাগে না। শ্রবণা? শ্রবণা কোথায়?'

'বিউটি পার্লারে।'

'এখনও ওখানে!'

কমলেশ এ বার বেশ খোলামেলা গলায় হেসে উঠে বললেন, 'এই একটি জায়গায় মেয়েরা পাঁচ মিনিট বলে অনায়াসে পাঁচ ঘণ্টা সময় নিতে পারে। আমার বা আপনার এই নিয়ে কিছু বলা একেবারেই অর্থহীন। আপনি বসুন, একট চা খান।'

ঠিক সাড়ে-তিনটের সময়ই সাদা পোশাকের পুলিশ গার্ড এসে গেল। মুখার্জিবাবু খুব নিচু গলায় লোকটির সঙ্গে কথা বলে এসে আরও নিচু গলায় কমলেশকে বললেন, 'যাক নিশ্চিন্দি, গার্ডের সঙ্গে আর্মস আছে। প্রথমে বলতে চাইছিল না কিছু। পরে যখন বললাম, আমি তোমার সাহেবের বন্ধু, আমি নিজেও এই পেশায় আছি—তখন বলল।'

চারটে বাজতে পাঁচে মারুতি চেপে শ্রবণা ফিরল। মেরুন রঙের বেনারসি-পরা পার্লার থেকে সেজে-আসা শ্রবণার রূপ যেন ফেটে পড়ছিল।

মুখার্জিবাবুকে একটু বুঝি বিহ্বল দেখাচ্ছিল, বিহ্বল মানুষের গলাতেই বললেন, 'তোমাকে কী সুন্দর দেখাচ্ছে! কী বলে তোমাকে আশীর্বাদ করি বলো তো? তুমি রাজরানি হও মা।'

খিলখিল করে হেসে উঠে শ্রবণা বলল, 'আমি ঠিক এই ভয়টাই পাচ্ছিলাম কাকু। তুমি মাঝেমাঝে এমন এক-একটা সেকেলে কথা বলে ফেল না। তোমার আশীর্বাদ ফললে তো মেয়েদের বিয়ে হওয়াই কঠিন হয়ে পড়বে। দেশে তো রাজাই নেই, রাজরানি হব কী ভাবে আমরা?'

হেসে উঠলেন মুখার্জিবাবু। 'রাজকন্যে থাকলেই ঠিক রাজপুত্তুর এসে জোটে। আর রাজপুত্তুররা বিয়ে করলে আজ হোক কাল হোক, ঠিক রাজা হয়ে যায় একদিন। তখন তোমাদের আর রাজরানি হওয়া আটকাচ্ছে কোথায়!'

"ঠিক আছে, রাজরানি হওয়ার দিকে তা হলে আরও কিছুটা এগিয়ে থাকি। মা'র গয়নাগুলো পরে নিই। অতগুলো গয়না, পরতেও তো সময় লেগে যাবে অনেকটা।"

কমলেশ হেসে উঠে বসলেন, 'শুধু পরা নয়, আয়নার সামনে ঘুরেফিরে ওগুলো দেখাও তো আছে।'

'বাহ! দেখব না? একশোবার দেখব। মেয়েরা সাজে প্রথমে নিজেকে নিজে দেখার জন্যে। তোমাদের দেখা তো পরের দেখা।'

রূপসী শ্রবণা হাসতে হাসতে ওদিকের ঘরে ঢুকে পড়ে দরজা দিয়ে দিল।

সদর দরজাসমেত অ্যাপার্টমেন্টের সব ক'টা দরজার মাথায় লাল মখমলের পর্দা ঝুলে গেছে। ফুল দিয়ে বানানো বাহারি ডিজাইন ঝুলেছে ঘরের দেয়ালে-দেয়ালে। প্রতিটি ঘরেই ফুল-উপছে-পড়া ফুলদানি। বর-কনের জন্যে রজনীগন্ধার দুটো মোটা মালা শালপাতা দিয়ে বাঁধা আছে একধারে।

বরপক্ষ এল পৌনে পাঁচটায়। বরপক্ষ মানে বর আর তার বাবা-মা। বরের গাড়িতে ফুলের চিহ্নমাত্র নেই। কিন্তু মুখার্জিবাবু অনেক কিছুর অভাব বোধ করছিলেন একই সঙ্গে। যেমন, বর এসেছে অথচ শাঁখ বাজল না। বরকে বরণ করার জন্যে কেউ এগিয়ে গেল না। আসলে এটা যে নেহাতই সই-করা একটা বিয়ের অনুষ্ঠান—এই ব্যাপারটা মেনে নিতে ওঁর বেশ কষ্ট হচ্ছিল। তবে বরকে দেখে আর একবার বিহুল হলেন মুখার্জিবাবু। সত্যি, বাঙালিদের মধ্যে এমন রূপবান খুব কম দেখা যায়! পরনে কাজ-করা তসরের পাঞ্জাবি আর পাজামা। পাজামার জায়গায় ধুতি হলে আরও ভাল হত। তবে সে যাই হোক, সাহেবদের মতো স্যুট পরে আসেনি—এটাই বাঁচোয়া। আসলে শ্রবণা মেয়েটিকে এই ক'দিনে বড্ড বেশি ভালবেসে ফেলেছেন ওর মুখার্জিকাকু। বরকনেকে দুহাত তুলে আশীর্বাদ করার ইচ্ছেয় ভেতরে ভেতরে একটু বুঝি অধীর হয়ে উঠেছিলেন উনি।

কমলেশ এগিয়ে গিয়ে আপ্যায়ন করে নিয়ে এলেন পাত্রপক্ষকে।

একটু বাদে আবার তৎপর হয়ে উঠেছিলেন মুখার্জিবাবু। খুব সমাদরের সঙ্গে তিনজনকে বসালেন সোফায়। 'পথে কোনও কষ্ট হয়নি তো?'

'না-না, কষ্টের কী আছে। এইটুকুন তো পথ। ভবানীপুর থেকে মিন্টো পার্ক, রাস্তা মোটামুটি ফাঁকাই ছিল।' একটু লাজুক মুখেই মুখার্জিবাবুর প্রশ্নের উত্তর দিলেন ছেলের বাবা জ্যোতির্ময় সেন। ছেলে দিব্যজ্যোতি মাথা সামান্য নিচু করে বসে ছিল। ছেলের মা খুবই কম কথা বলেন। একটু বড় করে ঘোমটা টানা। হাসিখুশি মানুষ। মুখার্জিবাবু প্রায় একতরফা গল্প জুড়ে দিয়েছিলেন, ওঁর বেশির ভাগ কথাতেই হাসি মুখে সায় দিচ্ছিলেন ভদ্রমহিলা।

ইতিমধ্যে দুটি ফোন এসেছে কমলেশের কাছে। একটি ইন্সপেক্টর ঘোষরায়ের—জরুরি একটা তদন্তের কাজে ছুটতে হচ্ছে ওঁকে, বোধহয় আজ আর আসতে পারবেন না। দ্বিতীয় ফোন কৌশিকের, যে-কোনও মুহূর্তে হাজির হয়ে যাবে। অ্যাপার্টমেন্টে বাইরের অতিথি বলতে ভদ্রক থেকে আসা কমলেশের দুই বন্ধু, তবে ওঁরা এখানে রাত্তিরে থাকতে পারবেন না।

বেশ কয়েকটা হট পট, রুপো আর চিনেমাটির বাসনপত্তর নিয়ে হাজির হয়ে গেছে কেটারারের তিনজন লোক। এসেই ওরা কাজে লেগে পড়েছে।

পাঁচটা কুড়ি নাগাদ ম্যারেজ রেজিস্ট্রার এলেন। ওঁর পিছু-পিছু কৌশিক। বারবার হাতঘড়ির দিকে তাকাচ্ছিলেন ছেলের বাবা। একটু ইতস্তত করে বললেন "পঞ্জিকায় দেখছিলাম এই সময়টা খুব শুভ সময়। শ্রবণা মা'র কি তৈরি হতে আর একটু সময় লাগবে?"

'না-না, ও তো তৈরি হয়েই আছে। ডাকছি।'

কমলেশ গিয়ে ভাগনির ঘরের দরজায় খুব আস্তে টোকা মারলেন বারদুয়েক। দরজা

খুলে যেতেই ফিসফিস করে কী যেন বললেন, তাই শুনে শ্রবণা মাথা সামান্য নিচু করে ধীর গতিতে এগিয়ে এসে হবু শ্বশুর-শাশুড়িকে প্রণাম করল। দুজনেই বুকে টেনে নিয়েছিলেন ভাবী পুত্রবধূকে।

সই-করা বিয়ে, কোনও বাড়তি আয়োজন নেই। রেজিস্ট্রার খাতাপত্তর তৈরি করেই এনেছিলেন। পাত্রকে বললেন, 'আপনি এখানে সই করুন---পুরো নাম।'

পাত্রের সই করা হয়ে গেলে পাত্রীকে বললেন, 'আপনি এখানে। পুরো নাম।'

পাত্র-পাত্রীর সই হয়ে গেলে রেজিস্ট্রার বললেন, 'এবার দুই সাক্ষীর সই দরকার।'

কমলেশ ছেলের বাবার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনি তা হলে প্রথম সইটা দিয়ে দিন।'

জ্যোতির্ময়বাবু বললেন, 'পরে আমাদের প্রাচীন হিন্দুমতে বিয়ের একটা অনুষ্ঠান তো হবেই, যাকে বলে অগ্নিসাক্ষী রেখে বিয়ে--- সেই বিয়েতে সম্প্রদানের কাজটা মনে হয় আমাকেই করতে হবে, আমি এখানে আর নাই বা সই করলাম।'

'বেশ, আমিও তা হলে রিজার্ভ ফোর্সে থেকে যাচ্ছি। এখানে প্রথম সই করুক মুখার্জিদা, দ্বিতীয় সইটা করবে কৌশিক।'

মুখার্জিবাবু চোখে চশমা এঁটে গোটা গোটা হরফে নিজের নাম সই করে দিলেন। পরের সইটা করল কৌশিক।

ম্যারেজ-রেজিস্ট্রার এইচ কে চট্টরাজ হঠাৎ গলার স্বর কয়েক পর্দা ওপরে তুলে বললেন, 'অভিনন্দন শ্রীযুক্ত দিব্যজ্যোতি সেন, অভিনন্দন শ্রীমতী শ্রবণা সেন। আপনারা এখন থেকে বৈধ স্বামী-স্ত্রী রূপে স্বীকৃত হলেন। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, আপনাদের দাম্পত্যজীবন সুদীর্ঘ এবং সুমধুর হোক। একটু ফুলটুল নেই?'

মুখার্জিবাবু প্রায় চেঁচিয়ে উঠে বললেন, 'কেন থাকবে না, এক্ষুনি আসছি।'

শালপাতার মোড়া রজনীগন্ধার মস্ত মালা দুটো উনি নিয়ে এলেন।

রেজিস্ট্রার অভ্যস্ত হাতে শালপাতার ওপরের সুতোর বাঁধন পটপট করে ছিঁড়ে ফেলে দুটো মালা বার করে নতুন বর-বউয়ের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, 'আপনারা মালা বদল করে নিন।'

শাঁখ নেই, উলু নেই; কৌশিক, মুখার্জিবাবু, কমলেশের দুই বন্ধুর উচ্ছ্বাস ও এলোমেলো হাততালির মধ্যে সাঙ্গ হল তিন দফা মালা বদলের পবিত্র কর্ম।

কৈলাসের হর-গৌরীকে মুখার্জিবাবু কখনও দেখেননি, কিন্তু ওঁর বারবার মনে হচ্ছিল চোখের সামনে উনি সেই হর-গৌরীর মিলনই দেখছেন। এই কথাটাই উনি রসিয়ে বলতে যাওয়ার মুখে শ্রবণা কেমন যেন থরথর করে কেঁপে উঠল, তারপরেই ওর দু-চোখ ফেটে জল পড়তে লাগল টসটস করে।

কমলেশ চট করে উঠে গিয়ে ভাগনির কাঁধ ধরে নিজের দিকে টেনে নিলেন।

'কী ব্যাপার? শরীর খারাপ?'

মুখার্জিবাবুর প্রশ্নের উত্তরে চাপা গলায় কমলেশ বললেন, 'না, ওর মায়ের কথা মনে পড়ে গেছে নির্ঘাত, একটু আগেই বলছিল আমাকে।'

জ্যোতির্ময়বাবু বললেন, 'শ্রবণার বাবাকে কি এর মধ্যে ফোন করেছিলেন?'

'হ্যাঁ। কিছুক্ষণ আগেই করেছি। বলেছি, ওরা এক্ষুনি বিয়ের আসরে বসছে। একটু পরেই আবার ফোন করে জানিয়ে দেব শুভ কাজ মিটে গেছে ভালভাবে। বিয়ের খবর পেয়ে জামাইবাবু খুব খুশি।'

শ্রবণা নিজেকে সামলে নিয়েছে। চার-ভাঁজ-করা ছোট্ট রুমাল দিয়ে দু চোখের জল মুছে নিল আলতো করে। আশ্চর্য সুন্দর দেখাচ্ছে নতুন বউকে। সারা গায়ে পুরনো দিনের একরাশ গয়না, কিন্তু কোনওটা যেন বাড়তি নয়। পুরনো দিনের সালঙ্কারা মূর্তির মতো দেখাচ্ছিল শ্রবণাকে।

শ্রবণা হঠাৎ কেঁদে ফেলার জন্যে পরিবেশ খানিকটা থমথমে হয়ে গিয়েছিল। এখন ও নিজেকে সামলে নেওয়ায় চারদিক আবার সহজ-স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। কৌশিক বেশ উঁচু গলায় বলে উঠল, 'ফিশ ফ্রাইয়ের যা সুন্দর গন্ধ ছেড়েছে—আমরা তো এখন খেয়ে নিতে পারি, নাকি?'

বন্ধুর কথায় সায় দিলেন কমলেশ। 'হ্যাঁ শুভবিবাহ সুসম্পন্ন। আমাদের তো এখন খাওয়া আর গল্প করা ছাড়া অন্য কোনও কাজ নেই। মুখার্জিদা কী বলেন?'

'হ্যাঁ, আপনারা সবাই বসে পড়ুন, আমি একটু পরে বসছি।'

'পরে কেন? কন্যাকর্তার কাজও তো শেষ।'

'না-না আপনারা বসুন, আমি ওদিকটা একটু দেখি—। খাবারদাবার কদ্দুর কী রেডি হল—।'

জোরালো আপত্তি তোলার গলায় বলে উঠলেন কমলেশ, 'না-না, ওদিকে যাওয়ার কোনও দরকার নেই। এই কেটারারের বেশ সুনাম আছে। ওদের কাজ ওদের মতো করে করতে দিন। ওরা সব গুছিয়েও ফেলেছে। বুফে সিস্টেম। ওই ঘরে টেবিল সাজানো হয়ে গেছে। চলুন, আমরা ও ঘর থেকে খাবার নিয়ে এসে এ-ঘরে বসি। লোকজন তো নামমাত্র, আমরা বসে বসে গল্প করতে করতে খেতে পারি। আরও দু-চারজন অতিথির আসার কথা। তবে ওঁদের মনে হয়, আসতে একটু দেরিই হবে।'

মুখার্জিবাবু বললেন, 'তাহলে তো নতুন বর-বউও খেতে পারে আমাদের সঙ্গে।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই। এ তো আর, ওই যে কী বলে বৈদিক মতে বিয়ে নয়—। আর বর-কনের খাওয়ার ব্যাপারে আগেও বাধা ছিল না, পরেও নেই।'

কৌশিকের কথায় একটু হেসে উঠে মুখার্জিবাবু বললেন, 'কিন্তু মানসিক বাধা থাকলে আমি-আপনি সেটা সামাল দেব কী ভাবে? আমি খবর নিয়ে জেনেছি, শ্রবণা সারা দিনে কিচ্ছু দাঁতে কাটেনি।'

'অ্যাঁ! তাই নাকি!' রীতিমত চমকে উঠেছিলেন কমলেশ।

'তাই কি না—আপনার ভাগ্নিকে জিজ্ঞেস করে দেখুন।'

এবার মৃদু গলায় প্রতিবাদের ভঙ্গিতে শ্রবণা বলল, 'আমার খিদে না পেলে কী করব!'

'সারা দিনই খিদে ছিল না?'

'না থাকলে আমার কী করার আছে!'

শ্রবণার উত্তর শুনে কৌশিক গলা ছেড়ে হেসে উঠে বলল, 'একেই বলে সীতা-সাবিত্রীর দেশ! শোনো, এখন তোমার একটা কাজই করার আছে। তা হল, পেট পুরে তিনজনের খাবার একা খাওয়া। চলুন সবাই—খাওয়ার ব্যাপারটা এখন ইমার্জেন্সি হয়ে গেছে।'

কোর্টের ঘরে লম্বা মাপের টেবিলের ওপর রুপোর ট্রেতে সুদৃশ্য সব খাবার সাজানো হয়ে গেছে। ঝুলন্ত রুপোর ট্রেতে খাবার, নীচে ছোট একটা আলোর শিখা। টেবিলের একপাশে ঝকঝকে পোর্সিলিনের প্লেট, ন্যাপকিন আর কাঁটা-চামচ। সবাই প্লেটে পছন্দসই খাবারদাবার তুলে নিয়ে বসার ঘরে এসে বসল।

সুখাদ্য প্রত্যেকেরই প্রাণের আবেগ বেশ কিছুটা বাড়িয়ে দেয়। এক চামচ গরম বিরিয়ানি মুখের ভেতরে চালান করে দেওয়ার একটু বাদে মুখার্জিবাবু বললেন, 'অত বড় একটা

খাবারের ট্রের নীচে প্রদীপের শিখার মতো একটুখানি আগুন টিমটিম করে জ্বলছে, কিন্তু বাহাদুরি আছে শিখাটার; পুরো খাবার গরম করে রেখে দিয়েছে।'

কৌশিক মুচকি হেসে বলল, 'ওই প্রদীপটা নিছকই দেখ্‌নাই, যাকে বলে শো-পিস; খাবার গরম রাখার ব্যাপারে ওটার কোনও ভূমিকাই নেই।'

'নেই! তাহলে খাবার অতক্ষণ গরম থাকে কী ভাবে?'

'ওইটাই তো ম্যাজিক, কেটারারের ম্যাজিক।'

'কীরকম?'

'খাবারের ট্রের তলার দিকটা ফাঁকা, ওখানে টগবগে গরম জল ভর্তি একটা ট্রে লুকনো থাকে। খাবার অনেকক্ষণ ধরে গরম রাখে ওই গরম জল।'

'অ্যাঁ! তাই? তবে, আপনি যাই বলুন আর তাই বলুন, আমাদের সেই পুরনো দিনের পাত্ পেড়ে নেমন্তন্ন খাওয়ার মেজাজটাই কিন্তু আলাদা। কলাপাতায় খাওয়া। একধারে মাটির গ্লাসে জল। বাড়ির বাচ্চারা কলাপাতার ধারে নুন আর একচিলতে লেবু দিয়ে যেত। প্রথমেই পাতে পড়ত বোঁটাসমেত ভাজা একফালি বেগুন আর লুচি, ছোলা দিয়ে রান্না কুমড়োর ছক্কা। এই শুরুটাই মনে করিয়ে দিত—হ্যাঁ, নেমন্তন্ন খেতে বসেছি।'

মুখার্জিবাবুর কথা বলার মধ্যে এমন একটা বৈঠকি চাল ছিল যে, এক-এক করে সবাই ওঁর গল্পে যোগ দিলেন। দেখতে দেখতে দুটো দল হয়ে গেল। একটা দল হালের কেটারার পক্ষে। আর একটা দল পুরনোপন্থী।

মুখার্জিবাবু বললেন, 'পুরনো দিনের পাত পেড়ে খাওয়ার মধ্যে ষোলো আনার ওপরে আঠারো আনা আন্তরিকতা ছিল। প্রতিটি রো-তে আপ্যায়ন করার মানুষজন থাকতেন দু-তিনজন করে। ঠোঁটের ভদ্রতা নয়, প্রাণ থেকে কথা বলতেন সবাই। পাশে দাঁড়িয়ে—এই, এটা নিয়ে এসো; ওই, ওটা নিয়ে এসো—বলে জোরজবরদস্তি করে খাওয়াতেন।'

'জোরজবরদস্তি করে খাওয়ানো কি ভাল? ওতে শরীর খারাপ হত।'

'কিচ্ছু খারাপ হত না। বাড়িতে মা-মাসিরাও তো জোর করে খাওয়াতেন—তাতে কি আমাদের শরীর খারাপ হত? আসলে খাওয়ার ব্যাপারে ভালবাসা দেখানো মানেই অত্যাচার, এই অত্যাচার আগে হরবখত হত। কেটারাররা পাত পেড়ে খাওয়ালে আর এক ধরনের অত্যাচার হয়।'

'কীরকম?'

'প্রথমে ভুষি মাল চারবার করে রিপিট করবে। মানে, আজেবাজে খাইয়ে তোমার খিদেটা মেরে দেওয়ার তাল। তার পর ভাল জিনিস মানে মাছ, মাংস, ফ্রাইট্রাই পরিবেশন করবে শাঁ শাঁ করে। রিপিটের কোনও বালাই নেই। পাতের খাবার শেষ করার আগেই দেখবে—চাটনি-পাঁপড় পড়ে গেছে। আরাম করে কিছু খাওয়ার আগেই খাওয়া শেষ করে দিতে বাধ্য হয় অনেকে। এটা কি অত্যাচার নয়?'

'সব কেটারার এরকম নয়, তবে লাভের অঙ্ক বাড়াবার জন্যে কোনও-কোনও কেটারার এই কাণ্ডটা করে বসে। কিন্তু আমার মতে বুফে সিস্টেমটাই সেরা সিস্টেম।'

'কেন?'

'স্রেফ খাওয়ার জন্যে অনন্ত কাল অপেক্ষা করার মতো খারাপ জিনিস আর কী হতে পারে! নিছক সামাজিকতা করতে গিয়ে বিয়েবাড়িতে এই ঝঞ্ঝাটের মধ্যে পড়ে যাওয়াটা

রীতিমত কষ্টকর। পাত্ পেড়ে খাওয়া হচ্ছে। আদর-আপ্যায়ন করে খাওয়ানো। তার মানে একটা ব্যাচে হয়তো বসতে পারলাম না পাঁচ মিনিট দেরিতে পৌঁছবার জন্যে। পরের ব্যাচে বেশ ভিড়। বসার জায়গা কম। ওই ব্যাচটাও ফসকালো। ব্যাস্, খেতে বসার আগেই দুটি ঘণ্টা বরবাদ। কিন্তু বুফে হলে ওই ঝামেলা নেই। যখনই যাই না কেন, প্লেট টেনে নিয়ে খাবার তুলে নিতে পারি। পনেরো বিশ মিনিটের মধ্যে খাওয়া শেষ।'

মুখার্জিবাবু আপত্তি করার গলায় বললেন, 'কিন্তু বুফের সব চাইতে অসুবিধে কী জানেন? প্লেটে একগাদা আইটেম তুলে নিয়ে যদি হাতের ওপর রেখে খেতে হয়— এটার সঙ্গে ওটা মিশে, ওটার সঙ্গে সেটা মিশে—বিচ্ছিরি একটা তালগোল পাকানো ব্যাপার হয়ে যায়। এখানে অবশ্য সেই অসুবিধেটা নেই। খাবারের প্লেট টেবিলে রেখে খাওয়ার সুযোগ পাচ্ছি।'

কৌশিক বলল, 'বুফে খাওয়াটা একটা আর্ট। এই আর্টে আমরা এখনও অভ্যস্ত হতে পারিনি। আপনি প্রথমে প্লেটে একগাদা আইটেম তুলবেন কেন? প্রথমে ধরা যাক, স্রেফ একটা ফিশফ্রাই তুললেন। ওটা শেষ হলে একটু করে মুর্গি। ওটা শেষ হলে আর একটা আইটেম। প্লেট পরিষ্কার থাকল, খেয়েও তৃপ্তি পেলেন।'

উত্তরে হাসতে হাসতে মুখার্জিবাবু বললেন, 'ওই ভাবে অ্যাথ্লিট আর আপনার মতো অল্পবয়সীরা খেতে পারে। আমাদের বয়েসে চলবে না।'

মুখার্জিবাবুর কথায় হেসে উঠেছিলেন সবাই। কমলেশ হাসতে হাসতেই বললেন, 'আপনার এদিককার খাওয়া শেষ হলে বলবেন, আপনার সুইট ডিশটা কিন্তু আমি নিয়ে আসব আপনার জন্যে।'

মুখার্জিবাবুও হাসলেন। 'আমার কথাগুলো আপনারা কেউ দয়া করে সিরিয়াসলি নেবেন না। তর্ক করলে খিদে বাড়ে, তাই তর্ক করছি। একটু-একটু করে কম খেলাম নাকি! আপনার আজকের কেটারারের রান্না ফাস্ক্লাস। খুব ভাল খেলাম।'

মুখার্জিবাবুর এই কথাটায় সায় দিলেন সবাই প্রাণ খুলে। জ্যোতির্ময়বাবু বললেন, 'সত্যিই ভাল খেলাম। কী গো বলো?' ওঁর স্ত্রী মাথা কাত করলেন। 'হ্যাঁ, বেশ ভাল।'

'দিব্যজ্যোতির কেমন লাগল?'

'চমৎকার।'

'শ্রবণাকে কি জিজ্ঞেস করতে হবে?'

'করতে পারো, তবে আমার উত্তর দেওয়ার সময় নেই।'

'কী করে দেবে? তুমি তো সারা দিনের পরে উপোস ভেঙেছ।'

কৌশিকের কথায় শব্দ করে হেসে উঠল সবাই। অ্যাপার্টমেন্টে এখন বেশ একটা উৎসব-বাড়ির আমেজ। ইতিমধ্যে কমলেশের পরিচিত আরও দু'জন নিমন্ত্রিত এসে গেছেন।

বিয়েবাড়িতে বড় দল একটানা একসঙ্গে বেশিক্ষণ থাকতে পারে না। বড় দল ভেঙে এখন ছোট কয়েকটা দল হয়ে গিয়েছে। আলাদা-আলাদা ভাবে গল্প চলছে মস্ত বড় এই সিটিং-কাম-ডাইনিং হলে।

একফাঁকে কমলেশ ভেতরের ঘর থেকে ঘুরে এসে বললেন, 'জামাইবাবুকে ফোন করে জানিয়ে দিলাম, বিয়ের কাজ ভাল ভাবে মিটে গেছে। কাল সকালে মেয়ে-জামাই যাচ্ছে তোমার কাছে প্রণাম করার জন্য। বিয়ে ভাল ভাবে হয়ে যাওয়ার খবর শুনে জামাইবাবু খুব খুশি।'

'ইশ্! আমাকে একবার ডাকলে পারতেন!'

জ্যোতির্ময়বাবুর কথার উত্তরে কমলেশ বললেন, 'জামাইবাবুরতো টেলিফোনে কথা বলার ব্যাপারেও নিষেধ আছে ডাক্তারের। আমি সিস্টারকে অনুরোধ-টনুরোধ করে এক মিনিটের জন্যে কথা বলার অনুমতি জোগাড় করেছিলাম। উনি আব একটু সুস্থ হয়ে নিন, তারপর আপনি যত খুশি কথা বলবেন।'

'হ্যাঁ, সে তো বটেই। যাক, ঈশ্বরের ইচ্ছায় উনি ভাল হয়ে উঠছেন—, এটাই এখন সবচেয়ে বড় খবর।' মুখ সামান্য ওপরে তুলে সর্বশক্তিমানের উদ্দেশে উনি ছোট্ট একটা প্রণাম সেরে নিলেন।

খাওয়াদাওয়ার শেষে চার অতিথি বিদায় চাইলেন— অনেক দূরে যেতে হবে ওঁদের। কমলেশ বললেন, 'আপনাদের তাহলে আটকাব না। এসেছেন, খুব খুশি হয়েছি আমি।'

কৌশিক বলল, 'অবনীদা মনে হয় আজকে আর আসতে পারলেন না।'

অবনীদার কথায় সাদা পোশাকের পুলিশ গার্ডের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল মুখার্জিবাবুর। উনি গিয়ে গার্ডকে ডেকে নিয়ে এসে বললেন, 'আপনি খেয়ে নিয়ে আধঘণ্টাটাক অপেক্ষা করুন। আমাদের লাস্ট গেষ্ট মনে হয় তার মধ্যেই চলে যাবে। গেলেই আপনাকে জানাব। আপনিও চলে যেতে পারেন তখন। আচ্ছা, কেটারাররা কখন যাবে?'

'এই তো এখনই। আমি কেয়ারটেকারের কাছে ফ্ল্যাটের চাবি দিয়ে যাবে ভোরবেলায়, ওরা একটু বেলায় এসে মালপত্তর বার করে নেবে। ডেকরেটারও তখন আসবে।'

এ-বাড়ির শেষ অতিথি কৌশিক বিদায় নিল মিনিট-চল্লিশেক বাদে। মুখার্জিবাবু রাতে এখানেই থাকবেন। উনি ঝুলবারান্দায় গিয়ে চেঁচিয়ে পুলিশ গার্ডকে ডেকে 'গুডনাইট' করে ফ্ল্যাটের সদর দরজায় খিল লাগিয়ে কোলাপসিবল গেটে তালা দিয়ে চাবিটা নির্দিষ্ট জায়গায় রেখে দিলেন।

তারপর খালি হাতে ব্যায়াম করার কায়দায় দু-চারবার আড়ামোড়া ভেঙে লম্বা হাই তুলে বললেন, 'যাক, শুভদিনটা খুব সুন্দর ভাবে কেটে গেল। এবার যে যার ঘরে গিয়ে বিশ্রাম নিন। কাল ভোর পাঁচটায় বেরুতে হবে, তার মানে উঠতে হবে চারটেয়। আমার ভোরে ওঠার অভ্যেস আছে, আমি ডেকে দেব সবাইকে।'

কমলেশ হাসতে হাসতে বললেন, 'আমি তো একেবারেই ভোরে ওঠার পার্টি নই, তাই টেলিফোনে অ্যালার্ম কল বুক করে রেখেছি। তাহলে এবার শুয়ে পড়া যাক। গুড নাইট।'

বরের সঙ্গে নির্দিষ্ট ঘরে যেতে গিয়েও থমকে গিয়েছিল শ্রবণা। তারপর মুখ ফিরিয়ে ডাকল 'কাকু'।

কেমন যেন ব্যাকুল কণ্ঠস্বর। মুখার্জিবাবু এগিয়ে গিয়ে শ্রবণার মাথায়, পিঠে একটু হাত বুলিয়ে বললেন, 'যাও মা, এবার একটু বিশ্রাম নিয়ে নাও। সারা দিন তো কম ধকল গেল না। কাল তো আবার ভোরবেলায় উঠতে হবে।'

পাশাপাশি দুটো ঘরে বাবা-মা আর নব দম্পতি। এদিকের ঘরে কমলেশ আর মুখার্জিবাবু। সিটিং-কাম-ডাইনিংয়ের একটা আলো ছাড়া বাকিগুলো নিবিয়ে দিলেন কমলেশ। সামান্য আগে-পরের ব্যবধানে তিনটে ঘরের দরজাতেই খিল পড়ে গিয়েছিল ভেতর থেকে।

।। চব্বিশ ।।

ভোর চারটের একটু আগেই ঘুম ভেঙে গিয়েছিল মুখার্জিবাবুর। বিছানা থেকে নেমে এসে টেবিল-ল্যাম্প জ্বেলে ঘড়ি দেখলেন উনি। ও পাশের সিঙ্গল খাটে অঘোরে ঘুমোচ্ছেন কমলেশ। সিটিং-কাম-ডাইনিংয়ে এসে দেখলেন জ্যোতির্ময়বাবু ও শ্রবণাদের ঘরেও আলো জ্বলে গেছে। দুটো ঘরের দরজার নীচে দিয়ে জোরালো আলোর ফালি এসে পড়েছে বাইরে।

একটু বাদে কমলেশকে ডেকে দিয়ে ওই দুটো ঘরের বন্ধ দরজায় টোকা দিয়ে মুখার্জিবাবু বললেন, 'গুড মর্নিং।' উত্তরে সাড়া এসেছিল দুটো ঘর থেকেই।

ফিরে এসে ঘরের জানলা দিয়ে বাইরে উঁকি মারলেন মুখার্জিবাবু। ভোরের আলো ফোটেনি এখনও। চারদিক আশ্চর্য রকমের চুপচাপ। হাতে সময় আছে, কিন্তু একটু পর থেকেই ওঁর শরীরের মধ্যে চাপা অস্থিরতা শুরু হয়ে গিয়েছিল। পাঁচটার মধ্যে এ-বাড়ির সবাইকে রওনা করিয়ে দিতে হবে।

শরীরের চাপা অস্থিরতা অবশ্য চাপাই থাকল, পৌনে পাঁচটাব মধ্যে এ-বাড়ির সবাই তৈরি হয়ে গিয়েছিলেন।

এক-এক করে প্রত্যেকেই সিটিং-কাম-ডাইনিংয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন। দিল্লির তিন যাত্রীর লাগেজ বলতে দুটো অ্যাটাচি কেস আর একটা মাঝারি মাপের স্যুটকেস।

কমলেশ হাসতে হাসতে বললেন, 'টেলিকমিউনিকেশনের সার্ভিস এখন মারাত্মক। টেলিফোনে অ্যালার্ম-কল বুক করেছিলাম চারটেয় ডেকে দেওয়ার জন্যে, সে অ্যালার্ম এখনও বাজল না।'

উত্তরে জ্যোতির্ময়বাবু হাসতে হাসতে বললেন, 'বাজবে, আরও আধঘণ্টাটাক বাদে বাজবে। ওই অ্যালার্ম-কলও বাজবে, পার্টির উপকারও হবে—দুটো একসঙ্গে কী করে হয়!'

ওঁর কথায় হেসে উঠেছিল সবাই।

একটু পরে শ্রবণার দিকে তাকিয়ে মুখার্জিবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'মা তুমি তৈরি?'

একদিকে মাথা সামান্য কাত করল শ্রবণা।

'গয়নাগাটিগুলো কোথায় রেখেছ?'

হ্যান্ডব্যাগটা দেখিয়ে উত্তর দিল শ্রবণা, 'এর মধ্যে।'

খুব ভাল করেছ। হাতব্যাগ কখনও হাতছাড়া করবে না। দিল্লি এয়ারপোর্টে তোমাদের গাড়ি আসছে। এখান থেকে রওনাও হচ্ছ গাড়িতে। দাঁড়াও আমি ঘরগুলো দেখে আসি একবার, শেষ মুহূর্তে কিছু ফেলে যাওয়ার অভ্যেস আছে অনেকের।'

ঘর দেখার জন্য ঘরে ঢুকলেন মুখার্জিবাবু।

জ্যোতির্ময়বাবুর দিকে তাকিয়ে কমলেশ জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনাদের গাড় কখন আসবে?'

'এসে যাওয়ার কথা, যে-কোনও মুহূর্তেই এসে যাবে।'

'আপনাকে তাহলে একটা প্রণাম সেরে নিই।'

প্রণাম সারার জন্যে জ্যোতির্ময় সেনের পায়ের কাছে এসে ঝুঁকে পড়লেন কমলেশ, সঙ্গে সঙ্গে লোকটির পকেট থেকে হাতের মুঠোয় উঠে এল একটা পিস্তল; পিস্তলের বাঁট দিয়ে কমলেশের মাথায় মারতে যাওয়ার মুখে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন মুখার্জিবাবু। ওদিকে চোখ পড়তেই আঁতকে উঠলেন উনি—'ও কী! ও কী!'

ওই আর্ত-চিৎকারে কেমন যেন ছিটকে গিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন কমলেশ। কিন্তু রেহাই পেলেন না, জ্যোতির্ময় সেন অসম্ভব ক্ষিপ্র গতিতে ছুটে গিয়ে পেছন দিক দিয়ে জাপটে ধরল কমলেশকে। একটা হাত গলাটাকে পেঁচিয়ে ধরেছে, অন্য হাতে পিস্তল।

মুখার্জিবাবু আরও একবার চিৎকার করতে গিয়েছিলেন, কিন্তু সে সুযোগ পেলেন না উনি। নতুন জামাই লাফ মেরে এসে প্রবীণ মানুষটির মুখ চেপে ধরেছিল শক্ত হাতে।

অত্যন্ত সুদর্শন দিব্যজ্যোতির চোখমুখ হঠাৎই কেমন যেন বিকৃত হয়ে উঠেছিল। হিসহিসে গলায় জ্যোতির্ময়ের দিকে তাকিয়ে বলল, 'দুটোকেই তো খতম করে দিলে হয়।'

'খতম?'

'কেন, গুলি খরচ হবে বলে কিপটেমি করতে চাও? ঠিক আছে, তাহলে হাত দিয়েই কাজ সারি।'

দিব্যজ্যোতি নামের নতুন জামাই ওর রোমশ, চওড়া কব্জির পেশিবহুল হাতটা মুখার্জিবাবুর গলার ওপর একবার বুলিয়ে নিয়ে বলল, 'দুটো মুর্গাই তো দুবলাপাত্‌লা আছে। কাজ সারতে বেশিক্ষণ সময় লাগবে না।'

হঠাৎই শ্রবণা একটা পিস্তল বার করে জ্যোতির্ময়ের পেছনে দাঁড়িয়ে ধারালো গলায় বলে উঠল, 'তোমরা শিগগির ওদের ছেড়ে দাও, না হলে দুজনকেই আমি গুলি করতে বাধ্য হব।'

এইরকম একটি অকল্পনীয় দৃশ্য দেখার জন্যে দুই দুষ্কৃতীর কারুরই বিন্দুমাত্র প্রস্তুতি ছিল না।

শ্রবণার কণ্ঠস্বর এবার আরও ধারালো। 'হাতের পিস্তলটা ফেলে দাও, এক্ষুনি— দাও বলছি।'

বোঝাই যাচ্ছিল আদেশটা ফাঁকা বুলি নয়। ওই কথার ধাক্কাতেই জ্যোতির্ময়ের হাতের পিস্তল খসে পড়ল নীচের কার্পেটের ওপর।

কিন্তু অভাবিত দৃশ্যের আরও কিছুটা বাকি ছিল। মাঝবয়সী ওই মহিলা হঠাৎই খালি হাতে কাটারি চালাবার ভঙ্গিতে তীব্র এক আঘাত করল শ্রবণার হাতে। 'উফ্' করে বসে পড়ল শ্রবণা, আর ওর হাতের পিস্তল ছিটকে গিয়ে পড়ল ওদিকের দরজায় ঝোলানো লাল মখমলের পর্দার সামনে।

দিব্যজ্যোতির শরীরে বোধহয় বিদ্যুৎ খেলে গিয়েছিল, ও প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিল শ্রবণার পিস্তলটা তুলে নেওয়ার জন্যে। কিন্তু তার আগেই পর্দার আড়াল থেকে একটা পা বেরিয়ে এসে চেপে ধরেছিল পিস্তলটাকে।

পা বেরুবার পরে মানুষটা বেরুল। কৌশিক। ওর হাতেও পিস্তল। হাতের পিস্তলের নলটা কেমন যেন পালা করে দিব্যজ্যোতি আর জ্যোতির্ময়ের ওপরে ঘুরছিল। শান্ত কিন্তু

কঠিন গলায় কৌশিক বলল, 'শ্রবণার পিস্তলটা নেওয়ার জন্য অত ব্যস্ত হওয়ার কোনও দরকার নেই, ওটা খেলনা পিস্তল। উহুঁহুঁ জ্যোতির্ময়বাবু, আপনারটা খেলনা নয়, তবে আপনি ওটা আর তুলবেন না। মুখার্জিবাবু, ওই পিস্তলটা সরিয়ে নিন তো—।'

মুখার্জিবাবু হতভম্বের মত দাঁড়িয়েছিলেন। কৌশিকের কথায় ওর টনক নড়ল, ছুটে গিয়ে জ্যোতির্ময়ের পায়ের কাছে পড়ে থাকা পিস্তলটা তুলে নিলেন উনি।

বাড়ির সামনে একটা গাড়ি এসে দাঁড়াবার শব্দ শোনা গেল, তারপরেই হর্ন বাজল দুবার। রহস্যময় একটা হাসি ফুটে উঠেছিল কৌশিকের ঠোঁটে। জ্যোতির্ময়েব দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনার গাড়ি এসে গেছে আপনাদের নিয়ে যাওয়ার জন্যে। আপনারা মানে রূপসী নতুন বউ এবং আপনারা তিনজন—। সঙ্গে দশ লাখ টাকার গয়না। নতুন বউ চলে যেত মেয়ে বিক্রির বাজারে। সেখান থেকে মোটা টাকা আসত। তার ওপর এই গয়নার টাকা। একটা বড় দাঁও ফসকে গেল। যাকগে, কী আর করা যাবে। অতীতে তো এই ধরনের অনেকগুলি দাঁও মেরেছেন।'

জ্যোতির্ময়ের চোখ দিয়ে আগুন যেন ঠিকরে বার হচ্ছিল। 'কী বলতে চান আপনি?'

'আমি তো সহজ সরল বাংলায় কথা বলেছি। যা বলতে চাই বা করতে চাই—তা এখনও স্পষ্ট হয়নি আপনাদের কাছে।' ঠাট্টার গলায় উত্তর দিল কৌশিক।

গাড়ির হর্ন একই ভঙ্গিতে আবার দুবার বাজল।

জ্যোতির্ময়ের চোখ থেকে আগুন ঠিকরে পড়ছিল আগের মতোই। 'আপনি কিন্তু খুব বিপদে পড়ে যাবেন। আমাদের যেতে দিন। গাড়িতে আমার বন্ধুরা অপেক্ষা করছে। ওদের ঠেকাবার সাধ্য আপনার হবে না।'

বিস্ময়ের সুর এবার ফুটে উঠল কৌশিকের গলায়। 'শুধু শুধু ওঁদের ঠেকাতে যাব কেন? ওঁদের আপ্যায়ন করার জন্যে নীচে লোক আছে আমাদের।'

নিস্তব্ধ ভোরকে কেমন যেন চমকে দিয়ে টেলিফোন বেজে উঠল হঠাৎই। কৌশিক হাসি মুখে বলল, 'এতক্ষণ বাদে কমলেশের অ্যালার্ম-কল বাজল। মুখার্জিবাবু যান, একটা গুডমর্নিং জানিয়ে দিন।'

বহুক্ষণ বাদে আগের সেই তৎপরতা জেগে উঠেছিল মুখার্জিবাবুর মধ্যে। উনি বললেন, 'ইন্সপেক্টর ঘোষরায়কে এখানে আসার জন্যে একটা ফোন করে দিই ওই সঙ্গে?'

শান্ত গলায় উত্তর দিল কৌশিক। 'তার আর দরকার হবে না। ইন্সপেক্টর ওঁর লোকজন সঙ্গে নিয়ে এই বাড়িটা ঘিরে রেখেছেন অনেকক্ষণ ধরে।'

গোয়েন্দার কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধুপ-ধুপ করে শব্দ উঠতে লাগল সিঁড়িতে। কারা যেন দ্রুত পায়ে উঠে আসছে ওপরে। কোলাপসিবল গেটের তালা আগেই খোলা হয়ে গিয়েছিল। কৌশিকের ইঙ্গিতে মুখার্জিবাবু লম্বা পায়ে হেঁটে গিয়ে দ্বিতীয় দরজাটার ছিটকিনি খুলে দিলেন। খোলার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে পড়লেন অধ্যাপক মৃদুল ভট্টাচার্য। ওঁর ঠিক পেছনেই ইন্সপেক্টর অবনী ঘোষরায়। ইন্সপেক্টরের দুপাশে দুজন। চেহারা দেখলেই বোঝা যায় সাদা পোশাকের দুই পুলিশ।

অধ্যাপক দ্রুত চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে জ্যোতির্ময় সেনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এ কি! আপনারা সব এ ভাবে দাঁড়িয়ে কেন? আমি গাড়ির হর্ন বাজিয়েছি বারচারেক। শুনতে পাননি?'

মিনমিন করে উত্তর দিলেন জ্যোতির্ময়। 'শুনতে পাব না কেন? আসলে এঁরা আমাদের আটকে রেখেছেন।'

কথাটা শুনেই জুতোর হিলের ওপর ভর দিয়ে শাঁ করে ইন্সপেকটর ঘোষরায়ের দিকে ঘুরে গেলেন অধ্যাপক। তারপর রীতিমত ধমকে ওঠার গলায় ইন্সপেক্টরকে বললেন, 'হোয়াট ননসেন্স!' আপনি কী চান বলুন তো? এঁরা আমার বন্ধুলোক। ভেরি ভেরি রেসপেকটেবল—। আপনি এঁদের হ্যারাস করছেন কেন?'

বড় সাহেবদের সঙ্গে এই অধ্যাপকটির নাকি খুব দোস্তি। সুতরাং নীচের ধাপের যে-কোনও অফিসারই এঁকে বেশ সমঝে চলবেন। ঘোষরায় লাগসই বেশ কিছু যুক্তি সাজিয়ে রেখেছিলেন, কিন্তু সেগুলো হঠাৎই কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে গেল। উনি বলে বসলেন, 'আমি না, আমি না, কৌশিক—।'

'কে কৌশিক?'

'ওই তো ও, নামকরা একজন প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর।'

কৌশিকের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকালেন অধ্যাপক ভট্টাচার্য। 'ভীষণ চেনা-চেনা লাগছে, কোথায় যেন দেখেছি! হ্যাঁ-হ্যাঁ, মনে পড়েছে—।'

'আপনি তো কী একটা কাগজের হয়ে সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্যে আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন। তাই না?'

বিনীত ভঙ্গিতে উত্তর দিল কৌশিক, 'আপনি যে আমার মতো সামান্য একজন মানুষকে আজও মনে রেখেছেন— এটা আমার পক্ষে অত্যন্ত আনন্দের—।'

এত বিনয় দেখেও নরম হলেন না অধ্যাপক। আগের মতোই ধারালো গলায় বললেন, 'সাংবাদিকতা ছেড়ে এখন কি শখের গোয়েন্দাগিরি ধরেছেন? আসলে গপ্পো-উপন্যাসের শখের গোয়েন্দা আর বাস্তব জীবনের শখের গোয়েন্দার মধ্যে আকাশপাতাল তফাত। আপনি পরে একবার আমার সঙ্গে দেখা করবেন তো— মনে হয়, ভাল কোনও চাকরি পাইয়ে দেওয়ার ব্যাপারে আপনাকে কিছুটা সাহায্য করতে পারব।'

আপ্লুত গলায় কৌশিক বলল, 'আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।'

হাত তুলে ওকে থামিয়ে দিয়ে অধ্যাপক বললেন, 'হাতে একটা পিস্তল দেখছি— তা, ওটার লাইসেন্স আছে?'

একদিকে মাথা কাত করল কৌশিক।

'ফাঁকা পিস্তল? নাকি গুলিও আছে?'

'হ্যাঁ, গুলি ভরাই আছে।'

এবার ঠাট্টার গলায় অধ্যাপক বললেন, 'এগুলো থাকলেই মনে হয়— উপন্যাসের গোয়েন্দার কায়দায় এবার একটা বাহাদুরি দেখানো যাক। আমার বন্ধুদের কি সেই জন্যেই হ্যারাস করছেন?'

খুব বিনীত ভঙ্গিতে দুদিকে মাথা নাড়িয়ে মৃদু গলায় কৌশিক জবাব দিল, 'না।'

'না! তা, অভিযোগটা কী শুনি?'

'অ্যাটেম্প্‌টেড মার্ডার। সঙ্গে লুঠ ও অপহরণের চেষ্টাও আছে।'

ধমকে উঠলেন অধ্যাপক। 'রাবিশ! কাকে খুন করার চেষ্টা করেছেন ওঁরা?'

'আমার বন্ধু কমলেশ আর আমার সহকারী মুখার্জিবাবু—এই দুজনকে।'

'শিয়ার ননসেন্স! আপনার দেখা, শোনা কিংবা বোঝার মধ্যে বিরাট কোনও ভুল থেকে গেছে।'

ঠাণ্ডা মাথায় দুদিকে মাথা নাড়াল কৌশিক। 'না, আমার কোনও ভুল হয়নি।'

ইতিমধ্যে একটু সাহস সঞ্চয় করে ফেলেছেন ইন্সপেক্টর ঘোষরায়। গলা সামান্য বললেন, 'এরা বুলা মার্ডার কেস, ঝিমলি কিডন্যাপিং কেস এবং আরও কয়েকটা কেসে সঙ্গে কানেকটেড।'

আর একবার ধমকে উঠলেন অধ্যাপক। 'আপনারা ল অ্যান্ড অর্ডার মেনটেন করা জন্যে ইম্পরট্যান্ট পোর্টফোলিও হোল্ড করছেন, অথচ প্রতিদিনের খবরের কাগজটা পর্য একটু ভাল ভাবে দেখার প্রয়োজন বোধ করেন না।'

'দেখি, খুব ভাল করেই দেখি। আজকের কাগজ তো এখনও বার হয়নি—কালকে সব কটা কাগজই আমার খুঁটিয়ে পড়া আছে।'

ঠাট্টার গলায় এবার অধ্যাপক বললেন, "খুঁটিয়ে পড়া অথচ এটা দেখেননি যে, ঝিমলি অপহরণ ইত্যাদি কেসের সঙ্গে কানেকটেড সব ক'টাকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে বাঙ্গালোরে।"

'দেখব না কেন, খুব দেখেছি।'

'স্ট্রেঞ্জ! এরকম দেখার কী মানে হয়? প্রতিটি কাগজই টপ লেভেল পুলিশের সো কোট করেছে। অর্থাৎ কোনও রিপোর্টই বানানো নয়। অথচ আমার বন্ধুদের বিরুদ্ধে আপনি সেই এক চার্জই এনে বসে আছেন। যে সব ব্যাপারে আপনাদের প্রায়রিটি দেওয়ার কথ সেগুলো কিন্তু আপনারা অবহেলা করেন। আমার স্ত্রীর অপহরণের ব্যাপারে কদ্দিন আগে আপনাকে রিপোর্ট করেছি, অথচ তা নিয়ে আপনি ইনকুয়ারি পর্যন্ত করেননি।'

ভোরের দিকে অল্প-অল্প ঠাণ্ডা হাওয়া ছেড়েছিল, কিন্তু ইন্সপেকটর ঘোষরায় একটু বুঝি ঘেমে উঠেছিলেন। ছোট্ট একটা ঢোক গিলে বললেন, 'কে বলল করিনি। আমি কাজ ফেলে রাখার লোক নই। আপনি খোঁজ করলেই জানতে পারতেন।'

'বেশ এখনই বলুন, আপনার ফাইন্ডিংস কী?'

'আপনি যাঁকে কিডন্যাপার বলেছেন জব্বলপুরের সেই ডাক্তার অত্যন্ত ক্লিন ম্যান তাছাড়া ওঁর সঙ্গে অন্য কোনও মহিলাকে জব্বলপুরে দেখা যায়নি। আমরা খোঁজ নিয়ে জেনেছি।'

'রাবিশ! যাকে অপহরণ করা হয়েছে, তাকে সবার নাকের ডগায় কোনও অপহরণকারি সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়ায় না। আমার স্ত্রীর কোনও হদিস পেয়েছেন আপনি? পাননি এই নিয়ে আমি আপনাদের পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে কথা বলব। ওঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক খুব ভাল। উপস্থিত আপনি ডু মি এ ফেভার। কাগজপত্র দিন। আমি লিখে দিচ্ছি। আমি পার্সোনাল বন্ডে আমার বন্ধুদের এখান থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যেতে চাই। রাইট নাউ—এক্ষুনি।'

খোদ পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে যাঁর সম্পর্ক খুব ভাল তাঁর রুদ্র মূর্তি দেখে ইন্সপেকটর ঘোষরায় একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে কৌশিকের দিকে তাকালেন।

কৌশিকের হাতের পিস্তলটা একটু উঁচুতে তোলা থাকলেও চোখেমুখে আগের সে বিনীত ভঙ্গি। নরম গলায় ও বলল, 'কিন্তু প্রফেসর ভট্টাচার্য, আপনাকে তো এখন ছাড়া যাবে না।'

'আমাকে!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনাকে।'

'কেন ?'

'এই ফাঁদটা যে আপনার জন্যেও পাতা হয়েছে।'

'ফাঁদ !'

'হ্যাঁ, অনেক মাথা খাটিয়ে এটা পাতা হয়েছে। ভাল ফাঁদ না হলে আপনারা তো ধরা দিতেন না।'

রাগে, উত্তেজনায় অধ্যাপকের চোখমুখ লালচে হয়ে উঠেছিল। ফেটে পড়তে গিয়েও অনেক কষ্টে উনি নিজেকে সামলালেন। তারপর কেমন যেন কেটে কেটে বললেন, 'আমার বিরুদ্ধে অভিযোগটা কী জানতে পারি ?'

'অবশ্যই। অভিযোগ তো আগেই শোনা দরকার।'

'কী অভিযোগ ?'

'অভিযোগের শেষ নেই। খুন, লুঠ, জালিয়াতি, অপহরণ—কী নয় ?'

উত্তেজনার চাপে কয়েক মুহূর্ত বোধহয় কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল অধ্যাপকের, তারপর উনি কেমন যেন ফেটে পড়লেন। 'কী বলছেন আপনি জানেন ? আপনার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে !'

'আপনার গুণের ফিরিস্তি শুনে যে-কারও মাথা খারাপ হয়ে যেতে পারে। আমার অবশ্য হয়নি।'

'আপনি যে সব অভিযোগ এনেছেন আমার বিরুদ্ধে, তার একটাও কি প্রমাণ করতে পারবেন ?'

'প্রমাণ না করতে পারলে তো আপনারা বেকসুর খালাস পেয়ে যাবেন। এমনকী মোটা অঙ্কের ক্ষতিপূরণ দাবি করে আমার বিরুদ্ধে মানহানির একটা মামলাও ঠুকে দিতে পারেন। আমি এসব ব্যাপারে কখনওই অযথা ঝুঁকির মধ্যে যাই না। আপনাদের বিরুদ্ধে আনা প্রতিটি অভিযোগই প্রমাণ করতে পারব।'

'আপনি ..... আপনি ...।' উত্তেজনার চোটে কথা শেষ করতে পারলেন না অধ্যাপক।

কৌশিকের কণ্ঠস্বর এবার একটু কঠিন হল। 'আপনি পণ্ডিত লোক—এটাও সত্যি। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে মস্ত একটা বই লিখছেন—এটা সত্যি। আপনার কিছু আন্তর্জাতিক খ্যাতি জুটেছে—এর মধ্যেও কোনও ভুল নেই। কিন্তু এটা আপনার চরিত্রের ছোট্ট একটা দিক। বাকি দিকটা আপনার দলের বাইরে আমরাই প্রথম জানলাম। অবশ্য তার জন্যে আমাদের বিস্তর কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। আপনাদের হালের কাণ্ডকারখানার কথা কিছুটা বলে নিই আগে। যে কেসটা প্রথমে আমাদের নজরে আনা হয়—সেটা হল বুলা মার্ডার কেস। অরিজিৎ রায় খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনের সুবাদে মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ করেছিলেন। হিরের টুকরো অত্যন্ত সুদর্শন পাত্রের নাম প্রিতম। ছেলের হয়ে বিয়ের ব্যাপারে যোগাযোগ করেছিলেন ছেলের দাদা-বৌদি সৈকত গুহ এবং উমা গুহ। বিয়ের রাতে নিষ্পাপ, ফুটফুটে বুলাকে খুন করে সাত-আট লাখ টাকার গয়না নিয়ে পালায় প্রিতম।'

'কী আশ্চর্য ! এই কেসের আসামি তো অরিজিতের ছোট ভাই প্রসেনজিৎ। এখন তো লক-আপে। ইন্সপেক্টর ঘোষরাই তো কেসটা ডিল করছেন। ওঁকে জিজ্ঞেস করুন না ?' বেশ রাগের ভঙ্গিতে বললেন অধ্যাপক ভট্টাচার্য।

'না, পরে জানা গেছে এই ব্যাপারে প্রসেনজিতের কোনও সম্পর্ক নেই।'

'কাকে বাঁচাবার চেষ্টা করছেন আপনি? লোকটা চোর। আমার সাতটা জুয়েল-বসানো পেপারকাটার ওর কাছ থেকে পাওয়া গেছে। ওটার দাম কম করে তিরিশ হাজার টাকা।'

'ওটা উনি চুরি করেননি। আপনার স্ত্রী ওঁর দাদা অপূর্ববাবুর জন্মদিনে উপহার হিসেবে ওঁর হাত দিয়ে পাঠাতে চেয়েছিলেন। ব্যাপারটা জানতে পারলে আপনি তুলকালাম কাণ্ড করবেন ভেবে প্রসেনজিৎবাবুকে ওটা গোপন রাখার অনুরোধ করেছিলেন আপনার স্ত্রী। উনি তাই ওটা হাতে আসার সোর্স জানাননি ইন্সপেকটরকে।'

আর একবার উত্তেজিত হলেন অধ্যাপক। 'আমার স্ত্রী মিসিং বলে এই গল্পটা আপনারা এখন চালাবার চেষ্টা করছেন!'

হাত তুলে অধ্যাপককে থামিয়ে দিয়ে কৌশিক বলল, 'আরও দু-চারটে কথা বলে নিই, তারপর যা বলার বলবেন। দ্বিতীয় কেসটিও শুভবিবাহ নিয়ে। কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে সম্বন্ধ করে বিয়ে। পাত্রীর নাম রুমা। পাত্রের বাবার নাম প্রণবেশ ব্যানার্জি। পাত্র অরুণোদয় চ্যাটার্জি। ছেলের কাকা-কাকিমাই বিয়ের যোগাযোগ করেছিল। ফ্ল্যাট কেনার জন্যে ধারবাবদ পাঁচ লাখ টাকা পাত্র আগেই হাতিয়েছিল। তারপর বিয়ের রাতে নতুন বউয়ের সাড়ে চার লাখ টাকার গয়না বাগিয়ে নিয়ে চম্পট। যাওয়ার আগে মেয়ের চূড়ান্ত সর্বনাশটাও করে গিয়েছিল অরুণোদয় নামের পাত্রটি।'

বিরক্ত হয়ে অধ্যাপক বললেন, 'এসব আমাকে শোনাচ্ছেন কেন?'

শান্ত গলায় উত্তর দিল গোয়েন্দা। 'শোনা দরকার বলে। আর একটু শুনুন। হায়দ্রাবাদের একজন বড় মুক্তোব্যবসায়ীর নাম শিবশঙ্কর সামন্ত। তাঁর ছেলের নাম সোমেন। কিন্তু ওই ভদ্রলোক বিদেশে থাকার সময় সোমেন সেজে ঝিমলিকে বিয়ে করে জাল সোমেন। এ বিয়েও খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে। সম্বন্ধ করে ছেলের কাকা নীলাঞ্জন সামন্ত। বিয়ের পরে ঝিমলির সঙ্গে সাত লক্ষ টাকার গয়না নিয়ে উধাও হয় ওর বর। ঝিমলিকে নিয়ে হানিমুন করতে সোমেন গিয়েছিল বাঙ্গালোরে। তারপর মোটা টাকার বিনিময়ে পরমাসুন্দরী ঝিমলিকে বেচে দেয় আরবের দুই শেখের কাছে। মেয়েটির কপাল ভাল, বিদেশ পাচার হয়ে যাওয়ার আগেই পুলিশ ওকে উদ্ধার করে হোটেল থেকে।'

আর একবার বিরক্ত হলেন অধ্যাপক। 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, এ খবর সবাই জানে। আরবের দুই শেখ ধরা পড়েছে। ধরা পড়েছে এক মাফিয়া ডনও।'

'ঠিক। মেয়ে পাচারের ব্যাপারে ওই মাফিয়া ডন শর্মার একজন গুরু আছে। গুরু দলের লোকদের দিয়ে মিথ্যে-মিথ্যে বিয়ে করিয়ে কিংবা চাকরির লোভ দেখিয়ে প্রচুর মেয়ে সংগ্রহ করে। ওই সব মেয়ের একটা অংশ বিক্রি হয় নিষিদ্ধ পল্লিতে। আর একটা অংশকে বিদেশে পাচার করা হয় চড়া দামে। বিদেশের ক্রেতাদের মধ্যে আছে সুলতান, শেখ, ড্রাগ লর্ড, আর্মস ডিলার ইত্যাদি। তেমন কোনও সুন্দরী মেয়ে বেচতে পারলে বিরাট অঙ্কের টাকা পাওয়া যায়।'

অধ্যাপকের কপালে কয়েকটি ভাঁজ পড়েছিল। 'গুরুটা ধরা পড়েনি?'

'পড়েছে'।

'কী নাম?'

কয়েক মুহূর্তে চুপ করে থাকার পরে কৌশিক খুব স্পষ্ট গলায় বলল, 'মাফিয়া ডন শর্মার অনেক লাইন। তবে মেয়ে পাচারের লাইনে শর্মার গুরুর নাম প্রফেসর মৃদুল ভট্টাচার্য।'

বিদ্যুতের ঝলক দেখা গেছে, এবার মেঘের বিকট ডাক ভেসে আসার কথা। রক্তের চাপে লাল হয়ে গিয়েছিল অধ্যাপকের মুখ। তবে মেঘের ডাক শোনা গেল না। অধ্যাপক দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, 'আমি গুরু আর শর্মা চেলা—।'

'চেলা একজন নয়, অনেক আছে। চেলা আজকের বর দিব্যজ্যোতিও। এটা অবশ্য মিথ্যে নাম। প্রিতম নামটাও মিথ্যে। ওই নাম নিয়েই ও বুলাকে বিয়ে করেছিল। তারপর বুলাকে খুন করে গয়না নিয়ে পালায়।'

রীতিমত ফুঁসে উঠল দিব্যজ্যোতি। 'মুখ সামলে কথা বলবেন।'

কৌশিক হাসল। 'এত মুখ সামলালে তো সত্যি কথা বলাই কঠিন হয়ে পড়বে। ওখানে যাঁরা দাদা-বৌদি সেজেছিলেন সেই সৈকত গুহ আর উমা গুহ, রুমার বিয়েতে কাকা-কাকিমা, ঝিমলির বিয়েতে ছেলের কাকা—সব এই এক জোড়া মানুষের নানান ভূমিকা। ওঁরাই আজকের নকল বর দিব্যজ্যোতির নকল বাবা-মা জ্যোতির্ময় সেন এবং মিসেস সেন।'

জ্যোতির্ময় সেন এই সব অভিযোগ শুনে ফেটে পড়া তো দূরের কথা, উত্তেজিত পর্যন্ত হলেন না। অসম্ভব ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 'আপনি কেন এই আষাঢ়ে গল্প শোনাচ্ছেন—বুঝতে পেরেছি। আসলে দোষটা আমাদেরই। আমি আর দিব্য কমলেশ ও মুখার্জিবাবুর সঙ্গে প্রাকটিক্যাল জোক করার সময় আপনি এসে পড়ে উলটোপালটা ভেবে নিয়েছেন—।'

'বাহ্! চমৎকার! আপনারা প্রত্যেকেই খুব বড় মাপের অভিনেতা। ক্রাইমের লাইনে না এসে নাটকের দল করলে অনেক ওপরে উঠতে পারতেন।'

কথাটার কোনও প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না জ্যোতির্ময় সেনের মধ্যে। বেশ আন্তরিক ভঙ্গিতে বললেন, 'এটা তর্ক করার সময় নয়। মস্ত বড় একটা মানবিক দিকের কথা ভাবতে হবে আমাদের সবার আগে। শ্রবণা আর দিব্যর এক্ষুনি দিল্লি যাওয়ার কথা। ফ্লাইটের আর বেশ দেরি নেই। শ্রবণার বাবা ভয়ঙ্কর অসুস্থ হয়ে দিল্লির এক নার্সিংহোমে পড়ে আছেন। উনি জানেন, সকালের ফ্লাইটে মেয়ে-জামাই এসে ওঁকে প্রণাম করবে। না গেলে ব্যাপারটা ওঁর পক্ষে খুব শকিং হবে। ওঁর শরীরের যা অবস্থা—এই অবস্থায় সেটা কোনওমতেই ঠিক হবে না। প্রফেসর ভট্টাচার্য আমাদের খুব বন্ধুলোক, ইন ফ্যাক্ট এই নিয়ে কাল রাত্তিরেই ওঁর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। তা, উনি সব শুনে বললেন—মেয়ের বাবার যখন এই অবস্থা, আপনাদেরও তো সঙ্গে যাওয়া উচিত। আমাকে কাল সকালের ফ্লাইটে দিল্লি যেতে হচ্ছে, তা আপনারা যদি বলেন ; ট্রাভেল এজেন্টকে আপনাদের জন্যেও দুটো টিকিটের কথা বলে রাখি—।'

কৌশিক মৃদু হেসে বলল, 'হ্যাঁ, টিকিট আপনাদের হয়েও গেছে। ট্রাভেল এজেন্ট ট্রিপস অ্যান্ড ট্রিপসের মধুবাবু আমাকে বলেছেন। যাত্রা যাতে নির্ঝঞ্ঝাট হয় তার জন্যে কমলেশকে আপনারা মারতে চেয়েছিলেন। সাক্ষী থাকার অপরাধে মুখার্জিবাবুকেও মরতে হত। ড্রাগ ইনজেক্ট করতেন শ্রবণাকে। ফ্লাইট আওয়ার্সে ও ঝিমোত। দিল্লিতে নেমে দশ লাখ টাকার গয়না হাতিয়ে চড়া দামে বেচে দিতেন শ্রবণাকে। তাই তো?'

জ্যোতির্ময় সেনের চোখের চাউনি অসম্ভব ধারালো হয়ে উঠেছিল। চৌকো চোয়ালের হাড় দ্রুত ওঠানামা করল কয়েকবার। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে বললেন, 'আমি তর্কাতর্কির মধ্যে ঢুকতে চাই না এখন। মুখের কথায় কাউকে দোষী প্রমাণ করা যায় না, সবই প্রমাণসাপেক্ষ। উপস্থিত আপনাদের কাছে একটাই অনুরোধ—আপনারা শ্রবণা মা'র মুমূর্ষু বাবার কথা একবার ভাবুন। ঈশ্বর না করুন, ওরা না গেলে উনি যদি—।'

গলা ছেড়ে হেসে উঠল কৌশিক। 'যাক, অভিনয়ের দিক থেকে এরা এবার আপনাদের হারিয়ে দিয়েছে। শ্রবণার বাবা অসুস্থ হয়ে দিল্লির নার্সিংহোমে পড়ে নেই। ওরা মা-বাবার নেপাল থেকে ফেরার পথে দুর্ঘটনায় পড়ার গপ্পোও বানানো। মা মারা যাননি। কমলেশ শ্রবণার মামা নয়। কোনও রক্তের সম্পর্কও নেই ওদের মধ্যে। কমলেশ ওর নামও নয়। ও হল গিয়ে গ্রুপ থিয়েটারের নামকরা এক অভিনেতা—সব্যসাচী সরকার। এখন একটু ছদ্মবেশ ধরে আছে। শ্রবণার নামও শ্রবণা নয়। শুধু মুখার্জিবাবুকে আসল ব্যাপারটা জানানো হয়নি। উনি পুরো ব্যাপারটাকে সত্যি ভেবেছেন বলে ওর পারফরম্যান্স আর সবাইকে ছাপিয়ে গেছে। ওই যে দশ লাখ টাকার গয়না—ওটাও নকল, গিল্টি করা। আপনাদের টোপ—।'

ধৈর্যের বাঁধ এবাব ভেঙে পড়ল জ্যোতির্ময় সেনের। দাঁত কিড়মিড় করে উঠল লোকটির। 'আমাদের নিয়ে চালাকি! এর ফল তোকে পেতে হবে শিগ্‌গিরই।'

আহত হওয়ার ভান করে কৌশিক বলল, 'আপনার মতো পাকা লোক, এত তাড়াতাড়ি খেপে গিয়ে তুই-তোকারি শুরু করলেন কেন? একটু ধৈর্য ধরুন। এক বরকে পাওয়া গেছে, আর এক বর তো এখনও আসেনি—।'

ইন্সপেক্টর ঘোষরায় অবাক হয়ে গোয়েন্দাকে জিজ্ঞেস করলেন, ''এই ছোকরা কি সব ক'টা বিয়েতে বর সাজেনি?''

উত্তরে অল্প হেসে কৌশিক বলল, ''অধ্যাপক ভট্চাযের হাতে একজোড়া কন্দর্পকান্তি ভিলেন আছে। এদের দেখলেই পাত্রী আর পাত্রীর বাবা-মা'রা অর্ধেক কাত হয়ে যায়। দ্বিতীয় বর এক্ষুনি এখানে এসে যাবে—।''

অধ্যাপক ভট্টাচার্য একটু চমকে উঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কার কথা বলছেন?'

'আপনি যার কথা ভাবছেন।'

বলার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সিঁড়িতে পায়ের শব্দ উঠল। কৌশিক বলল, 'ওই, এসে গেছে বোধ হয়।'

কিন্তু দ্বিতীয় বর নয়, যিনি ঢুকলেন তাঁকে দেখে রীতিমত ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিলেন অধ্যাপক মৃদুল ভট্টাচার্য। সুনেত্রা, অধ্যাপকের স্ত্রী। ওঁকে বেশ অসুস্থ দেখাচ্ছিল। ওঁর ঠিক পেছন-পেছন প্রমিতা। কৌশিক বলল, 'প্রমিতা, তুমি সুনেত্রাদিকে ওই ঘরে নিয়ে যাও। ওঁর বোধহয় শরীর ভাল লাগছে না।'

প্রমিতা সুনেত্রাকে ধরে ধরে ওদিকের ঘরে নিয়ে গিয়ে দরজা ভেজিয়ে দিল।

অধ্যাপক একটা ঢোক গিলে জিজ্ঞেস করলেন, 'সুনেত্রাকে কোথায় পাওয়া গেল?'

'আপনি ওকে কিডন্যাপ করে শহরতলির যে বাগানবাড়িতে রেখেছিলেন সেখানেই। আপনার প্ল্যান তো ছকা হয়ে গিয়েছিল। আপনি দিল্লি রওনা হয়ে যেতেন আর আপনার দ্বিতীয় কন্দর্পকান্তি ভিলেন আপনার স্ত্রীকে খুন করে মাটিতে পুতে ফেলত।'

অবাক হয়ে গোয়েন্দার দিকে তাকালেন অধ্যাপক। 'আমি আমার স্ত্রীকে খুন করাব! আমার লাভ?'

'লাভ? মস্ত লাভ। সুনেত্রাদি আর ওঁর দাদা অপূর্ববাবুর অগাধ সম্পত্তি। ওটা হাতাবার মতলব আপনার পাকা হয়ে গিয়েছিল। সুনেত্রাদি ওঁর বান্ধবী রিমিকে যে চিঠিগুলো লিখেছিল তার কয়েকটা হাতিয়ে আপনি ছোটখাটো কিছু জালিয়াতি করে ওগুলোকে প্রেমপত্র হিসেবে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। রিমির ডাক্তার বরকে লেখা চিঠিগুলো আপনার স্ত্রীর প্রেমপত্র হিসেবে ইন্সপেক্টর ঘোষরায়ের কাছে দাখিল করা হয়েছে। ডাক্তারকে অপহরণকারী বানিয়ে

পুলিশে রিপোর্ট করেছেন। ওদিকে আপনার কাজ ছিল স্ত্রীকে খুন করে মাটির নীচে পুঁতে ফেলা। ওঁর দাদা অপূর্ববাবুকে আপনিই ড্রাগ-অ্যাডিক্ট বানিয়েছেন। ওভারডোজ দিয়ে ওঁকে মেরে ফেলাটা খুব সহজ কাজ। তারপর ওই পরিবারের একমাত্র জামাই হিসেবে বিশাল সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী হতেন আপনি।'

নীচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরে অধ্যাপক বললেন, 'প্রমাণ?'

'প্রমাণ বেশ কয়েকটা আছে। আপনার স্ত্রীর চিঠিতে ছোটখাটো জালিয়াতিগুলো আপনার নিজের হাতে করা—সেটা ইতিমধ্যেই প্রমাণ করে ফেলেছেন মাস্টার ক্রিমিনোলজিস্ট শশাঙ্ক সেন। আর আপনার এই মতলবের ব্যাপারে প্রমাণসহ সাক্ষী দেবে মাফিয়া ডন শর্মা।'

অধ্যাপকের ফ্যাকাশে মুখ লালচে হয়ে উঠেছিল। কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন উনি, তার আগেই সিঁড়িতে ধস্তাধস্তির শব্দ উঠল।

একটু বাদে প্রায় ধস্তাধস্তি করতে করতেই মিন্টো পার্কের গেস্টহাউসের মস্ত বড় সিটিং-কাম-ডাইনিং হলে এসে ঢুকল অত্যন্ত রূপবান এক যুবক। লম্বা, দোহারা চেহারা। কাটা-কাটা চোখমুখ। গায়ের রঙ বেশ ফর্সা। ওর ঠিক পেছনে খালেক। খালেকের দিকে আঙুল তুলে যুবকটি বলল, 'গায়ে হাত তুলে কথা বলবে না। তোমাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি।'

পুলিশের আস্থাভাজন গুপ্তচর খালেক মাথায় একটু ছোট হলে কী হবে, বেশ তাগড়া চেহারা। নরম গলায় ও উত্তর দিল, 'আমি তো স্যার আপনার গায়ে হাত তুলিনি, আপনি ওপরে উঠতে চাইছিলেন না, তাই—।'

চারদিকে দ্রুত একবার চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে অধ্যাপকের দিকে তাকিয়ে যুবকটি বলল, 'আমি পরশু আপনাকে বলেছিলাম উটকো গাড়ির এই ড্রাইভার আর তার পাশের লোকটাকে আমার একেবারেই সুবিধের ঠেকছে না। ইটভাটার ওই রাস্তাটায় ধরতে গেলে কোনও প্রাইভেট কারই ঢোকে না। আমাদেরটা ঢুকল, খারাপ হল, আর সঙ্গে সঙ্গে আর একটা ফাঁকা গাড়ি চলে এল প্যাসেঞ্জার ধরার জন্যে। আমি আমার সন্দেহের কথা আপনাকে বলেছিলাম কিন্তু আপনি আমাকে কোনও পাত্তাই দেননি। এখন এরাই ফাঁসাবার তাল করছে।'

অধ্যাপকের চোখমুখ অসম্ভব রকমের গম্ভীর, কপালে বেশ কয়েকটা ভাঁজ। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে বললেন, 'এরা ফাঁসাবার তাল করছে মানে?'

'আপনি তো জানেন নার্ভের অসুখে একটু ভুগছি বলে ডাক্তার কয়েকটা দিন নিরিবিলিতে আমাকে বিশ্রাম নিতে বলেছে। তাই আপনার বাগানবাড়িতে গিয়ে উঠেছি। তো, ভোররাতে এই ড্রাইভার আর তার সঙ্গী ওই দুটো মাস্তানকে সঙ্গে নিয়ে ওখানে গিয়ে হামলা চালিয়েছে। কী ব্যাপার? না, বৌদিকে নাকি ওই বাড়িতে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। বাব্ বাবা। আমি লুকিয়ে রাখতে যাব কেন? বলল, খুন করে বাগানবাড়ির পেছন দিকে ঝোপের পাশে মাটিতে পুঁতে ফেলার জন্যে গর্তও খোঁড়া হয়ে গেছে। সত্যিই একটা গর্ত খোঁড়া হয়েছে দেখলাম। আচ্ছা, ওই বাড়িতে যে একটা চোরাকুঠুরি আছে—আপনি কি জানতেন? আমার মনে হয় না। কেনা বাড়ি তো। ওই চোরাকুঠুরি থেকে ওরা বৌদিকে নাকি উদ্ধার করেছে। আমার ঘর থেকে নাকি ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ আর মরফিনের অ্যাম্পুল পেয়েছে। ওই মরফিন ইনজেক্ট করে আমি নাকি বৌদিকে খুন করতাম। আমাদের বিরুদ্ধে কী সাঙ্ঘাতিক ষড়যন্ত্র বলুন তো? আমার মনে হয়, এসব ষড়যন্ত্র বৌদির ওই ইয়েটার—ওই যে জব্বলপুরের ওই ডাক্তারটার। ছি-ছি-ছি।'

কৌশিকের একটা হাতের পিস্তল আগের মতোই একটু উঁচুতে তোলা। অন্য হাত দিয়ে ওই হাতের নীচের দিকে একটু তালি বাজিয়ে ও বলল, 'চমৎকার! ক্রিমিনালদের এমন দল আমি এর আগে আর কখনও দেখিনি! প্রত্যেকেই যে শুধুমাত্র বড় মাপের অভিনেতা, তা নয়; অবস্থা বুঝে নাটক বানাতেও ওস্তাদ। সেটা না হলে অবশ্য শুভবিবাহের এই ব্যবসা এত কাল ধরে এই ভাবে চালিয়ে যেতে পারত না!'

ভদ্রক থেকে আসা কমলেশের যে দুই বন্ধু কাল সন্ধেয় নেমন্তন্ন খেয়ে গেছেন এখানে, তাঁদেরই হামলাবাজ মাস্তান বলেছে রূপবান যুবকটি। কৌশিক ওঁদের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলল, 'আপনাদের দুজনের আসল পরিচয়টা জানা গেল এবার। আপনারা মাস্তান, আর জব্বলপুরের ওই ডাক্তার আপনাদের ফিট করেছে এইসব ভদ্রলোককে বিপদে ফেলার জন্যে।'

দুজনের একজনের বয়েস তিরিশের আশেপাশে, আর একজন পঞ্চাশের ওপরে। বয়স্ক ভদ্রলোক মুচকি হেসে বললেন, 'ব্যাঙ্গালোরের অপূর্ব চক্রবর্তীর বাড়িতে ইঞ্জেকশনের যে সিরিঞ্জটা পাওয়া গেছে সেটা আর এটা—দুটোই জার্মানির একই কোম্পানির তৈরি করা। মরফিনের যে আম্পুলটা এখানে পেয়েছি, আর বাঙ্গালোর থেকে যেটা সিজ্ করা হয়েছে—এই দুটো আবার একই লটের মাল।'

একটু যেন চমকে উঠে অধ্যাপক ভট্টাচার্য জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনারা কারা?'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে বয়স্ক মানুষটি উত্তর দিলেন, 'ভাড়াটে গুণ্ডা। আমাদের ভাড়া করেছে জব্বলপুরের ওই ডাক্তার।'

হঠাৎই কেমন যেন চমকে-ওঠা মানুষের গলায় মুখার্জিবাবু বললেন, 'আরে! এই ছেলেটাই তো সেই সোমেন—ঝিমলির বর! অন্য ধরনের পোশাক পরার জন্যে আর গালে দু-তিন দিনের দাড়ি থাকায় চিনতে দেরি হল। তাই ভাবছি তখন থেকে কোথায় যেন দেখেছি! কোথায় যেন দেখেছি!'

গোয়েন্দা অল্প হেসে বলল, 'স্রেফ পরিস্থিতি, পরিবেশ পালটে গেলেই অল্প-চেনা মানুষগুলো অচেনা হয়ে যায়। তার ওপর কিছু মেক-আপ থাকলে তো কথাই নেই। আপনি এই জ্যোতির্ময় সেন আর মিসেস সেনকে আগে দেখেছেন, কিন্তু চিনতে পারেননি। অবশ্য এঁদের একটু দূর থেকে দেখেছেন। আর একবার দেখুন তো ভাল করে, চিনতে পারেন কি না!'

মুখার্জিবাবু দু-পা এগিয়ে এসে ছেলেমানুষের মতো তাকালেন মিস্টার সেন আর মিসেস সেনের দিকে। কিন্তু চিনতে পারার কোনওরকম চিহ্ন ফুটে উঠল না ওঁর মুখে।

পায়ে-পায়ে কৌশিকও ওই দুজনের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ ও জ্যোতির্ময়ের চুল ধরে এক টান মারতেই ওঁর মাথায় উইগটা উঠে এল হাতে। মাথাজোড়া মস্ত টাক নিয়ে একটু বিহুল চোখে চারদিকে তাকালেন জ্যোতির্ময়।

মুখার্জিবাবু এবার কেমন যেন আবিষ্কারকের উত্তেজনায় বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, এইবার চিনতে পেরেছি। সোমেন তো বাঙ্গালোরের সেই হোটেলে এঁদের হাতেই ঝিমলিকে তুলে দিয়ে এয়ারপোর্টে গিয়ে সরে পড়েছিল।'

প্রথম দফায় বিহুল হলেও জ্যোতির্ময় সেন দ্রুত সামলে নিলেন নিজেকে। ওঁর চোখেমুখে একটু বুঝি লালচে আভা ছড়িয়ে পড়েছিল। কৌশিকের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় বললেন, 'উইগ পরাটা অপরাধ নয়। যে-কেউ পরতে পারে। কিন্তু এ-ভাবে টান মেরে কারও মাথায় চুল খুলে নেওয়াটা অসভ্যতা! কী ভেবেছেন আপনারা? আমাদের নিয়ে যা-খুশি তাই করবেন!'

মুখার্জিবাবুর চিনে ফেলা সোমেন নামের ওই ছেলেটা উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল, 'ঝিমলি না ইমলি কাউকে আমি চিনি না। উলটো-পালটা কোনও পার্টির সঙ্গে আমাকে ভেড়াবেন না।'

প্রফেসর ভট্টাচার্য ভারিক্কি চালে বললেন, 'বাঙ্গালোরে অপূর্বর বাড়িতে যে ধরনের ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ পাওয়া গেছে, ঠিক সেই ধরনের সিরিঞ্জ আমার এখানকার বাগানবাড়িতেও—এসব কথার মানে কী? বাগানবাড়িটা আমার নিজের টাকায় কেনা, ওই বাড়িতে অপূর্বকে আমি কখনও ঢুকতে দিইনি। ওর সিরিঞ্জের জুড়ি এই বাড়িতে আসবে কোত্থেকে? তাছাড়া অপূর্বর বাড়ি থেকে ঠিক কী ধরনের সিরিঞ্জ বাঙ্গালোর পুলিশ সিজ্ করেছে সেটা তো এখানকার কারও জানার কথা নয়!'

বেশ বাহবা দেওয়ার গলায় বলে উঠল কৌশিক, 'বাহ্! এই না হলে মাস্টারমাইণ্ড! বিপদে পড়ার পরেও দেখছি আপনার মাথা কাজ করছে চমৎকার। খুব ভাল প্রশ্ন। তদন্ত চলছে। এই অবস্থায় পুলিশের বাজেয়াপ্ত-করা জিনিসপত্রের হদিস পাওয়া বাইরের লোকের সাধ্যের বাইরে। কিন্তু এমন যদি হয়—এঁরা বাইরের লোক নন!'

'মানে?'

'মানেটা মনে হয় আপনি কিছুটা আন্দাজ করতে পেরেছেন। যিনি ইঞ্জেকশনের ওই দুটো সিরিঞ্জের মিল ধরতে পেরেছেন, তিনি পুলিশেরই লোক। একটু ভেঙে বলি, ইনি বাঙ্গালোর পুলিশের ডি সি ডি ডি ওয়ান মিলন চৌধুরী।'

চৌধুরী মুচকি হেসে বললেন, 'আর আমার সঙ্গী ইয়াংম্যান হল গাঙ্গুলি। কৌশিকের কাউন্টারপার্ট ইন বাঙ্গালোর। কৌশিকরা আপনাদের ঝাড়েবংশে উৎখাত করার যে প্ল্যানটা ছকেছে, তা তুলনাহীন। অ্যান্ড ইট ওয়ার্কস ওয়ান্ডারফুলি।'

মিলন চৌধুরীর পরিচয় পেয়ে ধরা-পড়া এই ঝাঁকটা বেশ মিইয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সোমেন নামের ওই ছোকরা হঠাৎই কেমন যেন তেড়েফুঁড়ে উঠে বলল, 'আপনি যে সত্যি-সত্যি ডিসিডিডি, তার প্রমাণ কী?'

দোর্দণ্ডপ্রতাপ ইন্সপেক্টর অবনী ঘোষরায় ওই কথাটায় যেন জেগে উঠলেন। ওঁর গলায় এবার বাজ ডাকল। 'কোন্‌টা সত্যি আর কোন্‌টা মিথ্যে—চলো তোমাদের লক-আপে নিয়ে বোঝাই এক-এক করে। ভাঙবে তবু মচকাবে না! তখন থেকে সেরেফ চালাক-চালাক কথা!'

বাঘের গর্জনে এক্কেবারে ঠাণ্ডা মেরে গিয়েছিল সোমেন।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে অধ্যাপক ভট্টাচার্য কেমন যেন থেমে থেমে বললেন, 'যাঁদের ওপর আইনশৃঙ্খলা রক্ষার ভার, তাঁরা ইচ্ছে করলে নির্দোষ লোকেদের ওপর কিছু অত্যাচার চালাতে পারেন। কিন্তু দেশে আইন-আদালত আছে—। দোষী বানাতে গেলে তো প্রমাণ চাই। এই যে দিব্যজ্যোতি, বুলা মার্ডার কেসে একে আসামি বানাবার তাল করা হচ্ছে, কিন্তু প্রমাণটা কই?'

কৌশিকের পাতলা ঠোঁটে সূক্ষ্ম একটা হাসির রেখা ফুটে উঠেছিল। ও অধ্যাপকের প্রশ্নের উত্তরে বলল, 'আপনাদের অপরাধের সাক্ষ্য-প্রমাণ আমাদের হাতে কতটা কী এসেছে—সে সব জানার জন্যে আপনার অসম্ভব কৌতূহল হচ্ছে বুঝতে পারছি। ফাঁকা আওয়াজ কি না—তাও বাজিয়ে নিতে চাইছেন। না, একটা আওয়াজও ফাঁকা নয়। আজকের

এই দিব্যজ্যোতি সেদিন আর একটা মিথ্যে পরিচয় দিয়ে প্রিতম নাম নিয়ে বুলাকে বিয়ে করেছিল। তারপর শেষ রাতে গায়ের গয়না খোলার তাল করলে নির্ঘাত বাধা দিয়েছিল বুলা। ঠকিয়ে বিয়ে করা এই অপরাধীর পেশা। আর, ওর কাজ উদ্ধারের একটা সহজ রাস্তা হল খুন করা। ওর দিকে একবার তাকিয়ে দেখুন—হাতদুটো কী মজবুত! ওই হাতে নরম একটা গলার শ্বাস বন্ধ করে দেওয়া খুব সহজ কাজ। বুলার পোস্টমর্টেম হয়েছে। রিপোর্ট বলছে, গলা টিপে মারা হয়েছে মেয়েটিকে। সেদিনের সেই প্রিতম আর আজকের এই দিব্যজ্যোতিব ফিঙ্গার প্রিন্ট আর পোস্টমর্টেমে পাওয়া ফিঙ্গারপ্রিন্ট হুবহু এক।'

কথাটা শুনে অস্বাভাবিক গলায় হেসে উঠলেন প্রফেসর ভট্টাচার্য। 'দিব্যজ্যোতিকে এই তো সবে ধরা হয়েছে। ওর ফিঙ্গারপ্রিন্ট আর পোস্ট-মর্টেম রিপোর্টে পাওয়া ফিঙ্গারপ্রিন্ট নিশ্চয় মেলানো হয়নি এর মধ্যে?'

'না, মেলানো হয়নি। তবে মেলালে দেখা যাবে দুটো ছাপই একজনের।' ঠাট্টার হাসি ফুটে উঠেছিল অধ্যাপকের ঠোঁটে। 'এটা কি একটু গায়ের জোরের কথা হয়ে গেল না?'

'না, একেবারেই নয়। মেলালে দেখা যাবে, একেবারেই এক। তার কারণ—'

'কারণ?'

'কারণ আসামির পা।'

একটু হতচকিত দেখাল অধ্যাপককে। 'ফিঙ্গারপ্রিন্ট মানে তো আঙুলের ছাপ, হাতের ছাপ। হাত থেকে পা! ব্যাপারটা তো ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

কৌশিক ওর হাতের পিস্তলটা নাড়াতে নাড়াতে বলল, 'এই পা-ই আমাকে রহস্য-সমাধানের পথ দেখায় প্রথম। বুলার খুনের তদন্ত করতে গিয়ে ওর কাকা প্রসেনজিতের কাছে শুনলাম—পাত্রের জুতো কিনতে গিয়ে ঘণ্টাতিনেক এ-দোকান সে-দোকান করতে হয়েছে। কেন? প্রসেনজিতের উত্তরটা পরিষ্কার মনে আছে আমার। বলেছিল: পাত্রকে খুব হ্যান্ডসাম দেখতে হলে কী হবে, পা-দুটো রাম-চাষাড়ে। পেল্লায় সাইজের পা। বিস্তর ঘোরাঘুরির পরে ওই মাপের জুতো পাওয়া গেল পার্ক স্ট্রিটের একটা দোকানে।'

কৌশিকের কথা শুনে সবারই চোখ গিয়েছিল দিব্যজ্যোতির পায়ের দিকে। সত্যিই অস্বাভাবিক বড পা!

একটু কেশে গলা পরিষ্কার করে আবার মুখ খুলল গোয়েন্দা। 'পাত্রের দাদা জুতো কেনার সময় প্লাস্টিকের একটা প্যাকেট রাখতে দিয়েছিল প্রসেনজিৎকে। পরে ওটা ফেরত নিতে ভুলে যায়। প্যাকেটের সম্পত্তির মধ্যে ছিল একটা সারের দোকানের ক্যালেণ্ডার আর পোকায় কাটা হলুদ-হয়ে-যাওয়া একটা পুরনো ছবি। ক্যালেন্ডারে গ্রামের ঠিকানা ছিল। ছবির পেছনে রবারস্ট্যাম্প, সেখানেও ঠিকানা। চণ্ডীতলা, চণ্ডীপুর। বিস্তর খোঁজাখুঁজি করে ওই চণ্ডীতলায় পৌঁছে গেলাম একদিন। ছবিতে বছর-বিশ আগের এক মা-ছেলের ছবি আছে। জানতে পারলাম ছবির ওই মায়ের নাম সাবিত্রী, ছেলের নাম হাত-পা। অদ্ভুত নাম হাত-পা! জিজ্ঞেস করলাম, কেন এরকম নাম? কারণটা বেশ মজার। ছেলেটাকে দেখতে দারুণ সুন্দর, কিন্তু পা-দুটো অস্বাভাবিক বড়। সবাই মজা করে তাই বলত—হাতির পা, তার থেকে হয়ে গিয়েছিল হাত-পা।'

দিব্যজোতির দিকে তাকিয়ে কৌশিক বলল, 'ছবিটার কথা মনে পড়ছে?'

রীতিমত ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল যুবকটির চোখমুখ। 'ছবিটা কোথায়?'

'আমি যত্ন করে রেখে দিয়েছি। পরে দেব। তোমার তো শুনেছি মা-অন্ত প্রাণ।' দিব্যজ্যোতির মুখটা নীচের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল খানিকটা।

প্রফেসর ভট্টাচার্য অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোন্ ছবির কথা হচ্ছে?'

চাপা ধমকের গলায় কৌশিক বলল, 'মনে পড়ছে না? ছবি কেনার জন্যে চণ্ডীতলায় তো আপনিই গিয়েছিলেন। চণ্ডীমাতা স্টুডিওর বেশ কিছু ছবি আপনি কিনে এনেছেন রাধাগোবিন্দ গিরি আর মাধবরঞ্জন গিরির কাছ থেকে। তখন আপনার এই ছাগলদাড়ি ছিল না। আপনার থুতনির বড় আঁচিলটার কথা ওঁদের মনে আছে। ডেকান হেরাল্ডের সাক্ষাৎকারে আপনার যে ছবিটা বেরিয়েছে সেটায় দাড়ি নেই। থুতনির আঁচিলটা জ্বলজ্বল করছে। পরে একদিন ওই ছবিটা দেখিয়ে গিরিদের জিজ্ঞেস করে জেনেছিলাম—এই লোকই। হাত-পা'র আর এক নাম হরি। মা-অন্ত প্রাণ হরির মা মারা গেলে বিবাগী হয়ে ঘর ছাড়ে। সেই মায়ের ওপর আজও ওর অসম্ভব টান। চণ্ডীমাতা স্টুডিও থেকে ওর মায়ের ছবিগুলো আপনি কিনে এনেছিলেন—মায়ের ছবি দেখিয়ে ওকে বশে রাখার জন্যে। তবে একটা জিনিস আমার অদ্ভুত লাগছে! মনস্তত্ত্ববিদ্‌রা হয়তো এর উত্তর জানেন। যার এমন মা-অন্ত প্রাণ, সে অন্য মেয়েদের অবলীলায় খুন করে কী ভাবে!'

ইন্সপেকটর ঘোষরায় ধাঁধা ধরে ফেলার মতো চোখমুখ করে বললেন, 'এইবার বুঝতে পারছি প্রণবেশ ব্যানার্জির মেয়ে রুমার বর গয়না নিয়ে ভেগে পড়ার পরে তুমি কথাটা বলেছিলে?'

'কোন্ কথাটা?'

'ওই যে আমি বলেছিলাম—বুলা মার্ডার কেসের বর আর এই বরটা একই। তুমি আমার কথার জবাবে বেশ জোর দিয়ে বলেছিলে, না— এক নয়। আসলে বরের ফেলে যাওয়া সাধারণ মাপের চটিটা তো তুমি তার আগেই দেখে ফেলেছ। পায়ের মাপ যে তখন মস্ত বড় এক সূত্র— আমি তো আর জানি না। যদি জানতাম তাহলে আমাদের বড় সাহেবের ধমকের জবাবে বলতে পারতাম: খামোখা ধমকাবেন না আমাকে, এই হল আমার তদন্তের নমুনা। আমাকে আমার মতো কাজ করতে দিন।'

ইন্সপেকটরের ঠিক পেছনে ঝোলা গোঁফ যে মানুষটি দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি বললেন, 'আমি কিন্তু আপনাকে কখনও ধমকাইনি।'

গলার স্বর বেশ চেনা-চেনা ঠেকল ঘোষরায়ের কাছে, উনি তীক্ষ্ণ চোখে ঝোলা গোঁফের দিকে তাকালেন। প্রথমে একটানে ঝোলা গোঁফ উপড়ে ফেলল লোকটা, পরের টানে কাঁচাপাকা জোড়া-ভুরু। ইন্সপেকটর ঘোষরায় অ্যাটেনশন হয়ে বললেন, 'স্যার আপনি! লালবাজারের স্পেশাল প্লেন ক্লোদ সিকিউরিটি সেজে আপনি নিজেই এসেছেন।' উত্তরে ছদ্মবেশ ছেড়ে সদ্য বেরিয়ে-আসা মানুষটি জানালেন, 'হ্যাঁ, আপনারা এত বড় একটা র‍্যাকেট ধরছেন, আমাদের কি সরে থাকা উচিত। মিলন আমার ব্যাচমেট, টেলিফোনে আমরা আমাদের স্ট্র্যাটেজি ঠিক করে নিয়েছিলাম। অবশ্য আমাদের স্ট্র্যাটেজি বলা ঠিক নয়। পুরো অপারেশনটাই কৌশিকের, আমরা শুধু ডিটো মেরে গিয়েছি। তাই তো?' মিলন চৌধুরী বেশ চড়া গলায় সমর্থন করলেন, 'কারেক্ট।' প্রশংসা শুনে বিব্রত হল কৌশিক, তারপর অধ্যাপক ভট্টাচার্যের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কলকাতার ডিটেকটিভ

ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি কমিশনার সুপ্রকাশ তরফদার আপনার তো খুব চেনা মানুষ। সেদিন বলছিলেন। তা, ইনিই তো সেই চেনা মানুষ। এখন আর চিনতে পারছেন না?'

জবাবে নীচের দিকে মাথা নামালেন অধ্যাপক।

তরফদার বললেন, 'চেনা ছিল না, তবে এই তো হয়ে গেল। এমন একজন গুণী মানুষের সঙ্গে একবার পরিচয় হলে সারা জীবনে তাঁকে ভোলা কঠিন।'

কথাটা শেষ করেই ডিসি পকেট থেকে সেলফোন বার করলেন, তারপর খুব নিচু গলায় কী-সব কথাবার্তা সেরে নিয়ে কৌশিক আর চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমাদের এবার এদের নিয়ে হেডকোয়ার্টার্সে যেতে হবে, ওঁরা সবাই এসে গেছেন।'

কথায় সায় দিল কৌশিক, তারপরেই বিদ্যুৎগতিতে লাফ দিয়ে অধ্যাপক ভট্টাচার্যের পিস্তল বার করা হাতটা তুলে ধরল সিলিংয়ের দিকে। গোয়েন্দার হাত প্রফেসরের কব্জিতে। কব্জিতে চাপ দিতেই প্রফেসরে চোখেমুখে যন্ত্রণার ছাপ ফুটে উঠেছিল। প্রকাণ্ড শরীর নিয়ে ইন্সপেকটর ঘোষরায় ছুটে এসে বাকি কাজটা সারলেন। হাত মুচড়ে কেড়ে নিলেন পিস্তল।

এই ঘটনায় পুলিশ অফিসারদের মধ্যে জোর একটা তৎপরতা শুরু হয়ে গিয়েছিল। তরফদার আর চৌধুরী— দুজনের হাতেই পিস্তল। দুজনেই নিজের নিজের লোকেদের দিকে তাকিয়ে ধরা পড়া চক্রের প্রত্যেকের তল্লাশি নিয়ে বললেন। বাইরে একটা গাড়িতে একজন মহিলা পুলিশ ছিলেন, তিনি এসে সার্চ করলেন মিসেস সেনকে। দুই বরের একজনের কাছে একটা ছুরি অন্যজনের কাছে একটা ক্ষুর ছাড়া আপত্তিকর আর কিছুই পাওয়া গেল না।

পুরো দলটাকে সঙ্গে নিয়ে পুলিশের পাঁচ ছ'টা গাড়ি যখন লালবাজার হেডকোয়ার্টার্সের পথ ধরল তখন আকাশে দিনের প্রথম আলো ফুটে গেছে। মিন্টো পার্ক থেকে লালবাজারের দূরত্ব সামান্যই, তার ওপর আবার ভোরের ফাঁকা রাস্তা; সুতরাং গাড়িগুলো চটপট পৌঁছে গেল পুলিশ-হেডকোয়ার্টার্সে।

।। পঁচিশ ।।

ডেপুটি কমিশনারের ঘরে বসেছিলেন বুলার বাবা অরিজিৎ রায়; প্রণবেশ ব্যানার্জি, ওঁর স্ত্রী আর মেয়ে রুমা; ঝিমলির বাবা ও মা— প্রিয়ব্রত ও তমালিকা। তিনটি পরিবারই শুভবিবাহ নামের ব্যবসার শোচনীয় শিকার। ডেপুটি কমিশনারের অফিসের লোকজন ওঁদের এখানে নিয়ে আসার কারণ খুব স্পষ্ট করে জানাননি। তবে হাবেভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন— অপরাধীদের চিনিয়ে দেওয়ার জন্যেই আনা হয়েছে।

লালবাজারে পা দেওয়ার আগেই ওঁদের মধ্যে বোধহয় ভয়ংকর আক্রোশে ফেটে পড়ার একটা অবস্থা তৈরি হয়ে গিয়েছিল। পাক্কা ভিলেন দুই বর আর ওদের নকল দাদা-বৌদি

কাম কাকা-কাকিমাকে দেখিয়ে ডেপুটি কমিশনার তরফদার শুধু একবার জিজ্ঞেস করেছিলেন— এদের চেনেন কি? ব্যস, আর কিচ্ছু নয়, কিন্তু ওই একটিমাত্র প্রশ্ন যে এতখানি বিস্ফোরক হয়ে উঠবে— কেউ বোধহয় কল্পনাও করতে পারেনি।

ঠাণ্ডা মাথার মানুষজনরা ওদের দেখে খেপে উঠেছিলেন প্রচণ্ডভাবে। মুখের সঙ্গে সঙ্গে ওঁদের হাতও চলেছিল। এটা যদি পথেঘাটে হত, নিমেষে আরও কিছু লোকজন জুটে যেত; তারপর পুরো ব্যাপারটা পিটিয়ে মারার দিকে বাঁক নিত দ্রুত।

পুলিশের একটা গোটা দল ঝাঁপিয়ে পড়ে মার খাওয়ার হাত থেকে অপরাধীদের উদ্ধার করে পাশের ঘরে নিয়ে গিয়েছিল। ডেপুটি কমিশনার পাত্রীদের অভিভাবকদের অতি কষ্টে সামলাবার পরে বললেন, 'আইডেন্টিফিকেশনের কাজটা উপস্থিত মিটে গেছে। পরে দরকার পড়লে আবার আপনাদের ডাকব। এখন আপনারা আসুন।'

অভিভাবকরা ভয়ঙ্কর উত্তেজিত হয়ে গিয়েছিলেন। ওঁদের শান্ত করতে গিয়ে রীতিমত বেগ পেতে হয়েছিল ডেপুটি কমিশনার সুপ্রকাশ তরফদারকে। শেষে উনি দু-হাত তুলে বলেছিলেন, 'আপনারা দয়া করে শান্ত হোন। আইনকে আইনের পথে চলতে দিন। শিগ্‌গিরই আপনাদের আদালত থেকে ডেকে পাঠানো হবে। তখন আপনারা যা বলার সব বলবেন। আপনাদের কারও সঙ্গে যদি নিজস্ব ট্রান্সপোর্ট না থাকে, আমাদের গাড়ি আপনাদের বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসবে।

উত্তেজিত অভিভাবকরা তারপর একটু শান্ত হয়ে এক-এক করে দোতলা থেকে নীচে নেমে গিয়েছিলেন।

সকালের হাওয়া এখনও বেশ ঠাণ্ডা, কিন্তু অবস্থা আয়ত্তে আনতে গিয়ে ডিসির কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠেছিল। উনি নিজের ঘরে ফিরে রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছে নিয়ে ঝকঝকে মুখে বললেন, 'যাক, আইডেন্টিফিকেশনেব পর্ব শেষ। কৌশিক, তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। বিরাট এক চক্রকে ধরেছ তুমি। শুধু টাকাপয়সা, গয়নাগাটি লুঠপাট নয়; সামাজিক দিক থেকে দেখতে গেলেও এই ধরনের অপরাধের তুলনা মেলা ভার। তুমি অনেকের চোখ খুলে দিয়েছ। কাগজে, টিভিতে এই খবরগুলো নিশ্চয়ই জায়গা পাবে অনেকটা। অভিভাবকরা তার ফলে আরও সতর্ক হয়ে যাবেন।'

প্রশংসা শুনে রীতিমত বিব্রত হয়ে পড়েছিল তরুণ গোয়েন্দা কৌশিক। ঢোক গিলে কোনওমতে বলল, 'যা করার তা তো আপনারাই করলেন, আমি শুধু—।'

বাঙ্গালোরের ডেপুটি কমিশনার মিলন চৌধুরী হাত তুলে ওকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'যোগ্য লোককে আমরা একটু প্রাণ খুলে প্রশংসা করতে চাই, তুমি বাগড়া দেবার কে হে? কথায় বলে, গুণীর প্রশংসা শত মুখে হওয়া দরকার। সেখানে ক'টা মুখ তোমার কতটুকু প্রশংসা করেছে? অ্যাঁ?'

ডিসি তরফদার বললেন, 'কৌশিক, তোমার তদন্ত-কাহিনীর কিছু-কিছু এখনও আমাদের কাছে ধাঁধা রয়ে গেছে— সেগুলো এবার চা খেতে খেতে শোনা যাক। এই হালদার, চা বলো। আর শোনো, পাশের ঘর থেকে ওই ক্রিমিনালগুলোকে নিয়ে এসে দেয়ালের ধারের বেঞ্চিটায় বসিয়ে দাও তো—। রহস্য সমাধানের কাহিনী শুনতে শুনতে ওদের প্রতিক্রিয়াগুলোও জানা দরকার।'

একটু বাদেই অপরাধীদের দল এ-ঘরে এসে নির্দিষ্ট বেঞ্চিটায় বসল গুম হয়ে। দুই বরের পাঞ্জাবি আর শার্ট মেয়ের বাড়ির লোকদের আক্রমণে ফালা-ফালা হয়ে গেছে।

অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই গরম চা এসে গেল।

চায়ের কাপে বেশ বড় রকমের একটু চুমুক দিয়ে তরফদার গোয়েন্দার দিকে তাকিয়ে

জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, এই প্রফেসর মৃদুল ভট্টাচার্য তো খুব গুণী লোক। ওঁর ট্রাইবালদের ওপর কাজ তো দেশবিদেশে বেশ বড় রকমের রিকগ্নিশন পেয়েছে। ওঁর বেশির ভাগ সময় কাটে পড়াশুনো নিয়ে। এই সব মানুষকে সন্দেহ করার ব্যাপারটা তো কারও মাথাতেই আসবে না। তোমার এল কী করে?'

লাজুক মুখে জবাব দিল গোয়েন্দা। 'আসার কথা নয়। ঘটনাচক্রে এসে গেছে। বুলা মার্ডার কেসে সাজানো বর প্রীতমের সাজানো দাদা-বৌদি ছিল সৈকত গুহ আর উমা গুহ। ওরা কিন্তু ইন্সপেক্টর ঘোষরায়ের জালে ধরা পড়েছিল একবার। আইডেন্টিফিকেশনের জন্যে অবনীদা প্রসেনজিৎকে ডেকেছিলেন। কিন্তু ওদের মেক-আপ তখন আমূল পালটে গিয়েছিল। তার ফলে প্রসেনজিৎ বলেছিল— না, ওদের সে চেনে না। তবে ওই মহিলার সঙ্গে ছেলের ওই বৌদির কোথায় যেন একটা মিল আছে।'

ইন্সপেক্টর ঘোষরায় একটু থতমত খেয়ে গিয়ে বললেন, 'ওরা ওদের নিজেদের নামধাম উলটোপালটা বলেছিল, কিন্তু রেফারেন্সটা তো জেনুইন। এই যেমন ট্রাভেল এজেন্টের নাম—। গেস্টহাউস বুকিং করার রেফারেন্সেও গোলমাল ছিল না। ওখানে রেফারেন্স হিসেবে প্রফেসর মৃদুল ভট্টাচার্যের নাম ছিল। ইনকুয়ারি করি। মিস্টার গুহ আর মিসেস গুহকে চিনতেও পেরেছিলেন প্রফেসর। কী করে বুঝব যে ব্যাপারটা ইচ্ছে করেই অর্ধেক সত্যি আর অর্ধেক মিথ্যে করে রাখা হয়েছে।'

'ওই ধরনের বিপদে পড়লে যাতে পালাবার সুযোগ পাওয়া যায়— সেই জন্যেই ওটা করা। এ দিকে আবার প্রফেসর ভট্টাচার্যকেও ঝুঁকির মধ্যে পড়তে হচ্ছে না। ট্রেনের কোনও সহযাত্রী ট্রাভেল এজেন্ট বা গেস্টহাউসের ঠিকানা জানতে চাইলে— জানা থাকলে দিতে দোষ কোথায়! আপনি যা করেছেন, আপনার জায়গায় অন্য কেউ থাকলেও তাই করত। তবে আমি প্রফেসারের একটা কথার মধ্যে গলদ ধরতে পেরেছিলাম পরে।'

'কীরকম?'

'প্রফেসর আপনাকেই বলেছিলেন, পঁচিশে অক্টোবর চেন্নাইয়ের একটা কনফারেন্স সেরে হাওড়া মেলে ফিরছিলেন—। ট্রেনেই ওঁর সঙ্গে মিস্টার আর মিসেস গুহর আলাপ হয়। আপনার মুখ থেকেই শুনেছিলাম— ওই অক্টোবরেই ওঁর একটা মস্ত ইন্টারভিউ বেরিয়েছে ডেকান হেরাল্ডে। তা ভাবলাম, অধ্যাপকের সঙ্গে একটু কথা বলা দরকার। কিন্তু কিছুই তো ওঁর সম্পর্কে জানি না— কথা বলা একটু সহজ হবে ডেকান হেরাল্ডটা পড়ে গেলে। তা ওই পত্রিকার পুরনো ফাইল ঘেঁটে সাক্ষাৎকারটা পড়লাম। পাতা ওলটাবার সময় আর একটা খবরের ওপরেও চোখ পড়েছিল আমার। খবরটা প্রবল বর্ষার। প্রবল বর্ষায় চেন্নাইয়ে রেললাইন ডুবে যাওয়ায় চেন্নাই থেকে অনেকগুলো ট্রেন ছাড়তে পারেন দুদিন— পঁচিশ আর ছাব্বিশ অক্টোবর। বাতিল-হওয়া ট্রেনের মধ্যে হাওড়া মেলও ছিল। পরে প্রফেসরের সঙ্গে যখন আমার আলাপ হয়— কথায়-কথায় উনি আমাকে জানিয়েছিলেন, ওই পঁচিশ তারিখেই চেন্নাই থেকে হাওড়া মেলে চেপেছেন। সাতাশ তারিখ কলকাতায় ফিরে একটা গ্রুপ ডিসকাশানও অ্যাটেন্ড করেছেন। বুঝলাম, কোথাও একটা গোলমাল রয়ে গেছে। প্রফেসরের ওপর সেই আমার সন্দেহের শুরু।'

তারিফ করার গলায় চৌধুরী বললেন। 'চমৎকার! তারপর?'

একটু হেসে উত্তর দিল গোয়েন্দা। 'তারপর আর কী, এক রাত্তিরে হানা দিলাম প্রফেসরের বাড়িতে। ড্রয়ার, আলমারি হাতড়াতে গিয়ে সন্দেহজনক কিছু কাগজপত্র পেয়েছিলাম। বান্ধবী রিমিকে লেখা সুনেত্রাদির গোটাচারেক চিঠি সামান্য অদলবদল করে বান্ধবীর বর জব্বলপুরের ওই ডাক্তারকে লেখা প্রেমপত্র বানানো হয়েছে। আর গোটাতিনেক ফিনিশিং

টাচ দেওয়ার মুখে। ওই চারটে চিঠি, প্রফেসরের হাতের লেখা, আর কিছু ঠিকানাপত্তর, ছবি নিয়ে সরে পড়েছিলাম। পরে প্রফেসর বাড়ি ফিরে চুরির দায়ে কাজের লোককে তাড়ান। ওদিকে ইন্সপেক্টর ঘোষরায় দামি পেপারকাটার সমেত প্রসেনজিৎকে ধরে প্রফেসরের কাছে খবর পাঠালে উনি ধরে নেন—প্রসেনজিৎই চিঠি আর দরকারি কাগজপত্র হাতানোর মূলে। এ-ব্যাপারে মাথা নির্ঘাত সুনেত্রাদির দাদা অপূর্ব। অপূর্বকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেওয়ার মতলবটা মনে হয় ওই ঘটনার আগেই পাকা করে ফেলেছিলেন অধ্যাপক। প্রসেনজিৎ ওদিকে পুলিশের জালে জড়িয়ে গেলে খুব ভাল, না হলে পরে ওকেও খতম করে দিতেন প্রফেসর। যাই হোক, এই ব্যাপারে প্রসেনজিতের ওপর নজরটা ঘুরে যাওয়ায় আমরা নিশ্চিন্তে কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলাম কিছুটা।'

ঘরের মধ্যে এতগুলো মানুষ কিন্তু কারও মুখে কোনও কথা নেই। প্রত্যেকেই অখণ্ড মনোযোগের সঙ্গে রহস্যের জট ছাড়াবার গল্প শুনছিল। চায়ের কাপে আর একটা চুমুক মেরে গোয়েন্দা বলল, 'ওই চারটে চিঠি আর প্রফেসরের হাতের লেখা কিছু কাগজপত্র ক্রিমিনোলজিস্ট শশাঙ্ক সেনকে দিয়েছিলাম পরীক্ষা করার জন্য। কয়েকদিন পরে উনি ওঁর ফাইন্ডিংস জানালেন আমাকে। বললেন, বন্ধুকে লেখা নির্দোষ চিঠিগুলোকে প্রায় নিখুঁত কিছু জালিয়াতি করে রগরগে প্রেমপত্র বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সঙ্গে যার হাতের লেখা দেওয়া হয়েছে, জালিয়াতিটি তারই হাতের কাজ। সঙ্গের বাকি লেখাপত্তর প্রফেসরের নিজের হাতে লেখা। তার মানে জালিয়াতের নাম প্রফেসর মৃদুল ভট্টাচার্য।'

প্রফেসরের লালচে চোখমুখ নীচের দিকে আরও কিছুটা ঝুঁকে পড়েছিল।

আবার মুখ খুলল গোয়েন্দা। 'এই ব্যাপারে আমি ইনফর্মার মধুসূদন পুরকাইতের কাছ থেকে অনেক সাহায্য পেয়েছি। প্রফেসরের ঘরে রাত্তিরবেলায় হানা দিয়ে যে ঠিকানাপত্তরগুলো হাতিয়েছিলাম—মধুসূদনকে সেগুলো ধরিয়ে দিয়ে বললাম, খোঁজ নিন। প্রফেসরের ছবি দেখিয়ে বললাম, ওঁর ওপরেও নজরদারি করুন যতক্ষণ উনি বাইরে বাইরে থাকেন। তা, এই ব্যাপারে মধুসূদন আমাকে খুব মূল্যবান কিছু খবর এনে দিয়েছে। শহরতলির মস্ত ওই বাড়িটি—প্রফেসর যেটি ওঁর কেনা বলে দাবি করছেন— সেটা ওঁর কেনা নয়।'

কথাটা কানে যেতেই ঝুঁকে-পড়া মাথাটা এক ঝটকায় ওপরে তুললেন প্রফেসর। কৌশিকের দিকে ওঁর চোখ। চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে পড়ছিল।

কৌশিক আগের মতোই শান্ত গলায় কথা শুরু করল আবার। 'বাগানবাড়ি কেনেননি, অন্য একটি বিয়ের সুবাদে পেয়েছেন অধ্যাপক। তবে যৌতুক হিসেবে নয়। কয়েক বছর আগে বিরাট এক সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী মাঝবয়সী এক বিধবাকে বিয়ে করেছিলেন প্রফেসর। বিয়ের বছর-দুয়েকের মাথায় ওঁর স্ত্রী রহস্যজনকভাবে উধাও হয়ে যান। প্রফেসর তখন স্থানীয় থানায় গিয়ে জানালেন, এক গুপ্ত প্রেমিকের সঙ্গে ওঁর স্ত্রী ভেগে গিয়েছে। প্রমাণ হিসেবে উনি স্ত্রীর প্রেমপত্রের দু-তিনটি ড্রাফ্‌ট থানায় জমা দিয়েছিলেন। আমার মনে হয়, এখন সুনেত্রাদির জন্যে যেখানে কবর খোড়া হয়েছে—তার ঠিক পাশেই নিখোঁজ ওই মহিলাকে খুন করে মাটিতে পুঁতে ফেলা হয়েছে।'

উত্তেজনায় এবার ফেটে পড়লেন প্রফেসর ভট্টাচার্য। 'বানানো গল্পেরও একটা মাত্রা থাকা দরকার। যা খুশি তাই বলে যাবে। কী ভেবেছ তুমি!'

দুই ডেপুটি কমিশনার হাত তুলে থামালেন প্রফেসর ভট্টাচার্যকে।

আগের মতোই শান্ত গলায় ফের কথা শুরু করল কৌশিক। 'ওই থানার পুরনো ফাইলে ওই প্রেমপত্রগুলো এখনও আছে। সঙ্গে আছে ওই মহিলার স্বামী অধ্যাপক মৃদুল ভট্টাচার্যের লিখিত অভিযোগ। তবে হ্যাঁ, মহিলাকে খুন করে পুঁতে ফেলার ঘটনাটা এখনও আমার

অনুমান। ওই বাগানবাড়িতে সুনেত্রাদির জন্যে হাত-চারেক মাটি খোঁড়া হয়েছে। ওই গর্তের ঠিক পাশেই হাতচারেক জায়গায় একই মাপের কিছু গাছপালা গজিয়েছে। গাছপালাগুলোর বয়েস মনে হয় বছর-সাতেক। আমি নিজে গিয়ে দেখে এসেছি। আজ সকালেই ওই জায়গাটার মাটি খোঁড়া হবে। আমি যা অনুমান করেছি, সেটা মনে হয় ভুল হবে না। ভুল হলেও কিন্তু প্রফেসর ভট্টাচার্যের আর বাঁচার উপায় নেই। ওঁর অন্য অনেক অপরাধের সাক্ষ্য-প্রমাণ আমাদের হাতে এসে গেছে।'

তরফদার বললেন, 'আচ্ছা, তুমি আমাদের শিল্পী সি. প্রসাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলে শুনলাম। ওর সাহায্য কি এই সব ব্যাপারেই? না কি অন্য কিছু— ?'

'না-না, এই সব ব্যাপারেই। আসলে অধ্যাপক বড্ড পাকা মাথার মানুষ। উনি আমাদের এগোবার প্রায় সব ক'টা পথই বন্ধ করে দিয়েছিলেন।'

'কীরকম ?'

'আচ্ছা, আপনারাই বলুন এই যে শুভবিবাহের এতগুলো অনুষ্ঠান হয়ে গেল— কিন্তু কোথাও কি বিয়ের একটাও ছবি উঠেছে? ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার দাপট দিন কে দিন বেড়ে চলেছে এখন। মধ্যবিত্তের বিয়েতেও আজকাল ভিডিও ক্যামেরা চলে আসে। কিন্তু এই যে এতগুলো বড়লোকের বাড়িতে বিয়ে হয়ে গেল— অথচ কোথাও একটা ছবিও ওঠেনি। উঠলে বরকে কেমন দেখতে আমরা জানতে পারতাম। বরের তরফের লোকদের ছবিও হাতে আসত। তেমন হলে তদন্তের কাজে সুবিধে হত বিস্তর।'

'ঠিকই তো। কিন্তু বর বা বরের তরফের লোকদের ছবি তোলানো এরা বন্ধ করল কী ভাবে?'

চৌধুরীর প্রশ্নের উত্তরে একটু কাঁধ ঝাঁকিয়ে কৌশিক বলল, 'সবাই এই দলের নেতার পাকা মাথার চাল। প্রতিটি জায়গাতেই কায়দা করে এবং পাত্রিপক্ষকে কিছুটা চাপের মধ্যে রেখে রেজিস্ট্রি বিয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অনুষ্ঠান, পার্টি পরে হবে— আগে বিয়েটা হয়ে যাক। আকাশের চাঁদমার্কা পাত্র। যেমন রূপ তেমনি গুণ, ওদিকে আবার কোনও দাবিদাওয়া নেই। সুতরাং এদের সব কথাই পাত্রিপক্ষ শুনত। বিয়ের দু-একদিন আগে একটা গল্প শোনানো হত। একটু ঘুরিয়েফিরিয়ে একই গল্প সব জায়গায়। গল্পটা এইরকম : বরের ছোটমামা তার এক দিদির বিয়েতে ছবি তোলার সময় ন্যাড়া ছাত থেকে পড়ে গিয়ে মারা যান। সেই থেকে এই বাড়ির বিয়েতে ছবি তোলা নিষিদ্ধ হয়ে যায়। নিষেধ অমান্য করে ছবি তুলতে গিয়ে একই ধরনের দুর্ঘটনা ঘটেছে আবার। তার থেকে এটা একটা সংস্কারে দাঁড়িয়ে গেছে। বিয়েতে ছবি তোলা এখন একদম বন্ধ। এই ধরনের গপ্পো শোনালে কোন পাত্রিপক্ষ ছবি তোলবার জন্যে আর জোর করতে যাবে বলুন? সুতরাং বিয়ে হল, অথচ বর বা বরপক্ষের কোনও ছবি উঠল না। জোচ্চোরদের ধরা পড়ার সম্ভাবনা কমে গেল অনেকখানি।'

'বাহ্। দারুণ গল্প! তা তুমি কি ওদের কোনও ছবি জোগাড় করতে পেরেছিলে ?'

"আমার সংগ্রহে এদের একমাত্র ছবি বলতে আজকের দিব্যজ্যোতির বিশ বছর আগেকার ছবি। পুলিশের শিল্পী সি প্রসাদ ওই ছবিতে বিশ বছর বয়েস জুড়ে দিয়ে আজকের এই বয়েসের ছবি প্রায় অবিকল এনে দিয়েছে। তা ছাড়া ওকে চেনার আর একটা সহজ রাস্তা হল ওই 'হাত-পা', মানে হাতির মতো পা। ঘটনাচক্রে ঝিমলির বর ওই সোমেনকেও দেখেছি হালে। তবে জানতাম, ও এক্ষুনি-এক্ষুনি আবার বিয়ের পিঁড়িতে বসবে না। এবার হাত-পা'র পালা। সুতরাং ওকে ধরার জন্যেই ফাঁদ পেতেছিলাম আমি।"

তরফদার খুব আগ্রহী মানুষের গলায় বললেন, 'হ্যাঁ, তোমার এই বিয়ের ফাঁদটার কথা একটু ভেঙে বলো তো?'

কৌশিকের চায়ের কাপের অবশিষ্ট চা ধরতে গেল ঠাণ্ডাই হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু গলা ভেজাবার কায়দায় ওই চায়েরই খানিকটা গলা দিয়ে নামিয়ে দিয়ে ও কথা শুরু করল আবার। "এটা বুঝে গিয়েছিলাম, জোচ্চোরগুলো শিকার ধরার জন্যে খবরের কাগজের 'পাত্র চাই' কলমের ওপর নজর রাখে নিয়মিত। আর একটা ব্যাপার, পাত্রিপক্ষ বড়লোক না হলে ওঁরা সাধারণত এগোয় না। বড়লোক হলে দাঁও মারা যাবে দু'দিক থেকে। এক— গয়নাগাটি ও টাকাপয়সা। দুই— পাত্রীকে দেখতে সুন্দরী হলে হানিমুনে নিয়ে যাওয়ার নাম করে অন্য শহরে গিয়ে বেচে দেওয়া। বেচার দুটো জায়গা। খুব সুন্দরী হলে মোটা টাকার বিনিময়ে বিদেশে পাচার। মোটামুটি সুন্দরী হলে স্থানীয় নিষিদ্ধপল্লিতে— সে টাকার অঙ্কও অবশ্য কম নয়। কলকাতায় এখন দৈনিক বাংলা পত্রিকার মধ্যে প্রদীপন-এর প্রচারসংখ্যাই সব চাইতে বেশি। ওই কাগজে এক রোববারের পাতায় বক্সে বড় করে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম। যোগাযোগের দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছিলাম গ্রুপ থিয়েটারের নামকরা অভিনেতা আমার বন্ধু এই সব্যসাচী সরকারের ওপর। সব্যসাচীর এই দাড়িটা কিন্তু নকল।'

মুচকি হেসে সব্যসাচী ওরফে কমলেশ ওর জোড়া হাতের নমস্কারটা ঘুরিয়ে দিল চারদিকে।

কৌশিক বলল, 'ওকে কনফিডেন্সে নিয়ে বললাম— এই ব্যাপার। এখানে উতরোতে পারলে তোমার অভিনয়ের একটা অ্যাসিড টেস্ট হয়ে যাবে। সেই সঙ্গে একটা সামাজিক উপকারও হবে। সি. প্রসাদের আঁকা হবু পাত্রের ছবিটা দিলাম। আর বললাম, পাত্রের পায়ের দিকে নজর দেবে প্রথমেই। পাত্রের পা প্রমাণ সাইজের পায়ের দ্বিগুণ। ওর সঙ্গে আমার সহকারী মুখার্জিবাবুকেও ভেড়ালাম। তবে আসল ব্যাপারটা ওঁকে বলিনি। সব্যসাচীর নতুন নাম হল কমলেশ। ওর ভাগনির নাম শ্রবণা। যে গপ্পোটা পাত্রপক্ষকে শোনানো হয়েছে, আপনারাও শুনেছেন— সেই গপ্পোটাই মুখার্জিবাবুকে শোনানো হয়েছিল। আমাদের কপাল ভাল। মাত্র আট-দশটা পাত্র দেখার পরেই কমলেশ মার্কা-মারা পাত্রের সন্ধান পেয়ে গিয়েছিল। আমি এই কমলেশের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতাম। আমাদের লাইন অব অ্যাকশন কী হবে—জানিয়ে দিতাম। ও সত্যিই খুব বড় মাপের অভিনেতা। আগাগোড়া দুর্দান্ত অভিনয় করে গেছে।'

কমলেশ ওরফে সব্যসাচী প্রতিবাদ করার গলায় বলল, 'মুখার্জিবাবুর কাছে আমি কিছুই না। উনি ওঁর পার্ট প্লে করে গেছেন দুর্ধর্ষভাবে।'

মুখার্জিবাবুর গম্ভীরমুখে দুদিকে মাথা নাড়াতে নাড়াতে বললেন, 'রাখুন আমার পার্ট প্লে করার কথা! আপনারা যে এই রকম একটা গল্প ফেঁদে এই ক'দিন ধরে টানা অভিনয় করে গেছেন এই ব্যাপারটা কিন্তু এখনও আমার মাথায় আসছে না। কমলেশের রোলে আপনার অভিনয় সত্যি খুব ভাল হয়েছে, কিন্তু মাঝেমধ্যে আপনাকে কেমন যেন একটু ছাড়া-ছাড়া মনে হত। মনে হত, আপনি বুঝি নিছক দায়িত্ব পালন করছেন, কিন্তু শ্রবণাকে তেমন কিন্তু একবারও মনে হয়নি প্রতিটি ব্যাপারের সঙ্গে ও আশ্চর্য ভাবে মিলেমিশে ছিল। আচ্ছা—।'

মুখার্জিবাবুকে থামিয়ে দিয়ে ডি সি চৌধুরী বেশ তারিফ করার গলায় বললেন, 'আমার কিন্তু ম্যারেজ-রেজিস্ট্রারের রোলটা দারুণ ভাল লেগেছে। ছোট্ট রোল, কিন্তু অসাধারণ অভিনয় করেছেন ভদ্রলোক। পুরো সংলাপটাই আমার মনে আছে। ওই যে, বিয়ের সইসাবুদ হয়ে যাওয়ার পরে রেজিস্ট্রার বললেন না— অভিনন্দন শ্রীযুক্ত দিব্যজ্যোতি সেন, অভিনন্দন

শ্রীমতী শ্রবণা সেন। আপনারা এখন থেকে বৈধ স্বামী-স্ত্রী রূপে স্বীকৃত হলেন। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, আপনাদের দাম্পত্যজীবন সুদীর্ঘ এবং সুমধুর হোক। একটু ফুলটুল নেই? ওহ্। টেরিফিক ডেলিভারি ভদ্রলোকের। চমৎকার অভিনয়।'

অবাক হয়ে চৌধুরীর কথার জবাব দিলেন মুখার্জিবাবু, 'উনি আবার অভিনেতা হলেন কবে। উনি তো সত্যি-সত্যি একজন ম্যারেজ-রেজিস্ট্রার। ওঁর অফিস তো আমাদের অফিসের কাছে। ওঁর নাম এইচ কে চট্টরাজ।'

এবার অবাক হলেন চৌধুরী। 'উনি অভিনেতা নন! তাহলে ওঁর খাতাপত্তর, ফর্ম, স্ট্যাম্প— ওগুলো নিশ্চই জেনুইন ছিল না।'

মুখার্জিবাবু কৌশিকের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনারা কি রেজিস্ট্রারকে আড়ালে টিপে দিয়েছিলেন?'

'না-না, রেজিস্ট্রারের সঙ্গে যা-কিছু কথাবার্তা—শুধুমাত্র আপনি বলেছেন। আমরা কেউ কিছু বলিনি।'

'তাই যদি হয়—তাহলে ওঁর খাতাপত্র, স্ট্যাম্প পেপার, রবার স্ট্যাম্প—সবই জেনুইন। আমি তো আর নকল বিয়ে দিতে বলিনি।'

ডি সি চৌধুরী দুদিকে মাথা নাড়াতে নাড়াতে কৌশিকের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এটা তুমি তাহলে ঠিক করোনি কৌশিক। সরকারি নথিপত্রে মিথ্যে রেকর্ড থাকা ঠিক নয়। ওটা তুমি আজকেই ক্যানসেল করে দিতে বলো।'

মুখার্জিবাবু কেমন যেন নিজের মধ্যে ডুবে ছিলেন। হঠাৎই মুখ খুললেন। ওঁর কণ্ঠস্বরে একই সঙ্গে ক্ষোভ, অভিমান আর বিস্ময়। বললেন, 'গোটা ব্যাপারটাই যে নাটক— আপনারা একবারের জন্যেও বুঝতে দিলেন না আমাকে! বললে কি আমি কাঁচিয়ে দিতাম? হ্যাঁ, আমি অভিনেতা নই— তবে এটুকু বোধহয় সামলে নিতে পারতাম। বিয়েটাকে সত্যি ধরে নেওয়ার ফলে আমাকে একটু উদ্বেগ-উত্তেজনায় ভুগতে হয়েছে—আসল ব্যাপারটা জানা থাকলে এর হাত থেকে রেহাই পেতাম অন্তত।'

একটু বিব্রত হয়ে জবাব দিল কৌশিক, 'আপনাকে একটু উদ্বেগ-উত্তেজনায় ভোগাবার জন্যে আমি সত্যিই দুঃখিত মুখার্জিবাবু। তবে ওগুলো থাকার ফলে আপনার ভূমিকা এমন একটা জায়গায় পৌঁছে গিয়েছিল যে, এই চক্রের পাকা ঘুঘুরা পর্যন্ত বোকা বনে গিয়েছে। প্রথমদিকে ওদের একটু খটকা ছিল, কিন্তু পরে সেটা আর ছিল না। এটা সম্ভব হয়েছে আপনার জন্যেই।'

গোয়েন্দার এই কথাগুলো মুখার্জিবাবুর যেন কানেই ঢুকল না। আগের কথার জের টেনে বললেন, 'আমার কথা বাদ দিচ্ছি, কিন্তু শ্রবণা! ওর ওই আচার-আচরণের কোনও ব্যাখ্যাই আমি খুঁজে পাচ্ছি না। যদি এটা অভিনয়ই হয়, তাহলে ও—।'

'তাহলে ও কী?'

'কাল উপোস করল কেন?'

'ও তো বলছিল ওর খিদে নেই, তাই।'

না-না, এ উপোস সে-উপোস নয় এ তো একেবারে শাস্ত্রীয় শুদ্ধাচার মেনে।'

কৌশিক একটু হেসে বলল, 'এটা আপনি আপনার মতো করে ভেবে নিয়েছেন—।'

হাসির জবাবে মুখার্জিবাবু বেশ গম্ভীর হয়ে গেলেন। 'ঠিক আছে, এটা না হয় আমার কল্পনা, কিন্তু শ্রবণা ওই যে দু-তিনবার ওই ভাবে কান্নায় ভেঙে পড়ল—এর পুরোটাই কি অভিনয়?'

'তা নয়তো কী? ও তো সব জানে। ওসব ওই গোটা চক্রটাকে হাতেনাতে ধরার ফাঁদ। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পুরোটাই সাজানো।'

মুখার্জিবাবুর চোখমুখ এবার বেশ থমথমে হয়ে উঠেছিল। 'তাই যদি হয়— তাহলে আপনাদের দুটো ব্যাপার আমি কিন্তু কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না। আমাকে গোঁড়া, সেকেলে—যা খুশি বলতে পারেন আপনারা।'

ঘরের মধ্যে এতগুলো মানুষ, কিন্তু কারও মুখে কোনও কথা নেই। কৌশিক অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কোন দুটো ব্যাপারের কথা আপনি বলছেন?'

মুখার্জিবাবুর চোখমুখ বেশ গম্ভীর। গলার স্বরও ভারী হয়ে উঠেছিল। ভারী গলাতেই উনি বললেন, 'মিথ্যে নাটকে আসল ম্যারেজ-রেজিস্ট্রারকে ডেকে এনে সত্যি-সত্যি বিয়ে দেওয়াটা ঠিক হয়নি। আরও ভয়ঙ্কর হল এক ঘরে রাত্তিরে ওদের শুতে দেওয়া। আপনারা অল্পবয়সী, নীতি-দুর্নীতির ব্যাপারে আপনাদের নতুন-নতুন ব্যাখ্যা থাকতে পারে। সেসব থেকে আমি হয়তো অনেক দূরে। আমি এখন সে তর্কে ঢুকতেও যাচ্ছি না। কিন্তু মেয়েটা তো মারাত্মক কোনও বিপদে পড়তে পারত। সাঙ্ঘাতিক এক খুনির সঙ্গে রাত কাটানোর ব্যবস্থা করে দিয়ে আপনারা কি ঠিক কাজ করেছেন?'

কৌশিক কোনও উত্তর দেওয়ার আগেই শ্রবণা দপ্ করে জ্বলে উঠল। রূপসী মেয়েটির চোখেমুখে কেমন যেন হিংস্র ভাব। তীব্র দৃষ্টিতে কৌশিকের দিকে তাকিয়ে শ্রবণা বলল, 'আপনি অন্যায় করেছেন কৌশিকদা। আসল পিস্তল বলে একটা খেলনা পিস্তল আমার হাতে তুলে দিয়ে ঠিক করেননি। আমারও ভুল হয়ে গেছে। আম নিজে চেষ্টা করলেই অন্য জায়গা থেকে আসল পিস্তল জোগাড় করতে পারতাম। আপনার কাছ থেকে পিস্তল চাইবার কোনও দরকারই ছিল না। তারপর সেই পিস্তল খুনির মাথায় ঠেকিয়ে গুলি চালিয়ে সব শেষ করে দিতে পারতাম। কত মেয়ের ও সর্বনাশ করেছে ভগবান জানে! আমাকে চিনতে পর্যন্ত পারল না!'

কী যেন একটা উত্তর দিতে গিয়ে থমকে গেল কৌশিক। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে বলল, 'গুলিভর্তি সত্যিকারের পিস্তল এই জন্যেই দিইনি। রাগের মাথায় গুলি চালালে তুমি তো এখন খুনের দায়ে ধরা পড়তে।'

শ্রবণার গলা বোধহয় আগের চাইতেও ধারালো হয়ে উঠেছিল। গলা একটু তুলেই ও বলল, 'ধরা পড়লে পড়তাম। না হয় ফাঁসিই হত আমার। তবু মরার আগে জেনে যেতে পারতাম, সমাজের একটা অন্তত উপকার করে যাচ্ছি।'

'সেই উপকারটা এখন দেশের আইন-আদালত করবে। ওদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে আমাদের হাতে এত বেশি সাক্ষ্য-প্রমাণ এসে গেছে যে, কেউই আর জাল কেটে বেরুতে পারবে না। ওই ব্যাপারে সাক্ষী দেওয়ার জন্যে কোর্টে ডাক পড়বে তোমার, তখন তুমি ওই ঘটনাটার কথা বোলো।'

'কোন ঘটনাটা?' গোয়েন্দার কথার শেষে ডিসি তরফদারের এই প্রশ্নটা শুনে হঠাৎই কেমন যেন ভেঙে পড়ে চোখে আঁচল চাপা দিল শ্রবণা। ওর সারা শরীর থরথর করে কাঁপছিল।

কান্নার দৃশ্য দেখে একটু বুঝি অসহায় বোধ করছিল কৌশিক। ডিসির দিকে তাকিয়ে বলল, 'সুপ্রকাশদা, এক রাউন্ড কফির ব্যবস্থা করা যাবে কি?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, কেন নয়? ডিসিকে আর কিছু বলতে হল না, পেছন দিকে তাকাতেই সাদা পোশাকের একজন পুলিশ দ্রুত বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

।। ছাব্বিশ ।।

পকেট থেকে রুমাল বার-করে চোখমুখ ভাল করে মুছে নিয়ে কৌশিক বলল, 'ওইরকম একজন ভয়ঙ্কর খুনির সঙ্গে শ্রবণা এক ঘরে রাত কাটাক— এই ব্যাপারে আমার একেবারেই মত ছিল না। কিন্তু শ্রবণা ধরতে গেলে একরকম জোর করেই আমার মত আদায় করে নিয়েছিল। আমি মত দিয়েছিলাম একটি শর্তে। ঘরের লাগোয়া ছোট্ট একটা ঝুলবারান্দা আছে। ওখানে যাওয়া দরজার ছিটকিনিটা খুলে রেখে ওই দরজার সামনে একটা ওয়ার্ডরোব রেখে দিয়েছিলাম। শ্রবণাকে বলেছিলাম, দরজাটা যাতে কিছুতেই বন্ধ না হয়—সেদিকে নজর রাখবে। আর কোনওরকম বিপদের আশঙ্কা দেখলেই তুমি চিৎকার করে উঠবে। ওই ঝুলবারান্দায় স্পেশাল ব্রাঞ্চের সন্তোষ পাহারায় ছিল। আমি তো সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণ বাদেই খিড়কির দরজা দিয়ে ফিরে এসেছিলাম ওই অ্যাপার্টমেন্টে। রাত্রে ছিলাম শ্রবণাদের ঠিক পাশের ঘরটাতেই। আমিও খুব অ্যালার্ট ছিলাম। শ্রবণা পিস্তলের জন্যে খুব ঝুলোঝুলি করছিল। তখন ওই খেলনা পিস্তলটা দিয়ে ওকে শান্ত করি। তবে ওটা নিয়ে ও ভালই করেছিল। পিস্তলটা আমাদের খুব কাজে এসেছে।'

কফি এসে গিয়েছিলে এ-ঘরের চেয়ারে-বসা মানুষদের জন্যে। শ্রবণা ছাড়া আর সবাই ট্রে থেকে কফির কাপ তুলে নিয়েছিল। শ্রবণার চোখ আগের মতোই আঁচল চাপা। সামনে ট্রে এনে কফির কথা বলায় ও দুদিকে মাথা নাড়িয়েছিল শুধু।

কফির কাপে ছোট্ট একটা চুমুক দিয়ে গোয়েন্দা বলল, 'ম্যারেজ-রেজিস্ট্রার জেনুইন। ওঁর খাতাপত্তরের মধ্যে কোনও ভেজাল নেই। ওখানে আমি আর মুখার্জিবাবু নাম ভাঁড়িয়ে সই দিইনি। নিজেদের নামই লিখেছিল পরিষ্কার করে। শ্রবণা নাম সই করতে গিয়ে কিছুটা ঠিক লিখেছে— নামের জায়গায় লিখেছে শ্রবণারেখা। রেখা ওর আসল নাম। আগাগোড়া মিথ্যে নাম লিখেছে ওই খুনিটা। দিব্যজ্যোতি সেন শুধু এই বিয়ের নাম। এখান থেকে পালাতে পারলেই ওর নাম পালটে যেত আবার। ম্যারেজ-রেজিস্ট্রারের খাতায়, সরকারি নথিপত্রে উল্টোপাল্টা নাম উঠুক—এটা আমি চাইনি। কিন্তু শ্রবণা জোর করেছিল। বলেছিল—সব তো আর মিথ্যে নয়, বারো আনা সত্যি। এইরকম একটা যুক্তি দেখিয়েছিল বরের সঙ্গে বাসরঘরে রাত কাটাবার ব্যাপারেও।'

বিদ্‌ঘুটে এক ধাঁধার সামনে বোকা বনে যাওয়ার মতো মুখ হয়ে গিয়েছিল মুখার্জিবাবুর। কয়েক মুহূর্ত থমকে থাকার পরে উনি প্রশ্ন তুললেন, 'রেজিস্ট্রি বিয়ে, বাসরঘরে রাত কাটানো—এর মধ্যে বারো আনা সত্যি! মানে?'

শ্রবণার চোখ আগের মতোই আঁচল-চাপা, তবে মুখ নীচের দিকে আরও কিছুটা ঝুঁকে পড়েছিল।

কফির কাপে পর-পর দু-তিনটে চুমুক মারার পরে, একটু কেশে গলা পরিষ্কার করে কৌশিক বলল, 'সত্যি কথাটা এবার তো বলতেই হবে। শ্রবণার আসল নাম রেখা, রেখা ঘোষ। আজ থেকে বছর দেড়-দুই আগে এই রেখা আজকের ওই দিব্যজ্যোতির শিকার হয়েছিল।'

গোটা ঘরের সবাই কেমন যেন চমকে উঠেছিল কথাটা শুনে।

কথার আবার খেই ধরল কৌশিক। 'সেই এক খেলা। তবে এ ক্ষেত্রে একটা ব্যতিক্রম, রেখারা বড়লোক ছিল না। তিন বোন। রেখা সবচেয়ে ছোট। আগের দুই বোনের ভালই বিয়ে হয়েছে। রেখার মা নেই। বাবা সরকারি চাকরি থেকে তখন সদ্য-সদ্য রিটায়ার করেছেন। সেই সুবাদে হাতে বেশ কিছু টাকাও এসেছিল। সম্বন্ধ করে মেয়ের বিয়ে দিলেন। বরকে অপরূপ দেখতে। ওদের ভাষায়— ময়ূরছাড়া কার্তিক। সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র। কিন্তু বিয়ের দিন-তিনেকের মধ্যে ওই সুপাত্রটি বউয়ের গয়নাগাটি কেড়ে নিয়ে বউকে বেচে দিয়েছিল মসজিদ বাড়ি স্ট্রিট এলাকার নিষিদ্ধ পল্লিতে। রেখাকে যারা কিনেছিল তাদের হাত থেকে ওর ছাড়া পাওয়ার কোনও উপায় ছিল না। নিরুপায় হয়ে রেখাকে সেই বৃত্তি নিতে হয়েছিল আমাদের সমাজের চোখে যা ঘৃণ্য। ওর আগের জীবনটা এখন হারিয়ে গেছে। আজকের এই পরিচয় নিয়ে ও আর ওর বাবার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে চায় না। কিন্তু একটা জিনিস আজ দেড়-দু বছরের মধ্যে ও একটা দিনের জন্যেও ভোলেনি— ভুলতে চায়নি— তা হল ওই তিন দিনের সংসার-করা বরের মুখ। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম— কেন তুমি ওইরকম একটা বাজে লোকের মুখ মনে রাখতে চাইছ? ও কী উত্তর দিয়েছিল জানেন? বলেছিল: শোধ তোলার জন্যে। একদিন না একদিন ওর সঙ্গে আমার দেখা হবেই। তখন আমি শোধ তুলব।'

শ্রবণা বা রেখার মুখ আগের মতোই আঁচলে চাপা। মুখ নীচের দিকে আর একটু বুঝি ঝুঁকে পড়েছে। শরীরে যেন কোনও সাড় নেই।

ডেপুটি কমিশনার চৌধুরী জিজ্ঞেস করলেন, 'কিন্তু মেয়েটির সঙ্গে তোমার যোগাযোগ হল কী ভাবে?'

'ওই করেছিল। একদিন রাতে ফোন করে বলল, পর দিন আমার ফ্ল্যাটে এসে আমার সঙ্গে দরকারি কথা বলতে চায়। বললাম, বেশ আসুন। নাম জিজ্ঞেস করায় বলেছিল— পিয়ালি সেন। যখন এলো, তখন দেখি—ওকে আমি চিনি। নামটা অবশ্য বানানো। রেখাকে অবনীদা আগে দু-একবার দেখেছেন। তবে এখন যে চিনতে পারেননি, তো তো বুঝতেই পারছি।'

ইন্সপেক্টর অবনী ঘোষরায় যেন এক লহমায় পুরনো অনেক-কিছু মনে করার চেষ্টা করে বললেন, 'আমি? আমি মেয়েটিকে আগে দেখেছি? না-না, তুমি নির্ঘাত আর কারও সঙ্গে গুলিয়ে ফেলছ।'

কফিতে আর একটা চুমুক দিয়ে কাপটা নামিয়ে রেখে কৌশিক বলল, 'কিছুদিন আগে গল্‌ফ গ্রিনের একটা ফাঁকা বাড়ি রেড্ করে আপনার থানার একজন সাব-ইন্সপেক্টর একটা শ্যুটিং-পার্টিকে ধরে এনেছিল। মনে পড়ছে?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, কেন মনে পড়বে না! রেড্ তো এই কেসের ব্যাপারেই। পরেশকে নজর রাখতে বলেছিলাম বাড়িটার ওপর। রাত্তিরবেলায় বন্ধ দরজা-জানালার ফাঁক দিয়ে খুব

জোরালো আলোর ঝিলিক বেরুতে দেখে ওর সন্দেহ হয়। তখন ও রেড্ করেছিল। তবে শ্যুটিং-পার্টি বললে ওদের বড় করে দেখা হয়। আসলে আন্ডারওয়ার্ল্ডের একটা দল ব্লু ফিল্ম শ্যুট করছিল। ওই ছবির নায়ক-নায়িকা সমেত সব কটাকে তুলে এনেছিল পরেশ। ন্না, সব কটা নয়, পরিচালক পালিয়েছিল—।'

'আপনার ধারণা হয়েছিল, 'বুল মার্ডার কেসের সঙ্গে ওই দলটার সম্পর্ক আছে।'

'হ্যাঁ, মানে গোড়ার দিকে সেই রকম ভেবেছিলাম—।'

'আমি সেদিন আপনার থানায় গিয়েছিলাম। মেয়েটাকে আপনার ঘরে ডেকে আলাদাভাবে কিছু জিজ্ঞাসাবাদও করি। ঘরে তখন আর কেউ ছিল না। আপনি খাওয়ার জন্যে কোয়ার্টার্সে গিয়েছিলেন—। তা, সেই মেয়েটার নাম মনে পড়ছে?'

সঙ্গে সঙ্গে দুদিকে মাথা নেড়ে উত্তর দিলেন ইন্সপেক্টর ঘোষরায়, 'নাম মনে রাখা সম্ভব নয়। তা ছাড়া ওরা তো সবাই মিথ্যে নাম বলে। তবে এটা পরিষ্কার মনে আছে— মেয়েটাকে কোর্টে প্রডিউস করেছিলাম। সেখান থেকে ওকে পাঠানো হয়েছিল হোমে। হোম থেকে পর দিনই ও পালিয়েছিল।'

টেবিল থেকে কফির কাপ হাতে তুলে নিল গোয়েন্দা, তারপর ওটা আবার নামিয়ে রেখে আগের কথায় খেই ধরল। 'হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন। এই ধরনের মেয়েরা ধরা পড়ার পরে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই থানা-পুলিশের কাছে মিথ্যে নাম বলে। আপনার কাছে মিথ্যে নামই বলেছিল ও। বলেছিল, ওর নাম সন্ধ্যা।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, মনে পড়েছে— মেয়েটি ওর নাম বলেছিল সন্ধ্যা।'

'সন্ধ্যাকে সেদিন দেখেই আমার মনে হয়েছিল—ও ভদ্র পরিবারের মেয়ে। হয় ভুল করে, নয় প্রলোভনে পড়ে, কিংবা বাধ্য হয়ে এই ধরনের একটা নোংরা পেশায় এসেছে। আমি সেদিন ওর সঙ্গে খুব সহানুভূতির সঙ্গে কথা বলেছিলাম। সহানুভূতি এই পেশার মেয়েরা খুব একটা পায় না। তার ফলেই বোধহয় কাজ হয়েছিল কিছুটা। ওর কথাগুলো আমার সত্যি বলেই মনে হয়েছিল। সন্ধ্যাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম— তুমি কি বিবাহিতা? বলেছিল— হ্যাঁ, তবে বিয়ের সঙ্গে সঙ্গেই সে বিয়ের পাট চুকেবুকে গেছে। না চুকলে অবশ্য ওই বরের লাথি খেয়ে ওকে মরতে হত। কেন? উত্তরে সন্ধ্যা বলেছিল, ওর বরের পায়ের মতো অত বড় পা নাকি আর কোনও মানুষের ও দেখেনি।'

'আবার বড় পা! ও কি তাহলে—।'

তরফদারকে প্রশ্নটা শেষ করতে না দিয়ে কৌশিক বলল, 'হ্যাঁ, আপনারা ঠিকই ধরেছেন—! ওই সন্ধ্যাই পিয়ালি সেন নাম নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল সেদিন। কারণ থানায় আমার সঙ্গে কথা বলে ও জেনে গিয়েছিল যে, বিয়ের নাম করে ব্যবসা চালায় এমন একজন অপরাধীকে দেখতে দারুণ সুন্দর, কিন্তু পাদুটো অস্বাভাবিক বড়। তার মানে আমরা দুজনেই একই লোকের খোঁজে আছি। সন্ধ্যা ওরফে পিয়ালি বলেছিল—ও এই ব্যাপারে আমাদের সবরকম সাহায্য দিতে প্রস্তুত। আমার মাথায় তখন এই ফাঁদটা ঘুরছিল, কিন্তু পাত্রী খুঁজে পাচ্ছিলাম না। বললাম, ঠিক আছে, তুমি তাহলে আর একবার পাত্রী সাজো। কিন্তু তোমাকে ওই বর চিনে ফেলবে না তো? বলেছিল—মাত্র তিন দিনের সংসার। তার মধ্যে লোকটা ওর মুখের দিকে চেয়েছে কতক্ষণ! সুতরাং ওকে চিনে রাখা অসম্ভব। তা ছাড়া ওই সব খারাপ লোক দিনরাত্তির নোংরা কাজ করে বেড়ায়। কোনও একজনকে চিনে রাখতে ওদের বয়েই গেছে। মাঝখানে আবার দেড়-দু বছর সময় পেরিয়ে গেছে। অতএব চেনার কোনও সম্ভাবনা নেই। ওদের সামনে ও অন্য

রকম মেক-আপ নিয়ে যাওয়ার কথাও বলেছিল। তবে রেখা যে আজকের এই শ্রবণার ভূমিকায় অসাধারণ অভিনয় করে গিয়েছে—এ ব্যাপারে আমরা সবাই একমত।'

রেখা ওরফে সন্ধ্যা ওরফে পিয়ালি ওরফে শ্রবণার আঁচল-চাপা মুখ নীচের দিকে বোধহয় আর একটু ঝুঁকে পড়েছিল।

বাঙ্গালোরের ডেপুটি কমিশনাব মিলন চৌধুরী বললেন, 'এই জন্যেই বলে— ট্রুথ ইজ স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিকশান। জীবনে যা ঘটে, অনেক সময় কল্পনাতেও আমরা তার ধারেকাছে পৌঁছতে পারি না। কেউ মস্ত বড় একটা ক্ষতি করলে আমবা বেশিরভাগ মানুষ প্রতিশোধ নেওয়ার কথা ভেবে থাকি। কিন্তু তা তো আর হয়ে ওঠে না সব সময়। কেননা শত্রু এসব ক্ষেত্রে যাকে বলে— প্রবল পরাক্রান্ত। ক্ষতিগ্রস্ত মানুষটি এর কাছে নিতান্তই অসহায়। সুতরাং মনের ইচ্ছে শেষ পর্যন্ত মনের মধ্যেই মরে যায়। রেখার মতো মেয়েদের বেলায় শোধ নেওয়ার ইচ্ছেটাই তো হাস্যকর। কিন্তু ও পেরেছে। মনের তেমন জোর ছিল বলেই। তা ছাড়া যোগাযোগটাও বড় ব্যাপার।'

তরফদার পেছনের একজনকে নিচু গলায় কী যেন বলতেই সে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। একটু বাদে একজন মহিলা-পুলিশ এ-ঘরে এসে রেখাকে বলল, 'চলো, আমাদের ঘরে গিয়ে তুমি একটু বিশ্রাম নেবে। তারপর হাত আর কাঁধ ধরে রেখাকে কেমন যেন আগলে নিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

একটু বাদে স্বগতোক্তি করার ভঙ্গিতে ইন্সপেক্টর ঘোষরায় বললেন, 'এইবার মেয়েটাকে একটু চেনা-চেনা লাগছে। তবে কৌশিক না বলে দিলে এটুকুও লাগত না। আসলে মেয়েরা নিজেদের চেহারা পালটে ফেলতে পারে চটপট। এই যে দিব্যকান্তি দিব্যজ্যোতি, তুমি তোমার পুরনো বউকে চিনতে পেরেছ এবার?'

উত্তরে কেমন যেন তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল দিব্যজ্যোতি।

ওই ভঙ্গিটা দেখেই বিশাল চেহারার দোর্দণ্ডপ্রতাপ ইন্সপেক্টর ঘোষরায়ের চোখে আগুন জ্বলে উঠল। শুধু চোখেই আগুন নয়, গলায় বাজও ডাকল। ইন্সপেক্টর বললেন, 'তোর ওই কাঁধ-নাচানো আমি ঘুচিয়ে দেব জন্মের মতো। ধরা পড়েছিস তবু তেল মরেনি। যা জিজ্ঞেস করব সিধে উত্তর দিবি। একটু বেচাল দেখলে এক্ষুনি লক-আপে ঢুকিয়ে দাওয়াই দেব। রেখাকে চিনতে পেরেছিস?'

ইন্সপেকটরের ধমকে মন্ত্রের মতো কাজ হল। বাধ্য ছেলের ভঙ্গিতে একদিকে মাথা কাত করল দিব্যজ্যোতি।

'কখন চিনতে পারলি? আগে না এখন?'

'এখন।'

'মেয়েটাকে সোনাগাছিতে কত টাকায় বেচেছিলি?'

উত্তরে চুপ করে থাকল দিব্যজ্যোতি।

তাই দেখে আর একবার গর্জন করে উঠলেন ইন্সপেক্টর। 'বল্ কত টাকায়?'

'খুব কম টাকায়। বেশির ভাগ টাকা তো মকবুল মেরে দিয়েছিল।'

'মকবুল কে?'

'ওই পাড়ার এক দালাল।'

'পাকা মাথার গুরু প্রফেসর ভট্চাজ সঙ্গে থাকতে উটকো একটা দালাল টাকা মেরে দিল?'

'প্রফেসর তখন তো এখানে ছিল না।'

'কোথায় গিয়েছিল ?'

'বিলেত।'

প্রফেসর ভট্টাচার্য দিব্যজ্যোতিকে ধমকে উঠে বললেন, 'আমার নামে তুমি একটাও আজেবাজে কথা বলবে না।'

উত্তরে কিছু একটা বলতে গিয়েও চুপ করে গেল দিব্যজ্যোতি।

কৌশিক বেঞ্চে-বসা দলটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমাদের যত দেখছি ততই অবাক হয়ে যাচ্ছি। এমন দল পাওয়া মুশকিল। তোমরা প্রত্যেকেই কমবেশি লেখাপড়া জানো। ভাল মানুষ সেজে যখন কথা বলো, তোমাদের আসল পরিচয় আন্দাজ করা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। দুই বরের চেহারা তো সিনেমার নায়কদের হার মানায়। পাত্রপক্ষের অভিভাবক-অভিভাবিকা— আজকের মিস্টার সেন আর মিসেস সেন— বাবা-মা, কাকা-কাকিমা, দাদা-বৌদি সাজার ব্যাপারে ওদের জুড়ি মেলা ভার। কী বলে যেন— সৌম্যকান্তি, স্নেহশীলা— এদের চেহারা দেখলে, কথাবার্তা শুনলে— এই সব শব্দই মনে পড়বে প্রথমে। সবার ওপরে আছেন মাস্টারমাইন্ড প্রফেসর মৃদুল ভট্টাচার্য। গুরুমশাই অবশ্য পর্দার আড়ালে থাকেন, তবে সব চাল এঁরই দেওয়া। নিখুঁত চাল। দু-একদিনের বিয়ে-বিয়ে খেলায় গয়নাগাটি আর মেয়ে বেচে লাখ-লাখ টাকা রোজগার। তার ওপর আবার সুযোগ বুঝে বেশ কিছু নগদ টাকাও হাতানো হয় পাত্রীপক্ষের কাছ থেকে। তোমাদের আসল নাম-ধাম অনেক কষ্টে জানতে পেরেছি। তবে কীর্তিকলাপের লিস্টিটা এত বড় যে, সব এখনও জানা হয়ে ওঠেনি—। দু-একদিনের মধ্যেই মনে হয় সব জেনে যাব। অবশ্য যতটুকু যা জেনেছি, আর প্রমাণ-ট্রমাণ যা হাতে এসে গেছে এর মধ্যে— তোমরা আর জাল কেটে বেরুতে পারবে না। চূড়ান্ত শাস্তি অপেক্ষা করছে তোমাদের জন্যে।'

ডিসি চৌধুরী বললেন, 'মাফিয়া ডন শর্মা একটা ডেঞ্জারাস এলিমেন্ট; যে-কোনও ধরনের খারাপ কাজ ও হাসতে হাসতে করতে পারে। আর ওর নেটওয়ার্ক মস্ত বড়। তবে দেশের বাইরেও যে ও কাজকর্ম শুরু করেছে— সেটা আমি এই প্রথম জানতে পারলাম। বিদেশে মেয়ে পাচারের ব্যাপারে ও আবার প্রফেসর ভট্টাচার্যকে বস্ বলে মেনে নিয়েছে। একটুর জন্যে এবার অবশ্য বিশাল অঙ্কের ডলার রোজগারটা ফসকে গেল। এই জন্যে কি না জানি না, তবে শর্মা আপনার ওপর খুব ক্ষেপে আছে প্রফেসর। আপনার অনেক গোপন ব্যাপার ও আমাদের কাছে ফাঁস করে দিয়েছে। আন্ডারওয়ার্ল্ডে বিশ্বাসঘাতকদের একটাই শাস্তি— তা হল মৃত্যু। কিন্তু ওই শাস্তি আপনি কিংবা আপনার দলের লোকরা ওকে এখন দিতে পারবেন না। তবে শোধ আপনি অন্যভাবে তুলতে পারেন। ওর গোপন ব্যাপারস্যাপার যা আমরা এখনও জেনে উঠতে পারিনি, আপনি আমাদের জানিয়ে দিন।'

প্রফেসর ভট্টাচার্য তীব্র চোখে কয়েক মুহূর্ত ডিসির দিকে তাকিয়ে থাকার পরে বললেন, 'আপনি ঠিক কী জানতে চাইছেন আমার কাছে ?'

'ওই যে দুই শেখ, যাদের আমরা বাঙ্গালোরে ধরেছি, তাদের সঙ্গে যোগাযোগটা কার ? আপনার না শর্মার ? ঝিমলি আর শুভলক্ষ্মীকে বেচার আগে আর কটা মেয়েকে বেচা হয়েছে ? তারা এখন কোথায় ? আমার মনে হয় বিদেশে পাচারের ব্যাপারটা শর্মাই করেছে। তাই না ?'

'আর ?'

'দেশের মধ্যে শর্মা মেয়ে কেনাবেচার কারবার কোথায়-কোথায় চালাচ্ছে ? শর্মার সঙ্গে আর কে-কে আছে ? মেয়েদের ফুসলে আনার ব্যাপারে মেয়েরাও এজেন্ট হিসেবে কাজ

করছে। কমলা নামের একজন এজেন্টকে আমরা ধরেছি বাঙ্গালোরে। ওই দলেই পড়ছে এখানকার মিসেস সেন। এর আসল নামধাম আমরা শিগগিরই জেনে যাব। এরা সুন্দরী মেয়েদের লোভ দেখিয়ে ভুল পথে নিয়ে আসে। একটা 'টোপ' হল বিউটি কনটেস্ট। এক কথায় যাকে বলে, এক্সপোজার টু দ্য গ্লামার ওয়ার্ল্ড। তার পরের স্টেপ হল, একটা পুরস্কার হাতে তুলে দিয়ে বিনা পয়সায় দু-সপ্তাহের বিদেশ ভ্রমণ। ওই দু সপ্তাহটা শেষ পর্যন্ত কত সপ্তাহ, কত মাসে গিয়ে ঠেকে তার ঠিকঠিকানা নেই। অনেক মেয়ে বেমালুম নিখোঁজও হয়ে যায়। সব এই চক্রের কাজ। আপনি বলুন, সব বলে দিন। শর্মাকে আর কখনোই আমরা জেলের বাইরে আসতে দেব না।'

প্রফেসর গম্ভীর মুখে চোখ থেকে চশমা খুললেন। তারপর পকেট থেকে রুমাল বার করে ঘষে ঘষে চশমার কাচ মুছলেন। তার পরে চশমা চোখের খুব কাছে এনে ওপর-নীচ করতে করতে পরীক্ষা করলেন কাচ কতটা পরিষ্কার হয়েছে। সব শেষে চশমাটা পরে নিয়ে উনি ডিসি চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'স্কলার হিসেবে আমার অল্পস্বল্প পরিচিতি আছে গোটা পৃথিবীতে। গবেষণামূলক নানা ধরনের কাজকর্মও আমি করে থাকি।'

'জানি তো, এসব নিয়ে অনেক মূল্যবান কাজ আছে আপনার। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের ম্যারেজ সিস্টেম, বহুবিবাহ প্রথা নিয়েও আপনার বেশ কিছু গবেষণা আছে—।'

এই পর্যন্ত শোনার পরেই প্রফেসর ভট্টাচার্য ঠাট্টার গলায় বলে উঠলেন, 'এত সব জানেন, আর এটা জানেন না যে, এই ধরনের কাজকর্ম করতে গেলে সমাজের নানা শ্রেণীর লোকের সঙ্গে মেলামেশা করতে হয়। এইসব শ্রেণীর মধ্যে ওদিকে শর্মা আছে, এদিকে এরা আছে–– হয়তো কোনও একদিন আপনারাও এসে যাবেন ঝাঁক বেঁধে।'

ডেপুটি কমিশনার চৌধুরীর চোয়াল কঠিন হয়ে উঠেছিল। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে বললেন, 'আপনি গভীর জলের মাছ। কিন্তু কোনও লাভ নেই। আপনার গলায় বঁড়শি গেঁথে গেছে। আমরা এখন সুতো ছাড়ছি, আপনি ভাবছেন—পালাচ্ছেন।'

কথাটা শেষ হতে না হতেই একজন পুলিশ অফিসার ঘরে ঢুকে ডি সি তরফদারের কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে কী যেন বললেন। কথাগুলো শুনতে শুনতে চকচক করে উঠেছিল তরফদারের চোখমুখ। উনি একটু গলা তুলে কৌশিকের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমার অনুমান ঠিকই গোয়েন্দা। প্রফেসরের বাগানবাড়িতে তোমার ওই দেখিয়ে দেওয়া জায়গাটা খুঁড়ে একটা কঙ্কাল পাওয়া গেছে। কঙ্কাল ক্রিমিনোলজিস্ট শশাঙ্ক সেনের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে : যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনার ফাইন্ডিংস জানান।'

কথাটা শুনে রীতিমত চমকে উঠেছিলেন প্রফেসর মৃদুল ভট্টাচার্য। চশমাটা একটানে খুলে ফেলে আবার উনি কাচ মুছতে শুরু করে দিলেন দ্রুত ভঙ্গিতে।

।। সাতাশ ।।

ভোররাতের দিকে এক পশলা জোর বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। আবহাওয়ায় এখন আরামপ্রদ

ঠাণ্ডার ভাব। আকাশ ঝকঝকে নীল। চারপাশে ফিকে-হলুদ রোদের আভা। এমন একটা সকাল যে-কারও ভাল লাগতে বাধ্য। তরুণ গোয়েন্দা কৌশিকের একটু বেশিই ভাল লাগছিল। বেশ কিছুদিন ধরেই গোলমেলে একটা রহস্য ওকে পেঁচিয়ে ধরেছিল চারদিক থেকে। অপরাধীদের মস্ত এক চক্র ধরা পড়েছে।

সাফল্যের আলাদা একটা আনন্দ আছে। ভোরবেলায় উঠে ব্যায়াম করতে করতে এবং এখন টান-টান হয়ে বিছানায় শুয়ে সেই আনন্দ উপভোগ করছিল কৌশিক। হঠাৎই পাশের ঘরে ছেলেমানুষি একটা ঝগড়া শুরু হয়ে গেল, তারপরেই বাড়ির কাজের ছেলে নিমো ছুটে এসে সালিসি চাওয়ার গলায় বলল, 'দাদা, তুমি একবার এ-ঘরে এসো তো।'

আলসেমিতে বেশ কিছুটা মজে গিয়েছিল কৌশিক। একটু ঝিমধরা গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কেন, কী হয়েছে?'

নিমো ছাড়ার পাত্র নয়। প্রশ্ন শুনে ওর উত্তেজনার মাত্রা বোধহয় আর একটু বেড়ে গিয়েছিল। 'একবার তুমি এসোই না—।'

নিমোর সঙ্গে অনিচ্ছুক ভঙ্গিতে পাশের ঘরে এসে ছোট্ট একটা ঝড়ের মুখে পড়েছিল কৌশিক। ঝড় তুলেছিলেন আশি বছরের নতুন বর রাধাগোবিন্দ গিরি। ওঁর মুখের গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় দু-তিনটে দাঁত না থাকার ফলে তোড়ে বলা কথাগুলোর মধ্যে পরিষ্কার একটা ঝড়ের শব্দ শোনা যাচ্ছিল। আঠারো-উনিশ বছরের ছিপছিপে চেহারার 'দিদিমা' প্রবল ঝড়ের মুখেও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিলেন।

নিমোর গলার স্বর আর এক পর্দা ওপরে উঠে গিয়েছিল। সালিসি চাওয়ার গলায় ও বলল, 'দাদুর পড়েছে চার, পাঁচের ঘরে ছিল আমাদের পাকা গুটি। দাদু ওটা খেয়ে বলে—তোমাদের গুটি চারের ঘরেই ছিল। তাই না বৌদি?'

নিমোর 'বৌদি' আর কৌশিকের 'দিদিমা'র মধ্যে কোনও রাখঢাক ছিল না। জেদি মেয়ের গলায় উত্তর এল সঙ্গে সঙ্গে। 'হ্যাঁ, উনি চোট্টামি করছেন।'

উত্তরটা ঝড়ের গতি বাড়িয়ে দিয়েছিল আরও। দাদুর গলার স্বর আরও জোরালো আরও অস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। দু-হাত তুলে ওঁকে থামাবার চেষ্টা করল কৌশিক।

বিছানার ওপর লুডোর বোর্ড। লাল-নীল-হলুদ-সবুজ গুটিগুলোর বেশ কিছু মৃত, বাকিগুলো লড়াকু চেহারায় বিভিন্ন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে।

সমস্যাটা বেশ জটিল। কিছুক্ষণ মাথা খাটাবার পরে রায় দিল কৌশিক: এবারের জেতা-হারাটা আলাদা করে ধরা হবে না। আরও দুবার খেলতে হবে। তিনবারের মধ্যে দুটো গেম যে দল পাবে, সেই দলই জিতেছে বলে ধরা হবে।'

এখানে দাদু দুহাতে খেলছে বলে একাই একটা দল। অন্য দলে দিদিমা আর নিমো। সালিসি উভয় পক্ষ মৃদু আপত্তির সঙ্গে মেনে নেওয়ার পরে কৌশিক আবার নিজের ঘরে ফিরে এসে আগের ভঙ্গিতে শুয়ে পড়েছিল। কিন্তু আলসেমি উপভোগ করার সেই মেজাজটা বুঝি কেটে গেছে কিছুটা।

একটু বাদে খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে ডোরবেল বেজে উঠল তিনবার। বিছানায় শুয়ে শুয়েই চেঁচিয়ে উঠল গোয়েন্দা, 'খুলছি অবনীদা, এই নিমো দরজা খুলে দে।'

বেশ একটা উত্তেজনার দিকে বাঁক দিয়েছিল লুডো খেলা। নিমো গলা একটু তুলেই বলল, 'বৌদি তুমি গুটির দিকে নজর রাখো, দাদু যেন কিছু না সরায়—। আমি দরজাটা খুলে দিয়ে আসছি।'

দরজার ছিটকিনি খুলেই আবার খেলার জায়গায় ছুট লাগিয়েছিল নিমো। পাল্লা ঠেলে ভেতরে ঢুকলেন ইন্সপেক্টর অবনী ঘোষরায়। ওঁর পরনে হাতাওয়ালা গেঞ্জি আর শর্টস। পায়ে বাহারি কেড্‌স। বগলে একগাদা খবরের কাগজ।

বসার ঘর থেকে শোবার ঘরে ঢুকে পড়ে ইন্সপেক্টর বলে উঠলেন, 'যাক. তুমিও তা হলে আলসেমি করো, দেখে খুব ভাল লাগল। কিন্তু খাটে শুয়ে শুয়ে কী করে বুঝলে যে আমি এসেছি। বলো, আন্দাজে বলেছি।'

'হ্যাঁ, আন্দাজেই তো। অলস-কল্পনা। স্রেফ আলসেমি করলে এমন কথা কিছু-কিছু মিলিয়ে দেওয়া যায়। আলসেমি ছাড়া আর কীই বা করার আছে আমার।'

'কী ধরনের আলসেমি তুমি করো— সে-খবর এখন শুধু সারা দেশেই নয়, বিদেশেও পৌঁছে গেছে। অত বড় একটা আন্তর্জাতিক চক্রকে ধরা কি চাট্টিখানি কথা!'

লাজুক ভঙ্গিতে আপত্তি করল, কৌশিক, 'আরে! আমি ধরলাম কোথায়! ধরলেন তো আপনারাই। আমি আপনাদের সঙ্গে ছিলাম—একটু-আধটু সাহায্য করেছি—এই যা।'

এবার একটু চটে উঠলেন ইন্সপেক্টর। 'তুমি এই ধরনের কথা একদম বলবে না তো। তুমি মজা করে বলো, আর বাইরের লোকে এগুলোই বিশ্বাস করে নেয়। এই সব বাইরের লোকের মধ্যে আবার খবরের কাগজের রিপোর্টাররাও আছে। তোমার এই কথাগুলো কাগজে লিখে দেওয়া মানে পাঠকদের ভুল খবর জানানো। এটা ঠিক নয়।'

উঠে বসে গায়ে একটা পাঞ্জাবি গলিয়ে নিয়ে কৌশিক বলল. 'ও. আসল কথাটাই আপনাকে বলা হয়নি। কাল সন্ধে থেকে বহুবার আপনাকে টেলিফোনে ধরার চেষ্টা করেছি, পাইনি। আপনি আজ রাত্তিরে আমার এখানে খাবেন। সন্ধের মধ্যে চলে আসবেন কিন্তু। আরও অনেককে বলেছি, সবাই আসছে।'

একগাল হেসে ইন্সপেক্টর বললেন, 'ওহ্! ভিকট্রি সেলিব্রেশন!'

'কিসের ভিক্‌ট্রি?'

'কিসের আবার, এই যে অপরাধীদের এত বড় একটা দলকে ধরা হল। বিজয়োৎসব তো হওয়াই উচিত।'

গলা সামান্য নামিয়ে কৌশিক বলল, 'আপনি তো জানেন—আমার বাড়িতে সস্ত্রীক একজন বিশিষ্ট অতিথি আছেন। কিছুদিন আগে আশি বছর বয়সে উনি ওঁর পঁচাশি নম্বর বিয়েটা করেছেন। এই যে খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা—এ সব ওঁর ইচ্ছেতেই করা। বললেন: কদ্দিন পরে কলকাতায় এলাম। বয়েস হয়েছে, এটাই হয়তো আমার শেষ আসা। তা এসেছি যখন, তোমার বন্ধু মানে আমারও বন্ধু। পাঁচজনের সঙ্গে মেলামেশা করতে আমার খুব ভাল লাগে। তোমার বন্ধুরা শহরের মান্যিগন্যি লোক, ওঁরা তো আর আমাদের অজ পাড়াগাঁয়ে যাবেন না কখনও।'

'এটা কি বুড়োর বিয়ের খাওয়া?'

'ঠিক তাই। খাওয়ানোর খরচপত্তর উনিই দিচ্ছেন। আমি অবশ্য কিছুতেই নিতে চাইনি। বললাম, আপনার সম্মানে আমি পাঁচজনকে ডেকে খাওয়াব। এ তো খুব আনন্দের। এর মধ্যে আপনি আবার টাকাপয়সা দেওয়ার ব্যাপার টেনে আনছেন কেন? কিন্তু কিছুতেই দাদুর মত পাল্টাতে পারিনি। ছেলেমানুষের মতো গোঁ ধরেছেন। মুখে এক কথা: আমি এ-বাড়িতে যখন প্রথম এসেছিলাম তখন ছিলাম তোমার অতিথি। এখন বাড়ির লোক। খাওয়ানোর খরচ আমার। ব্যবস্থা তোমার। রাঁধুনি ঠিক করা, বাজারহাট করা, বন্ধুবান্ধবকে

নেমন্তন্ন করা—সব দায়িত্ব তোমার। তোমাকে বাড়ির লোক মনে না করলে এত বড় দায়িত্ব কি তোমার ওপরে ছেড়ে দিতাম!'

'বুড়ো মনে হচ্ছে একটু রসিক?'

'একটু নয়, খুবই। দাদু বললেন খাওয়াদাওয়া শেষ হলে আমি একটা সুখবর জানাব তোমাদের সবাইকে। যাক, যে যা করে আনন্দ পায়—পাক। আমি মন দিয়ে দায়িত্ব পালন করার কাজটুকু করি। আপনি কিন্তু সন্ধেবেলাতেই চলে আসবেন এখানে।'

'অবশ্যই। কাঁধের বোঝা নেমে গেছে। এখন একটু পেট পুরে ভালমন্দ খেতে হবে। আমার ব্লাড শুগারের অবস্থাটা মনে হয় এখন বেশ ভাল। এক ঘুমে রাত কাবার। ভোরে উঠে এত এনার্জি পাচ্ছিলাম যে অনেক দিন পরে মর্নিং-ওয়াক করতে বেরিয়ে পড়লাম। কিন্তু আমার কপালে পুরো সুখ নেই। কোথাও না কোথাও একটা খোঁচ থেকে যায় ঠিক। খবরের কাগজগুলো খারাপ লেখে না সব সময়। কিন্তু মাঝেমধ্যে মুনি-ঋষিদের মতো জগৎসংসার সম্পর্কে এত উদাসীন হয়ে যাও কী করে বলো তো? আমাদের খবরটাই আজ সব কাগজের প্রথম পাতার সবচেয়ে বড় খবর। আর তুমি কোনও কাগজই দেখনি! আমি মর্নিং-ওয়ার্ক করতে বেরিয়ে সব ক'টা কাগজ কিনে ফেলেছি। পার্কে বসে খুঁটিয়ে-খুটিয়ে পড়াও হয়ে গেছে। তুমি একবার চট করে চোখ বুলিয়ে নাও।'

ইন্সপেক্টর কাগজের মস্ত তাড়াটা ওর দিকে এগিয়ে দিতেই আঁতকে উঠে গোয়েন্দা বলল; 'উরিব্বাস! অতগুলো কাগজ পড়তে গেলে তো গোটা সকালটাই বরবাদ হয়ে যাবে।'

প্রচারবিমুখ গোয়েন্দার রকমসকম দেখে আরও একবার অবাক হলেন ইন্সপেক্টর। কিন্তু উনি হাল ছাড়ার পাত্র নন, বললেন, 'ঠিক আছে তোমাকে পড়তে হবে না। আমি পড়ছি, তুমি শোনো।'

আর একবার আঁতকে ওঠার ভঙ্গি করল গোয়েন্দা। 'সে তো একই ব্যাপার হল---। এখন কাগজটাগজ থাক।'

'তুমি বুঝতে পারছ না। দু-তিনটে কাগজ, বিশেষ করে প্রদীপন, আমাকে নিয়ে বেশ বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে। ভাবছি, সম্পাদকের দফতরে প্রতিবাদ-পত্র পাঠিয়ে দেব।'

'প্রতিবাদ-পত্র! কেন?'

'কেন, সেটা বুঝতে হলে খবরগুলো পড়তে হবে। ঠিক আছে, শুধু দৈনিক প্রদীপনটা পড়ছি—। শুনবে একটু?'

দু-কাঁধ ঝাঁকিয়ে গোয়েন্দা বলল, 'বেশ, পড়ুন।'

কাগজের তাড়া থেকে চটপট দৈনিক প্রদীপন বেছে নিয়ে ইন্সপেক্টর বললেন, 'গোড়ার দিকটা বেড়ে লিখেছে, কিন্তু শেষের দিকে আর সামাল দিতে পারেনি। পাতাজোড়া দু-লাইনের হেডিং, তবে বেশ খেলিয়ে করেছে। প্রথম লাইনে আছে—আন্তর্জাতিক মেয়ে-শিকারিদের গোটা দল ধৃত। দ্বিতীয় লাইনে—বিয়ের নামে সুন্দরী কেনা-বেচা, সঙ্গে গুম ও খুন। খবরের ওপরে লেখা—বিশেষ সংবাদদাতা। পড়ি এবার?'

'পড়ুন।'

একটু কেশে গলা পরিষ্কার করে আজকের প্রদীপন পড়তে শুরু করে দিলেন ইন্সপেক্টর ঘোষরায়। "কলকাতা ও বাঙ্গালোর পুলিশের যৌথ উদ্যোগে বিশাল এক পুলিশবাহিনী গতকাল রাত্রে মধ্য কলকাতার বিস্তীর্ণ এলাকা ঘিরে ফেলে আন্তর্জাতিক মেয়ে পাচারকারী

দলের পাঁচজন সশস্ত্র দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করেছে। দুষ্কৃতীরা একটি ছিনতাই-করা জিপে উঠে বোমা ফাটিয়ে গুলি ছুড়তে ছুড়তে পালাবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পুলিশি তৎপরতায় তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়নি। পুলিশের সঙ্গে কুড়ি রাউন্ড গুলি-বিনিময় হওয়ার পরে অপরাধীরা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। ওদের কাছ থেকে দুটি এ কে ৪৭ রাইফেল, একটি রিভলভার এবং দুটি পিস্তল উদ্ধার করা হয়েছে। সম্প্রতি বাঙ্গালোরের এক অভিজাত হোটেলে পুলিশি অভিযানে তিন বেদুইন দস্যু, ভারতীয় মাফিয়া ডনসমেত আন্তর্জাতিক মেয়ে পাচারকারী যে দলটি ধরা পড়েছে, গত রাতে কলকাতায় ধৃত পাঁচজন দুর্বৃত্ত সেই দলেরই সদস্য। জনৈক 'অধ্যাপক' এই দলের মাথা, সেও ধরা পড়েছে কালকের অভিযানে। আজ থেকে সাত-আট বছর আগে এই অধ্যাপক এক ধনী বিধবাকে বিয়ে করে। কিছুদিন সংসার করার পরে শহরতলীর এক বাগানবাড়িতে স্ত্রীকে গুম-খুন করে ওই সম্পত্তি আত্মসাৎ করে অধ্যাপক। ওই মহিলার উদ্ধার-করা কঙ্কাল পরীক্ষা করে ফরেনসিক-বিশেষজ্ঞ রায় দিয়েছেন, এটি একটি সুপরিকল্পিত খুনের ঘটনা। অধ্যাপক, দোষ স্বীকার করেছে। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, পুলিশ ইন্সপেক্টর অবনী ঘোষরায় দীর্ঘদিন ধরে অনুসন্ধান ও তদন্ত চালানোর ফলেই মেয়ে-পাচারকারী আন্তর্জাতিক এই চক্রটিকে ধরা সম্ভব হয়েছে। কী, কী বুঝছ গোয়েন্দা ?"

'বাহ্! বেশ জমিয়ে লিখেছে তো। তা, এখানেই শেষ ?'

'না-না, পাক্কা চার কলম ধরে লিখেছে। আচ্ছা, এ সব বাড়াবাড়ি করার কোনও মানে হয় ?'

'খুব বাড়াবাড়ি আর কোথায় হল। পাঠকদের কথাও তো ভাবতে হবে। ওরা একটু অ্যাকশন-প্যাক্ড খবর পড়তে চায়।'

'তা বলে বানাবে ?'

'আপনি বানানো বলে ধরছেন কেন ? যে সব সোর্স থেকে খবর জোগাড় করেছে, তারাই হয়তো এ সব বলেছে।'

'তারা খামোখা মিথ্যে কথা বলতে যাবে কেন ?'

'মিথ্যে বলবে কেন ? চাঞ্চল্যকর কোনও ঘটনার কথা কাউকে বলতে গেলে একটু এদিক-ওদিক তো হয়ে যায়ই।'

'কী বলছ তুমি !'

'কেন, আপনি সেই ঐতিহাসিকের কথা জানেন না ?'

'কোন্ ঐতিহাসিক ?'

'বিখ্যাত এক ঐতিহাসিক। একদিন বাড়ির ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে তিনি ভয়ঙ্কর এক গণ-অভ্যুত্থান দেখেছিলেন। ঐতিহাসিক কারণে সেই বিবরণ লিখে রাখার জন্যে তিনি ওই অভ্যুত্থানের তিনজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ সংগ্রহ করে দেখেন— তিনজন তিন রকম তথ্য দিয়েছে। একটার সঙ্গে আর একটার কোনও মিল নেই। তাই দেখে বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইতিহাসচর্চা ছেড়ে দিলেন। তিনি তাঁর ডায়েরিতে লিখেছিলেন: চোখের সামনে দেখা একই ঘটনার তিনটি পরস্পরবিরোধী বিবরণ তিনজন প্রত্যক্ষদর্শীর মুখ থেকে শোনার পরে দুঃখের সঙ্গে এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হচ্ছি যে, ইতিহাসচর্চা অর্থহীন। বিক্ষিপ্তভাবে পাওয়া বিভিন্ন তথ্যের ওপর নির্ভর করে দূর অতীতের ঐতিহাসিক সত্যের সন্ধান করা পণ্ডশ্রম ছাড়া আর কিছুই নয়। এই সব কারণে আমি আজ থেকে ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করা ছেড়ে দিলাম।'

'যা বললে তা সত্যি নাকি?'

'হ্যাঁ, একেবারে ঐতিহাসিক সত্য। এদিক থেকে কবিরা কিন্তু খুব সুবিধেজনক জায়গায় আছে। ওরা প্রথমেই বলে নেয়— যা ঘটে তা সব সময় সত্যি নয়।'

গোয়েন্দার ব্যাখ্যা শুনে খুব একটা সন্তুষ্ট হলেন না ইন্সপেক্টর। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে বললেন, 'যাকগে, এ নিয়ে তোমার সঙ্গে তর্ক করতে চাই না এখন। তবে খবরের কাগজের অফিসে আমি একটা প্রতিবাদ-পত্র পাঠিয়ে দেব।'

'প্রতিবাদ-পত্র! কী নিয়ে?'

ওই যে আমার সম্পর্কে একটা আপত্তিকর কথা লিখেছে না—। খেয়াল করোনি তুমি? এই যে, এই জায়গাটায়— বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, পুলিশ ইন্সপেক্টর অবনী ঘোষরায় দীর্ঘদিন ধরে অনুসন্ধান ও তদন্ত চালানোর ফলেই মেয়েপাচারকারী আন্তর্জাতিক এই চক্রটিকে ধরা সম্ভব হয়েছে। এ তো একেবারে ডাহা মিথ্যে।'

'না-না মিথ্যে নয়। আপনিই তো সব। কাল রাত্তিরে কে-একজন রিপোর্টার ফোন করেছিলেন আমাকে— তখন আমিই ওই কথাগুলো বলেছি। আপনি এখন প্রতিবাদ-পত্র পাঠালে আমাকে খুব লজ্জার মধ্যে পড়তে হবে।'

গোয়েন্দার কথা শুনে ইন্সপেক্টরের মুখে ক্ষমাসুন্দর একটা হাসি ফুটে উঠেছিল। বেতের চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে উনি বললেন, 'সত্যি, তোমার ছেলেমানুষি কবে যাবে বলো তো?'

হাসতে হাসতে জবাব দিল কৌশিক, 'ছেলেমানুষি করিনি, আমি শুধুমাত্র ঐতিহাসিক সত্যের জোগান দিয়েছি। যাকগে ওসব কথা, একটা ব্যাপারে অবনীদা আমি কিছুটা নিশ্চিন্ত বোধ করছি— অপরাধিদের কেউ-কেউ দোষ স্বীকার করে নিয়েছে।'

'স্বীকার না করে উপায় কী? তুমি প্রত্যেকের বিরুদ্ধে এত সাক্ষ্য-প্রমাণ জোগাড় করেছ যে, এখন চালাকি করতে গেলে শাস্তির মাত্রা আরও বেড়ে যাবে। তা ছাড়া দলের মধ্যে এখন তো আর কোনও মিলমিশ নেই। একজন আর একজনকে দুষছে। রাগের চোটে গোপন অপরাধ ফাঁস করে দিচ্ছে। এর ফলে লাভ হচ্ছে পুলিশের। সত্যি, তোমার কোনও জবাব নেই কৌশিক। যা একটা সার্ভিস দিলে না—!'

কৌশিক অন্য কোনও একটা চিন্তায় ডুবে গিয়েছিল। সেখান থেকে ও যেন ফিরে এসে মৃদু গলায় জবাব দিল, 'আমি অন্য একটা সার্ভিসের আশায় আছি অবনীদা। এ-ব্যাপারে প্রমিতা খুব সাহায্য করছে। তবে কতটা কী হবে জানি না।'

'কী সেটা?'

'সুনেত্রাদি খুব ভেঙে পড়েছেন। সেটা খুব স্বাভাবিক। প্রফেসর মৃদুল ভট্টাচার্যের আসল চেহারাটা দেখার পরে ওঁর পক্ষে সহজ-স্বাভাবিক থাকা সম্ভব নয়। প্রমিতা ওঁর মনের জোর ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে খুব। সুনেত্রাদির তো দাদাঅন্ত প্রাণ। প্রমিতা বারবার বলছে, তোমার দাদাকে বাঁচিয়ে তুলতে গেলে তোমাকে শক্ত হতে হবে। ওঁর দাদা অপূর্ব তো ড্রাগ অ্যাডিক্ট। শ্রবণা, মানে ওই রেখার কথাও বলছে। বলছে, ওঁর জীবনটার কথা একবার ভেবে দেখ তো। মেয়েটার মতো দুঃখী আর কেউ কি আছে? চাপে পড়ে একটা নোংরা জীবন কাটাতে হচ্ছে ওকে। তুমি শক্ত হলে আমরা ওকেও আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে পারব। ঝিমলির কথাও বলছে—।'

'ঝিমলি মানে বাঙ্গালোর থেকে উদ্ধার করে আনা ওই মেয়েটা?'

'হ্যাঁ।'

'কেমন আছে ও এখন?'

'বাবা-মাকে কাছে পেয়ে আগের চেয়ে অনেক ভাল। তবে মস্ত বড় ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠতে সময় লাগবে কিছুটা। সুনেত্রাদির কাছে ওই ঝিমলির কথাও প্রমিতা বলেছে বারবার। বলছে—ঝিমলিকেও আমাদের মধ্যে নিয়ে নাও।'

'আমাদের মধ্যে নিয়ে নাও মানে?'

'ও, আপনাকে বলা হয়নি। সুনেত্রাদি একটা সেবামূলক কাজের প্রোগ্রাম নিচ্ছিলেন কিছুদিন ধরে। একটা সোশাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের সঙ্গে ওই ব্যাপারে কথাও এগিয়েছে কিছুটা। ওঁর কিন্ডারগার্টেনটাকে বাড়াবার কথাও ভাবছিলেন সেই সঙ্গে। তা প্রমিতা দেখল, এই সব কাজের মধ্যে সুনেত্রাদিকে চটপট ফিরিয়ে আনতে পারলে সবারই ভাল হবে একসঙ্গে।'

'চমৎকার! ঠিকই ভেবেছে প্রমিতা।'

'আপনি যাকে ধরেছিলেন সেই প্রসেনজিৎ তো এখন জামিনে ছাড়া পেয়েছে। ও-ও ওদের সঙ্গে থাকতে চায়। কাজগুলো ঠিক ভাবে শুরু করা যাবে তো অবনীদা? আপনার কী মনে হয়?'

'আলবত যাবে। তোমার ওপর আমার অগাধ আস্থা। রিহ্যাবিলিটেশন, সাধু বাংলায় যাকে বলে পুনর্বাসন, সেটা তো এই ভাবেই হয়। তা বাড়ি বসে বসে এখন কী করবে? চলো; আমার সঙ্গে থানায় চলো। হাতে অল্পস্বল্প কাজ আছে। ওগুলো সারার পরে গল্প করা যাবে।

'না অবনীদা, এখন হবে না। দাদু-দিদিমাকে পাতাল রেল দেখাতে নিয়ে যাব।'

'এখনও দেখাওনি। অনেক আগেই তো দেখাবার কথা ছিল।'

'তা ছিল, আসলে যাব-যাব করে... তা ছাড়া ওদিকের কাজকর্ম—।'

'ঠিক আছে ঘুরে এসো। রাত্তিরে দেখা তো হচ্ছেই।'

'রাত্তিরে নয়, সন্ধেয়। তাড়াতাড়ি আসবেন কিন্তু।'

সেদিন সন্ধে হতে না হতেই প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর কৌশিক মিত্রের ফ্ল্যাট জমজমাট। নিমোর উৎসাহই বুঝি সবচেয়ে বেশি। হাজারটা কাজে-অকাজে ছুটোছুটি করছিল এদিক-সেদিক।

রাধাগোবিন্দ গিরির ইচ্ছেয় মেঝেতে পাত পেড়ে খাওয়ানোর ব্যবস্থা হয়েছে। এই ব্যবস্থায় গোয়েন্দার সহকারী মুখার্জিবাবু খুব খুশি। বারবার বলছেন, এই না হলে নেমন্তন্ন-বাড়ি।

রান্নাবান্না করা ও পরিবেশনের সব দায়িত্ব অবশ্য কেটারারের। কী-কী পদ হবে সে সব ঠিক করেছে নিমো, কৌশিক আর দিদিমা। দাদুর শুধু একটাই চাহিদা ছিল— মুড়িঘণ্ট হবে। তা, মুড়িঘণ্ট হয়েছে।

কৌশিকের বসার ঘরটা বেশ বড়। সোফাসেট, ডিভান ইত্যাদি সরিয়ে দিয়ে খাওয়ানোর ব্যবস্থা হয়েছে ওই ঘরেই। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে আছেন দুই শহরের দুই ডেপুটি কমিশনার, ইন্সপেক্টর ঘোষরায়, সুনেত্রা, প্রমিতা, সব্যসাচী, মধুসূদন, খালেক, প্রসেনজিৎ, গাঙ্গুলি, গোয়েন্দার দু-তিনজন কাছের বন্ধু ও সিকিউরিটির কয়েকজন।

বেডকভার দু-ভাঁজ করে মেঝেতে পেতে পংক্তিভোজনের বসার জায়গা হয়েছে। সিল্কের পাঞ্জাবি আর চওড়া পাড় ধুতি পরে নিমন্ত্রিতদের খাওয়ার তদারকি করছিলেন রাধাগোবিন্দ

রি। মুড়িঘণ্ট পরিবেশনের সময় ওঁর উৎসাহ বেড়ে গিয়েছিল দ্বিগুণ। ঘন ঘন হাঁক পাড়ছিলেন— এই মুড়িঘণ্টটা এদিকে একবার ঘোরাও তো।

শেষ পাতে দই-মিষ্টি। হাতে হাতে মিষ্টি পান।

চমৎকার হয়েছিল রান্নাবান্না। সবাই খুব তৃপ্তি করে খেলেন। দু-খিলি পান একসঙ্গে মুখে গুঁজে দিয়ে ইন্সপেক্টর ঘোষরায় বললেন, 'কৌশিক, তুমি আজ সকালে বলেছিলে— খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে দাদু কী-একটা সুখবর শোনাবেন আমাদের। কী সেটা?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, সত্যিই সুখবর। দাদু আপনি বলুন।'

কৌশিকের কথার উত্তরে দাদু বললেন, 'আমার লজ্জা করছে, তুমি বলো।'

বললেন বটে লজ্জা করছে, কিন্তু ওঁর চেহারার মধ্যে লজ্জা পাওয়ার কোনও চিহ্ন ছিল না।

কৌশিক একটু গলা-খাঁকারি দিয়ে স্বর সামান্য ওপরে তুলে বলল, 'বেশ, আমিই বলছি। দাদু সামনের বৈশাখে ওঁর ছিয়াশি নম্বর বিয়েটা করছেন।'

সুখবর শুনে জোর হাততালি দিয়ে উঠলেন সবাই। খুব আনন্দের খবর। মুখার্জিবাবু বললেন, 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনি এবার সেঞ্চুরিটা করে ফেলুন দাদু।' একই কথা ঘুরেফিরে আরও অনেকের মুখে শোনা গেল।

সবশেষে প্রমিতা শুধু একটু অন্য সুরে বলল, 'দাদু, আপনার বিয়ের খবরে দিদিমা চটে যাননি তো?'

উত্তরে কেমন যেন তেড়েফুঁড়ে উঠে দাদু বললেন, 'কেন, চটে যাবে কেন? সম্বন্ধ তো ওই এনেছে। ওর দূর সম্পর্কের আত্মীয়। অবস্থা এখন পড়ে গেছে, কিন্তু খুব লক্ষ্মীমন্ত মেয়ে।'

দাদুর কথা শুনে পাশে-দাঁড়ানো আঠারো-উনিশ বছরের দিদিমা মাথার ঘোমটা ঠিক করতে করতে মুচকি-মুচকি হাসছিলেন।

নেমন্তন্নবাড়িতে খাওয়া-দাওয়া শেষ হলেই চলে যাওয়ার পালা শুরু হয়। এখানেও তাই হল। শেষ অতিথি যাওয়ার পরে একটা লম্বা হাই তুলে কৌশিক বলল, 'নিমো, সারা দিন খুব ধকল গেছে। বিছানাপত্তর ঠিকঠাক কর এবার। ভীষণ ঘুম পাচ্ছে।'

'এক মিনিট দাদা'— বলেই পাশের ঘরে কেমন যেন ছুটে ঢুকে গেল নিমো। ওর পেছন-পেছন দাদু আর দিদিমাও।

এক মিনিটের জায়গায় পাঁচ-সাত মিনিট কেটে গেল, কিন্তু নিমোর আর দেখা নেই।

ব্যাপারটা কী দেখার জন্যে ঘরে ঢুকে অবাক হয়ে গেল কৌশিক। বিছানার মাঝখানে লুডো বিছিয়ে গোল হয়ে বসেছে দাদু, দিদিমা আর নিমো।

নিমো বলল, 'পাতাল রেল দেখতে যাওয়ার জন্যে আমাদের শেষ গেমটা খেলা হয়নি তখন—। আমাদের এক-এক চলছে। একটা আমরা জিতেছি, আর একটায় দাদু। এটার রেজাল্টের ওপরেই জেতা-হারা নির্ভর করছে। গেমটা শেষ হলেই যাচ্ছি দাদা।'

দাদুর চোখমুখ রীতিমত থমথমে। কোনওদিকে নজর নেই। উনি কাঠের কৌটো কপালে ঠেকিয়ে দান ফেলে চেঁচিয়ে উঠলেন 'ছক্কা' বলে।

মুচকি হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল কৌশিক।
